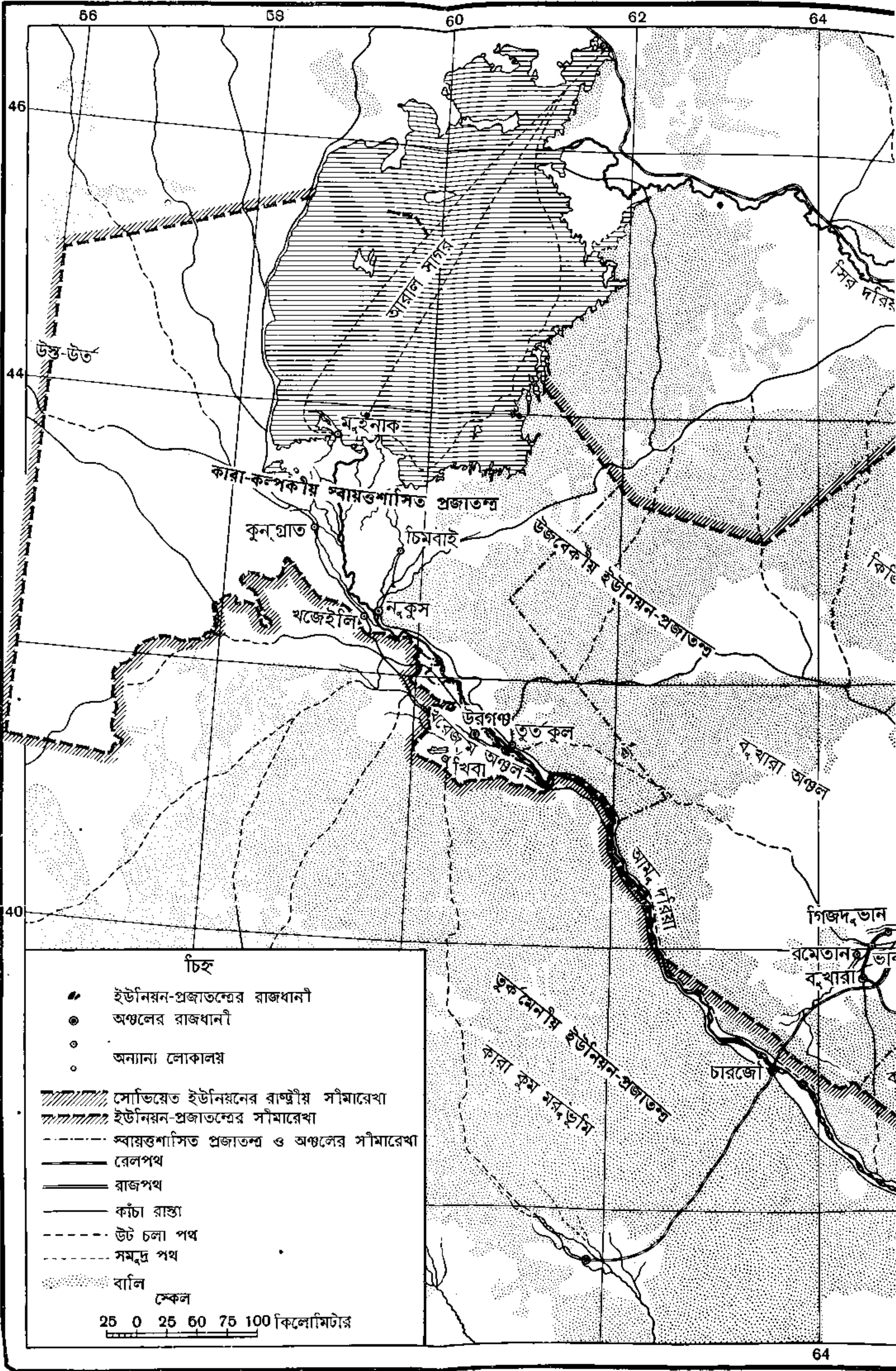
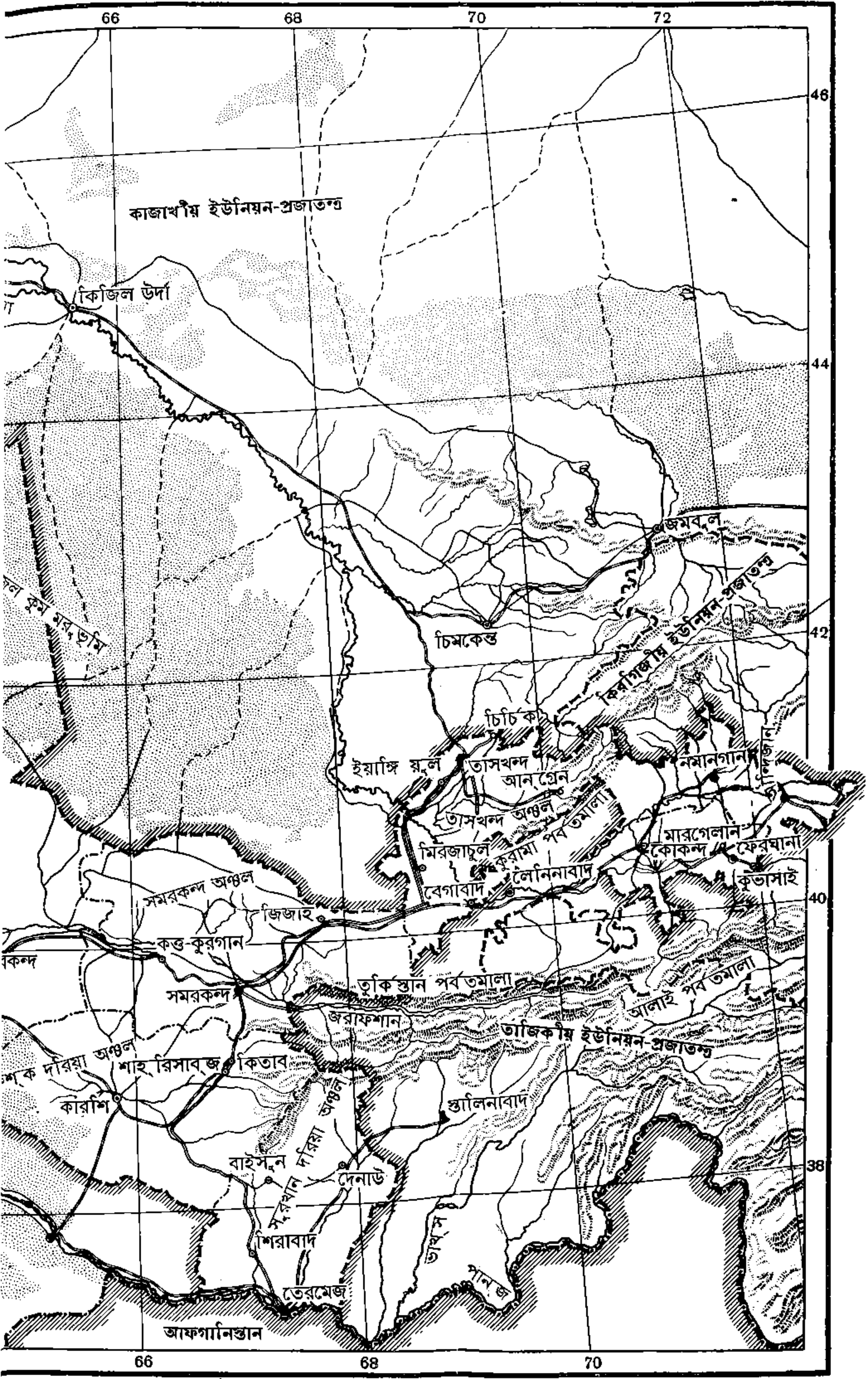
ভিক্তর ভিংকভিচ

সোভিয়েত উজবেকিস্তানে ভ্রমণ



56
58
60
62
64
46
44
40
আরাল সাগর
উস্ত-উর্ত
মুইনাক
কারা-কল্পকীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র
কুনগ্রাত
চিমবাই
নুকুস
খজেইলি
উজবেকীয় ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র
উরগঞ্চ
তুত কুল
খরেজম অঞ্চল
খিবা
বুখারা অঞ্চল
আমু দরিয়া
গিজদুভান
রমেতান
বুখারা
চারজো
তুর্কমেনীয় ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র
কারা কুম মরুভূমি
চিহ্ন
ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রের রাজধানী
অঞ্চলের রাজধানী
অন্যান্য লোকালয়
সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সীমারেখা
ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রের সীমারেখা
স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলের সীমারেখা
রেলপথ
রাজপথ
কাঁচা রাস্তা
উট চলা পথ
সমুদ্র পথ
বালি
স্কেল
25 0 25 50 75 100 কিলোমিটার
64


66
68
70
72
46
44
42
40
38
কাজাখীয় ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র
কিজিল উর্দা
কুম মরুভূমি
চিমকেন্ত
জমবুল
কিরগিজীয় ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র
চির্চিক
ইয়াঙ্গি য়ুল
তাসখন্দ
আনগ্রেন
তাসখন্দ অঞ্চল
কুরামা পর্বতমালা
মিরজাচুল
লেনিনাবাদ
বেগাবাদ
নমানগান
মারগেলান
কোকন্দ
ফেরঘানা
কুভাসাই
সমরকন্দ অঞ্চল
জিজাহ
কত্ত-কুরগান
সমরকন্দ
তুর্কিস্তান পর্বতমালা
আলাই পর্বতমালা
জরাফশান
তাজিকীয় ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্র
দরিয়া অঞ্চল
শাহরিসাবজ
কিতাব
কারশি
স্তালিনাবাদ
বাইসুন
সুরখান দরিয়া অঞ্চল
দেনাউ
শিরাবাদ
তেরমেজ
আফগানিস্তান
66
68
70

ВИКТОР ВИТКОВИЧ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОВЕТСКОМУ УЗБЕКИСТАНУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
МОСКВА 1960

ভিক্তর ভিৎকভিচ

সোভিয়েত উজবেকিস্তানে ভ্রমণ

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো ১৯৬০

অনুবাদ: ফল্গু কর
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: সের্গেই পজারস্কি

সূচী

মুখবন্ধ

বহু পর্যটক বহুবার উজবেকিস্তানে বেড়াতে এসেছে। এ বই তারই চুম্বক। এর মাধ্যমে এবার পাঠকদের বেড়াবার পালা।

প্রতিবছর বহু লোক উজবেকিস্তানে আসে। এর *সহর, কিসলাক বা গ্রামে ঘন ঘন আসে ট্রান্সককেসিয়া, দূর উত্তর, সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও পার্শ্ববর্তী তাজিকিস্তানের শ্রমিক ও যৌথখামারীর দল। বছরের পর বছর মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ত্বিলিসি, কিয়েভ ও অন্যান্য জায়গা থেকে উজবেকিস্তানের মরূদ্যানে, সহরে ও মরুভূমিতে গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী-দল ত এসেই থাকে। এ ছাড়াও আছে ট্রেনে বা বিমানে করে প্রতিদিন তাসখন্দে-আসা অসংখ্য পর্যটক।

স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তান সম্পর্কে বাইরেকার দেশের মেহনতী জনতার আগ্রহও গভীর। সোভিয়েত শাসনের সময় আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতিগুলির ভিতর বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়েছে; এই বন্ধুত্ব নিত্য জীবনের অংশ এবং সোভিয়েত মানুষের একেবারে মর্মরূপ। এই মহান বন্ধুত্বকে ভিত্তি করে সোভিয়েত জনগণ অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মত উজবেকিস্তানকে সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করেছে।

তাসখন্দ টেকস্‌টাইল মিলের মজুরদের সভায় সহকর্মিনীদের উল্লেখ করে একজন উজবেক মেয়ে তন্তুবায় সগর্বে বলেন যে তাঁরা উজবেক তুলো দিয়ে পৃথিবীর জন্য শান্তির পতাকা বুনছেন। কথাটি সুন্দর! সোভিয়েত দেশের অন্যান্য জাতিগুলির মত উজবেক জনগণ শান্তির জন্য সংগ্রাম করছে। তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক শ্রমের বিরাট কর্মসূচীতে। উজবেকিস্তানে যত বেশী ভ্রমণ করা যায়

তত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে এই মহতী শ্রমের পরিলেখ চোখে পড়ে। এই শ্রম দেশের চেহারা একেবারে পাল্টে দিচ্ছে।

উজবেক প্রজাতন্ত্রের জীবন সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, এ বই যেন গাইডের মত উজবেকিস্তান ভ্রমণে সাহায্য করে। পাঠক যেন এ বই পড়ে সত্যিকার পর্যটকের মতো একথা মনে করেন যে তিনি কারখানা দেখছেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করছেন, যৌথখামারে দিন কাটাচ্ছেন, স্তেপের ঘাসের উগ্র গন্ধ আসছে তাঁর নাকে, শুনতে পাচ্ছেন চমকপ্রদ ঘটনার কাহিনী, যেভাবে উজবেক নরনারী সাম্যবাদকে গড়ে তুলছে শেষ পর্যন্ত তারও সঙ্গে ঘটছে তাঁর পরিচয়।

একথা ঠিক যে সোভিয়েত দেশে জীবনের অগ্রগতি এত দ্রুত, প্রতিদিনই এত বেশী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে সেখানে যে কারও পক্ষে তার সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব নয়, আজকের লেখা পুরনো হয়ে যায় কাল, যেমন চালু হচ্ছে নতুন কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন যন্ত্র ও গাছপালা, মরুভূমি থেকে আদায় করা হচ্ছে নতুন জমি। তা ছাড়া জীবনের বহুবিচিত্র রূপকে একখানা বইয়ের ভেতর ধরাও সম্ভব নয়। মহান সোভিয়েত যুগে আজকের উজবেকিস্তানের যে বিচিত্র, পরিপূর্ণ ও সৃজনশীল জীবনধারা তার সত্যিকারের ছাপ যদি বইয়ে পড়ে থাকে এবং পাঠককে এ বই যদি এ দেশের একটি মোটামুটি ধারণা দিতে পারে তা হলেই আমি খুশি হব।

উজবেকিস্তানে প্রবেশ

রেলগাড়িতে চেপে ওরেনবুর্গ থেকে তাসখন্দে যেতে কাজাখ দেশের স্তেপ পেরুতে আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগে। আটচল্লিশ ঘণ্টা জানলার ভেতর দিয়ে স্তেপভূমি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। ... ছোট ছোট গ্রাম ছাড়া পাঁচটি বিশাল মরূদ্যান, সমাজতন্ত্রী কাজাখস্তানের সবুজ গাছ-ছাওয়া পাঁচটি নতুন শিল্প সহর পেরিয়ে গাড়ি চলে। নজরে পড়ে বিভিন্ন জংসন-স্টেশন, তাদের জলগম্বুজ আর অসংখ্য রেললাইন, আওয়াজ পাওয়া যায় শাণ্টিং ইঞ্জিনের। স্লিপারের মাঝখান থেকে উঠে আসে ঢালা উত্তপ্ত চর্বির গন্ধ। সহর ও স্টেশনগুলো দ্রুত সরে যায়। স্তেপভূমির বিশালতা, তার আদিম প্রকৃতির কথা বেশী করে মনে পড়ে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা শেষ হবার মুখে গাড়ি ঢোকে তিয়েন শানের পাহাড়ের দূর পাদদেশের ভেতর, ছুটতে থাকে বালুস্তূপের মাঝ দিয়ে। ঘরে-ফেরা উজবেকী যাত্রীর দল তখন গোছগাছ সুরু করেন, সুরু হয় দাড়ি কামানো।

সামনে সহর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গাড়িতে বসেই ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। সবাই সহরের কথা ভাবছে। স্বভাবতই একটু বিষণ্ণ মনে হয় কারণ ভ্রমণকালে যাত্রীদের ভেতর যে হৃদ্যতা জন্মায় অদৃশ্যভাবে তাতে চির ধরে। জানলা দিয়ে বাইরে মাঝে মাঝে এমনি তাকায় তারা।

শেষটায় কাজাখ ও উজবেক প্রজাতন্ত্রের সীমানা খুঁটি চকিতে পেরিয়ে যায়। গাড়ি ঢোকে দক্ষিণের বর্ণ-বহুল বিরাট বাগানে, তাসখন্দ মরূদ্যানে।

গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় আলোর ঝিকিমিকি কিংবা আঙুর ক্ষেতের পাতার ফাঁকে লুকোন লালচে আঙুরের থোপার তারিফ না করে মন ভরে না। চুল্লির ধোঁয়া গাছের

নীচে কুণ্ডলী পাকায়। তলায় কম্বল বা পালাসের (আঁশহীন পশমী কম্বল) উপর ছেলেরা খেলাধুলো করে বা উজবেক যৌথখামারীদের পরিবার বসে আরামে খাবার খায়। গাছের ডালগুলোকে ঠেকো দিয়ে দাঁড় করান। রোদে পাক-ধরা গোলাপী আপেল, সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত পীচ, চকচকে পিয়ার বা সাটিনের মতো প্লামগুলোকে এ না হলে ধরে রাখা যায় না।

গাছের ডালপালায় ইঞ্জিনের ধোঁয়া লাগে স্বচ্ছ মালার মত, ধোঁয়া কখনো বা আনত সূর্যমুখীর উপর কখনো বা ক্রসিংয়ের কাছ থেকে ট্রেনের উদ্দেশ্যে হাত-নাড়া বাচ্চা মেয়েটার সূচী কাজ করা তুবেতেইকার (চাঁদি-টুপি) উপর জমায়েৎ হয়। কখনও বা বাসা বাঁধে ফুটি ক্ষেতের ছড়ান সবুজের উপর, ভেতর থেকে উঁকি মারে পাক-ধরা সোনালী ফুটি। বেশীর ভাগ সময়েই কিন্তু ধোঁয়া মিলিয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে তুলোর ক্ষেত। মনে হয় তুলোর গাছ শুঁটিতে ছাওয়া নয়, ইঞ্জিনের তুষার-সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢাকা।

ক্রসিংয়ের কাছ থেকে ছুটে-চলা গেঁয়ো রাস্তার ধুলোয় ক্রলার-ট্র্যাকটরের চেনের দাগ। মাঠের ভেতর বিভিন্ন কৃষি যন্ত্র। মাটির দেয়ালের পাশ দিয়ে মাল বোঝাই থলে নিয়ে গাধারা চলেছে ধীরে ধীরে। রাস্তা দিয়ে ছুটে-চলা লরি দেখে ভয়ে চমকে উঠছে। বাড়ির কার্নিশে ঘুঘুর ডাক। এই বর্ণাঢ্য রং আর গতির ঊর্ধ্বে, ট্রেনের ঝাপটায় অসহায়ভাবে উড়ন্ত প্রজাপতিদের ছাড়িয়ে, উজ্জ্বল পোষাকে মাঠে কাজ-করা যৌথখামারীদের ছাড়িয়ে আর লম্বার্ডি পপলারের অগুনতি সারির উপরে সাড়ম্বরে অর্ধবৃত্তের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কারখানার চিমনিগুলো।

চারদিকেই জল। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পুকুরের জল ঝিকমিক করছে। অগুনতি আরিক বা সেচনালীর ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে বাদামী রঙের জলধারা। চৌকোণা ধান ক্ষেতের জলে নীল আকাশের ছায়া। ওখানে ট্রাউজার গুটিয়ে হাঁটু-সমান জলে কাজ করছে যৌথখামারের লোকেরা। তুলো ক্ষেতকে আড়াআড়িভাবে কাটা নালী বেয়ে জল চলেছে, প্রতিটি ক্ষেত যেন রূপোর কাজ করা কার্পেট। একটা রেলপুলের অনেক নীচে বজসু'র খাড়া পাড়ের ভিতর দিয়ে ফেনিল জলরাশি উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। এ হল উজবেক রাজধানীর অন্যতম, প্রাচীন সেচনালী। আর বজসু'র অনেক উপর দিয়ে ক্ষুদ্র জল ধারার আকারে এক পার থেকে অন্য পারে চলা সরু দ্রোণীর ভিতর দিয়ে এই খাল থেকে জল বয়ে গেছে।

উজবেক প্রবাদে বলে, 'মরুভূমিতে তৃষ্ণার্তকে এক ফোঁটা জল দিলে শত জনমের পাপ মুছে যায়।' রেলগাড়ি, জাহাজ বা বিমান, যাতে করেই উজবেকিস্তানে ঘোরা যাক না কেন এখানকার আসল জিনিস হল নদী আর প্রধান প্রধান সেচনালী। উজবেকিস্তানের ভূগোলের চাবিকাঠি হল জল।

সম্ভবত পৃথিবীর আর কোন দেশের সীমানা উজবেকিস্তানের মত এত বিক্ষিপ্ত নয়। বিভিন্ন পাহাড় থেকে নেবে-আসা ও বিভিন্ন বয়ে-যাওয়া নদীর চারপাশে গড়ে-ওঠা প্রাচীন মরূদ্যানের পাশে উজবেকরা বাস করে। বিরাট অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত তাসখন্দ, ফেরঘানা, জরাফশান, কশ্‌ক-দরিয়া, সুরখান-দরিয়া ও খরেজ্‌ম্‌ মরূদ্যান শুকনো স্তেপ, মরুভূমি আর পাহাড়ের দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এদের একমাত্র যোগসূত্র হল রাস্তা আর রেললাইন এবং ছোট ছোট নদী পারে ফলের বাগানশুদ্ধ মাঝে মধ্যের ছোট ছোট মরূদ্যান।

উজবেকিস্তান মরূদ্যানগুলির সব চাইতে বেশী খ্যাতি কিসে? তাদের 'সাদা সোনা', অর্থাৎ তুলোর জন্য — উজবেক জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলোর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করে। অন্যান্য কৃষিসম্পদের জন্যও উজবেকিস্তান বিখ্যাত (সোভিয়েত ইউনিয়নের কারাকুলের দুই তৃতীয়াংশ এখান থেকে সরবরাহ হয়। এখানকার কারাকুল পৃথিবীতে সেরা। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধেক রেশম, অর্ধেকেরও বেশী চাল, প্রচুর ফল এবং তার 'সবুজ সোনা', লুসার্ন বীজের—পশুখাদ্য বিশেষ — বেশীর ভাগই এখানে জন্মায়। এই লুসার্ন বীজও পৃথিবী খ্যাত), কিন্তু সবকিছুকে টেক্কা মেরেছে এর তুষার সাদা কার্পাস তুলো।

প্রায় দু'দশক আগে খ্যাতনামা সোভিয়েত বিজ্ঞানী আকাদেমিশ্যান ফের্সমান লেখেন: '... যাঁরাই মধ্য এশিয়াতে অনেকবার গেছেন তাঁরাই জানেন যে এই অঞ্চলে তুলা উৎপাদনের উপর বলতে গেলে সর্বাধিক নজর দেওয়া হয়: সম্বৎসর গাছ লাগান, জল দেওয়া ও ফসল তোলার কাজ চলে। শরৎকালে তুলো সংগ্রহের সময় যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের মজুরেরা যখন উজ্জ্বল রঙীন পোষাকে ক্ষেতের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে, নতুন ফসল কাটার যন্ত্র যখন রোদে চকচক করতে থাকে তখন আমাদের দেশের লঘু শিল্পে মধ্য এশিয়ার প্রচণ্ড গুরুত্ব তথা তুলোর উপর তার সর্বাত্মক নজর দেওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যায়।

'তুলোর জন্যই মধ্য এশিয়াকে শিল্পায়িত করা দরকার, কারণ প্রচুর ফসলের জন্য চাই ফসফেটিক, নাইট্রোজেন বা পটাসিক রাসায়নিক কৃত্রিম সার। তুলো উৎপাদনের জন্য আবশ্যক ফসফেট, পটাস সল্ট ও নাইট্রোজেনের নিষ্কাশন, দরকার সালফিউরিক ও নাইট্রাস অ্যাসিড উৎপাদনকারী রাসায়নিক শিল্প এবং অন্যবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, চাই গৃহ নির্মাণ, অগ্নি-নিবারণ, অ্যাসিড-নিরোধ ও পথ-তৈরীর পাথর। মধ্য এশিয়ায় কল কারখানা চালাবার জন্য চাই তেল, যানবাহন চালু রাখার জন্য কয়লা, রাস্তা সমান বা বিটুমেন রাস্তা নির্মাণ

করবার জন্য এ্যাসফল্ট, বাগানকে পরাগ যোগাবার জন্য সালফার। সাইবেরিয়া বা মস্কো থেকে প্রতিটি পেরেক আনার দায় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চাই ধাতু।'

আজকের উজবেকিস্তানে এ সবকিছুই আছে। পাঁচ-সালা পরিকল্পনাগুলির সময় উজবেকেরা মহান অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে:

সেই প্রাচীন কামারশালা, যেখানে গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে চামড়ার পেটি-দিয়ে-ঝোলান ঘোড়ার পায়ে লোকেরা নাল লাগাত, আজ সেখানে সর্বাধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের মান অনুযায়ী খোলা চুল্লি ও রোলিং মিলসহ উজবেক ইস্পাত কারখানার সৃষ্টি হয়েছে;

সেই চাকা যার উপরে কুমোররা তাদের জিনিস বানাত, আজ সেখানে হাইড্রলিক টারবাইন, কমপ্রেসর, এক্সকাভেটর, ডিজেল ইঞ্জিন, ক্রেন, তুলো চাষের যন্ত্র, ওয়াটার-ফ্রেম, স্পিড-ফ্রেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য বিরাট কারখানা বসেছে;

সেই সেকেলে তাঁতশালা যেখানে প্রাচীন তাঁতে মোটা কাপড় তৈরী হত, আজ সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচাইতে বড় রেশম ও কাপড়ের কল দাঁড়িয়ে আছে;

সেই রাস্তার ধুলো, যাকে একসময় 'দেখান' বা চাষী সার হিসেবে ব্যবহার করত, তার বদলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ সারের কারখানা চির্চিক ইলেকট্রোকেমিক্যাল ওয়ার্কসে উৎপন্ন সার এখন ব্যবহার করা হয়;

সেই কম্পমান তেলের প্রদীপ চিরাকের বদলে আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র — ফর্হাদ জলবিদ্যুৎ স্টেশনের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া এমন আরও ডজনখানেক শক্তিশালী বিদ্যুৎ স্টেশন আছে যা বিপ্লবের আগে জার-শাসিত রাশিয়ার সমস্ত বিদ্যুৎ স্টেশন অপেক্ষা বেশী শক্তি উৎপন্ন করে;

সেই ব্যক্তিগত চাষী খামার যার সম্বল ছিল ওমাচ (এশিয়ায় ব্যবহৃত রুশ কাঠের লাঙলের অনুরূপ) এবং মালা (প্রাচীন কাঠের মই), তার বদলে গড়ে উঠেছে বৃহৎ যৌথখামার। সেখানে আছে ট্র্যাক্টর, কম্বাইন হারভেস্টর, তুলো তোলা যন্ত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম;

সেই মক্তব (প্রাথমিক বিদ্যালয়) যেখানে বাই-এর (স্থানীয় ধনী) দুলালরা অর্থ না বুঝে আরবী ভাষা মুখস্থ করত আজ সেখানে স্থাপিত উজবেকিস্তানের বিজ্ঞান আকাদমী;

সেই ভ্রাম্যমাণ গাইয়েদের বদলে আজ তৈরী হয়েছে অপেরা ভবন। সেখানকার গায়করা কেবল উজবেকিস্তানেই নয়, মস্কো, প্রাগ, বুদাপেশ্‌তেও প্রশংসা পেয়েছে ...

উজবেকিস্তান সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তুর্কমেনীয়, কাজাখীয়, কিরগিজীয় ও তাজিকীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের সীমান্তে এর অবস্থান,

দক্ষিণে আফগানিস্তান। ইতালীর চাইতে আকারে অনেক বড় এবং জনসংখ্যা (৭৩ লক্ষ) প্রায় অস্ট্রেলিয়ার সমান। এক কথায় উজবেকিস্তান একটি বিরাট রাষ্ট্র।

প্রতিটি প্রধান উজবেক মরুদ্যানের নিজস্ব ইতিহাস আছে। কোন না কোন সময় এর প্রত্যেকটিই এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। প্রত্যেকটিরই প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এবং নিজস্ব রীতিনীতি আছে। উজবেকদের খ্যাতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাল তৈরীর জন্য, সেই দ্রুতগতি লৌকিক নির্মাণ কাজের জন্য যৌথখামারীরা যখন সমগ্র প্রজাতন্ত্র থেকে এক সঙ্গে জড় হয়, যে কোন অভিজ্ঞ দর্শক পোষাকের কারুকার্য বা তাদের তুবেতেইকা দেখে বলে দিতে পারে ওদের কে এসেছে রৌদ্রালোকিত খরেজ্‌ম্‌, সমৃদ্ধ ফেরঘানা বা ডালিমকুঞ্জে পাখি-ডাকা কশ্‌ক-দরিয়ার গ্রাম থেকে।

তাসখন্দ

মরূদ্যান

১। তাসখন্দের উত্তরাধিকার

তাসখন্দ! রাস্তাঘাটের বিরাট সংযোগস্থল। সোজা বড়ো রাস্তাগুলো, পাতার সবুজের ফাঁক দিয়ে এ্যাসফল্ট চকচক করছে। চওড়া-পাতা লাইম গাছ আর মজবুৎ ওকেরা রাস্তাকে চাঁদোয়ার মত ঢেকে রেখেছে। খেলার সরঞ্জাম, বই, পাঁচ-মিশেলী জিনিসের দোকান, রেস্তোরাঁ ও কাফের প্লেট কাঁচ-ঢাকা জানলা সামিয়ানা দিয়ে ছাওয়া, নীচে ঠাণ্ডা আবছা অন্ধকার। রাস্তার স্ট্যাণ্ডে ফুল, আইস্ক্রীম, খবরের কাগজ ও অন্যান্য পত্রিকা বিক্রি হচ্ছে। মোটরে করে গেলে দু'একটা রাস্তায় নজরে পড়ে জলের পাইপ, বৈদ্যুতিক তার বা নর্দমার জন্য কাটা ট্রেঞ্চ। অন্যান্য রাস্তাগুলো তকতকে।

তাসখন্দ, উজবেকিস্তানের রাজধানী! কোন কোন পুরোনো বাড়িতে সোনালী হরফে লেখা মার্বেল পাথরের ফলক দেখলে মনে পড়ে সহরটি একসময় ছিল সমগ্র মধ্য এশিয়ার বৈপ্লবিক কেন্দ্র। মন্ত্রিদপ্তরের সামনে সারি সারি মোটর। হোটেলে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র থেকে আসা লোকের বিভিন্ন ভাষা। রাস্তার উপর ছায়া ফেলে চকিতে একটা বিমান চলে যায়। তাসখন্দের লোকেরা ওর গতিবিধি দেখে বলে দিতে পারে ওটা কোথায় যাবে, আলমা-আতা, স্তালিনাবাদ বা মস্কোয়।

গ্রীষ্মে বা শরতে এলে পৌঁছনোর দিনটিতে তাসখন্দকে এমনি মনে হবে, কিন্তু এটা শুধু প্রথম পরিচয়। উজবেক রাজধানীকে ঠিক ভাবে দেখতে হলে এখানে কয়েকদিন অন্তত থাকতেই হবে।

'স্থানীয় লোক মাটির পাত্রে যা দেখতে পায় তা দেখতে হলেও বিদেশীর চাই আয়না,' — একটি উজবেক প্রবাদ। তাসখন্দের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের মহিমা কত

বিশাল তা বুঝতে হলে আগেকার অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। কেউ যদি শুধু নতুন রাস্তাঘাট আর শ্রমিকদের নয়া বাসস্থানগুলো দেখে, আগেকার দিনের শেষ হয়ে আসা চিহ্নাবশেষের সঙ্গে পরিচিত না হয় তা হলে সে সমাজতন্ত্রী তাসখন্দের এমনকি সবচাইতে সুন্দর রাস্তার বৈশিষ্ট্যকেও ধরতে পারবে না, অন্যান্য বহু জিনিসের কদর করতে পারবে না সে।

প্রাক-বিপ্লব আমলে উজবেকিস্তানে অন্যান্য সহরের মত তাসখন্দে দুটো ভাগ ছিল, তথাকথিত পুরোনো সহর ও নূতন সহর, অর্থাৎ আগেকার এশীয় অংশ ও আগেকার রুশ অংশ। সোভিয়েত নরনারী বহুদিন আগে থেকেই এই ভেদ রেখাকে লোপাট করেছে, বর্তমানে তারা এই দুই সহরাঞ্চলের পার্থক্যকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেওয়ার কাজ করছে। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তাসখন্দের স্থান ষষ্ঠ এবং আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়, প্রায় মস্কোর সমান। এরকম একটা সহরের পুনর্গঠন রাতারাতি হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে উজবেকিস্তানের অন্যান্য বড় বড় সহরের মত বিশাল পুনর্গঠনের কাজ সত্ত্বেও, তাসখন্দের পুরোনো ও নূতন সহরের মধ্যে বাহ্যিক আকৃতির বৈসাদৃশ্য আছে।

তুর্কিস্তান রুশ অঞ্চলে পরিণত হওয়ার সময় থেকে পঞ্চাশ বছরের বেশী হবে, আনখোর খাল দিয়ে ভাগ করা এই পুরোনো ও নূতন সহর পাশাপাশি বাস করছে, প্রায় না মিলে।

পুরোনো সহরে কোন তাঁতী সুতো ছেড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্য এড়াবার জন্য দ্রুত মন্ত্র আওড়াত। মিনার থেকে সেবকদের নামাজে আহ্বান জানাত দীর্ঘ সুরে আজান। মাটির দেয়াল দেওয়া আঁকাবাঁকা গলির ভিতর দিয়ে পারানজা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া কোন উজবেক স্ত্রীলোক ছায়ার মত চলে যেত, ঘোড়ার লোমের কালো জাল দিয়ে তার মুখ ঢাকা। কোন উজবেক দূরে দেশে গেলে তার স্ত্রী স্বামীর জন্য নিঃসঙ্গ বোধ করে চিঠি পাঠাত না, কারণ সে লিখতে জানত না, পাঠাত এক গোছা খড় আর এক টুকরো কাঠকয়লা। এর অর্থ হল, 'তোমা বিহনে আমি খড়ের মত হলদে আর কাঠকয়লার মত কালো হয়ে গেছি।'

আনখোর খালের অপর পারে সেণ্ট সেগির্য়েভস্কায়া গির্জার প্রবেশ মুখে, সন্তের জন্মদিনে ভিখিরীর দল লাইন বেঁধে সুসজ্জিত কর্মচারী এবং বণিক ও তাদের পরিবারবর্গের কাছে ভিক্ষা চাইত। তাম্বভ বা সুদূর রুশ কোন সহরের মত এখানেও সহরের পার্ক থেকে ব্র্যাস ব্যাণ্ড দলের বাজান ওয়াল্‌জ্‌ 'মাঞ্চুরিয়ার পাহাড়ে'র সুর

ভেসে আসত। জনৈক আদালত মুহুরি উজবেক ভাষা জানা না থাকায় উজবেক বণিকের অভিযোগ না বোঝা সত্ত্বেও ঘুষ নিয়ে ভাবত সময়ে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে. গরমে সিদ্ধ হয়ে অবসন্নভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড় বিড় করে উঠত, 'এই এশিয়াবাসীগুলো!..'

প্রাক-বিপ্লব তাসখন্দে রুশ কর্মচারী ছাড়াও হয়ত দেখা যেত রাশিয়া থেকে আগত কোন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদকে (তিনি পুরোনো সহরের বাজারের কাছে বসে সাগ্রহে উজবেক পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টোতেন)। ঐ সঙ্গে দেখা যেত হয়ত আরও দু'একজন নিঃসঙ্গ বৈজ্ঞানিককে। জার সরকারের দ্বারা দূরবর্তী অঞ্চলে নির্বাসিত 'রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি' তাসখন্দে এসে হাজির হত, যেমন এসেছিল প্রথম রুশ শ্রমিক দল, বেশীর ভাগই রেল শ্রমিক। রুশ শ্রমিকদের চেষ্টায় কী ভাবে উজবেক জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রবেশ করেছিল সে কথা পরে বলব।

কিন্তু এখন আমি বলব গত শতাব্দীর শেষভাগের একটি মনোজ্ঞ লোকের কথা। ইনি উজবেকদেরই একজন, জ্ঞানদাতা। সেই জার আমলের অন্ধকার যুগেও মোসলেম ধর্মোন্মাদনা ও কূপমণ্ডূকতা দূর করার মত যথেষ্ট শক্তির পরিচয় ইনি দিয়েছিলেন। সাহসে ভর করে আনখোর পার হলেন, নতুন ও প্রগতিশীল কোন্ কোন্ জিনিস রুশিদের নতুন সহর থেকে তাঁর নিজের পুরোনো সহরটিতে আনা যায়, তাই দেখার জন্য।

এঁর নাম জাকিরজান খাল মহম্মদ। কিন্তু উজবেকরা তাঁকে তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনামে চেনে, জানে ফুরকাত বলে। ১৮৮৯ সালে তিনি কোকন্দ থেকে তাসখন্দে আসেন এবং সেখানে রুশ ভাষা শেখেন। পুশকিন, লেরমন্তভ ও নেক্রাসভের কবিতা পড়ে তাঁর খুব ভালো লাগে। জার শাসনের ঘোর বিরোধী হলেও তিনিই হলেন প্রথম উজবেক যিনি তাঁর দেশবাসীর ভাগ্য নির্ধারণে রুশ সংস্কৃতির মহান তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। তিনি সোৎসাহে রুশ বিজ্ঞানের সারবত্তা এবং রুশ রঙ্গমঞ্চ, বিদ্যালয় ও প্রদর্শনী সম্পর্কে আলোচনা করেন, তুর্কিস্তানের প্রথম ছাপাখানাগুলোর কথা বলেন এবং উজবেকদের রাশিয়ায় গিয়ে তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের পরামর্শ দেন। সুপরিচিত তাজিক জ্ঞানদাতা আহ্‌মদ মাখদুমের সঙ্গে তিনি ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, উন্মত্ততা, জড়ত্ব ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সোৎসাহে সংগ্রাম চালান।

আভাজ, হম্‌জ, আইনি ও অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকগণ ফুরকাতের ধারণাসমূহকে গ্রহণ করে নিজেদের রচনায় তাদের রূপায়িত করতে থাকেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে পুরোনো সহরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বর্ণমালার বই, ছোটদের জন্য নীতিবাচক গল্প সেই প্রথম রচিত হয়। ক্রিলভের উপাখ্যানের উজবেক অনুবাদ বেরোয়। এ কথা

মনে করলে অবশ্য ভুল হবে যে এই নতুন জ্ঞানের ভাবধারা ব্যাপক ছিল। ফুরকাত ও তাঁর অনুচরদের কার্যকলাপ ছিল তমসালোকে এক ফোঁটা আলো মাত্র।

যার বিরুদ্ধে ফুরকাত সোৎসাহে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সেই মোল্লাসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিল জারীয় উপনিবেশিকরা। জনসাধারণ যাতে শিক্ষার আলো না পায়, সে জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়, রঙ্গমঞ্চ এবং জ্ঞানার্জনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছিল জারীয় নিগড়ে আবদ্ধ। এগুলিকে প্রায় ক্ষেত্রেই বন্ধ করে দেওয়া হত। এ অবস্থায় নূতন আলোর অগ্রদূত ফুরকাতকে যে তাঁর নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হল এতে বিস্ময়ের কিই বা আছে। আর মহান অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পাঁচ বছর আগেই ১৯১২ সালে খিবার কবি আভাজকে খিবাতে দেওয়া হল কঠোর দৈহিক শাস্তি। তাকে পাগল বলে ঘোষণা করা হয়। এর একমাত্র কারণ তিনি তাঁর দেশবাসীকে রুশদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে বলেছিলেন। এ সব কথা জানার পর দেশবাসীর সুখী ভবিষ্যতে পূর্ণ আস্থাশীল ফুরকাতের রচনা পড়ে বিশেষভাবে অভিভূত হতে হয়।

সেই ভবিষ্যৎ এখন এখানে মূর্তি নিয়েছে। শুদ্ধির যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায় রুশ সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে, উজবেকিস্তান তা থেকে বাদ পড়েনি। আজকের তাসখন্দের পথেঘাটে তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু দেশ পরিক্রমা সুরু করার আগে নূতন সহরের অন্যতম সুন্দর রাস্তা পুশকিন স্ট্রীটে আমার যে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে তার বর্ণনা দিই।

২। আর্সলানভের যাত্রী দল

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকাল। পুশকিন স্ট্রীট তখনও এখনকার মতই চওড়া, কিন্তু তার ওপর তখন বহু তলা বাড়িগুলো ছিল না। রক্তবর্ণ ভারতীয় ক্যানাফুলের সারিও ছিল না তখন এর পাশে, রাস্তাগুলো এ্যাসফল্ট বাঁধান হয়নি। পথের যে পাশে ট্রাম লাইন পাতা কেবল সেই পাশটা ছিল নুড়ি পাথর দিয়ে বাঁধা। রাস্তার মাঝখানটায় মধ্য এশিয়ার বহুদিনকার ধূলি।

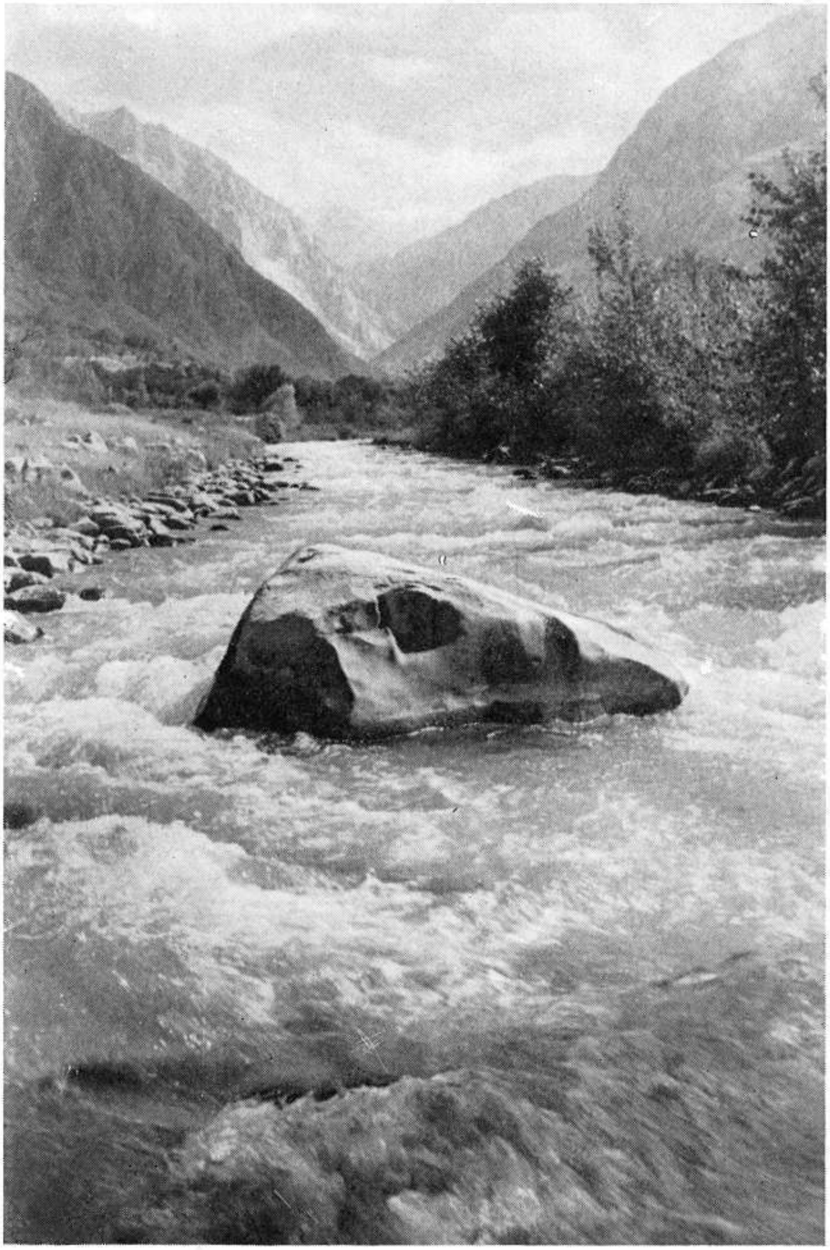
একদিন দূর থেকে দেখতে পেলাম পাশের রাস্তা থেকে পুশকিন স্ট্রীটে একটা ধূলোর মেঘ ছুটে আসছে, ঘূরপাক খেয়ে এগিয়ে এসে পপলার গাছের মাথা পর্যন্ত পুশকিন স্ট্রীটকে ভরাট করে ফেলে মোড় ঘুরে আমার দিকে এগিয়ে এল। এর সামনে লাল রঙের খিবার পোষাক-পরা একজন ঘোড়সওয়ার।



তাসখন্দের কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিস।

তাসখন্দের একটি পাইওনিয়র দলকে সম্বোধন করছেন কবি গফুর গুলাম।





তিয়েন শান পর্বতমালার পাদদেশে নীল সাই নদী।

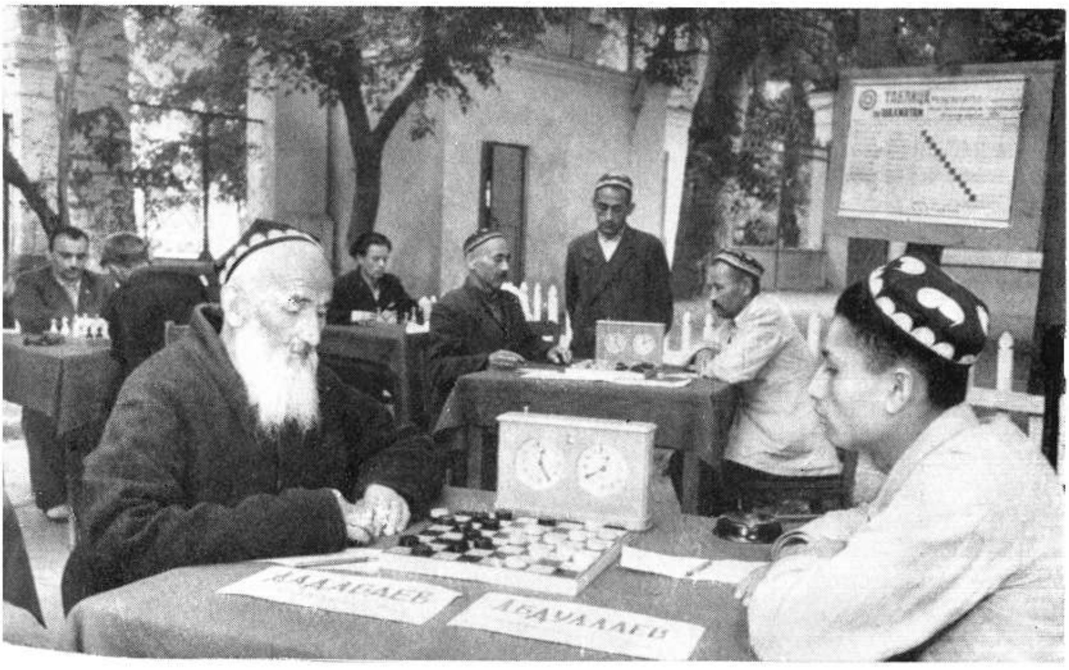


তাসখন্দের কমসোমল হ্রদ।



তাসখন্দের আনখোর খালের একটি দৃশ্য।

তাসখন্দে অনুষ্ঠিত উজবেক দাবা ও ড্রাফটস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীরা



ধূলোটা এগিয়ে আসতে আমি চাকার শব্দ, চাবুকের সপাসপ, উটের ঘণ্টাধ্বনি, সজীব কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ধূলোর ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম ঘোড়ায় আর উটে চড়া অগ্রবর্তী সওয়ারদের আর আরাবাস বা বলদ টানা গাড়ি-ভর্তি লোকের মূর্তি, পরনে আলখাল্লা, মাথায় তুবেতেইকা আর ভেড়ার লোমের টুপি।

সামনের সওয়ারটি "ওহে ছোকরা!' বলে আমাকে উজবেক ভাষায় ডাকল।

ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতে খিবাবাসীটিকে আমার চাইতে মাত্র বছর খানেকের বড় মনে হল। সে আমার দিকে একখানা কাগজ মেলে ধরে জিজ্ঞেস করল সেচ বিদ্যালয় কোন দিকে। কাগজটিতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ঘোড়সওয়ারকে রাস্তা দেখাবার জন্য ওর পাশে পাশে চলতে লাগলাম।

আধ ঘণ্টা বাদে আমাদের পিছন পিছন পাক খেয়ে আসা ধূলোর মেঘ সেচ বিদ্যালয়ের কাছে জমায়েৎ হল। এক গাদা তরুণ উজবেক (এবং পোষাক দৃষ্টে কয়েকজন তুর্কমেন ও কাজাখ) ও তাদের ঘোড়া, উট ও আরাবাস ছোট্ট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণটি ছেয়ে ফেলল। উপচে-পড়া লোকের দল গেটের বাইরে একটা বিচিত্র শিবির রচনা করল। সন্ত্রস্ত পাহারাদার খবর দিল বিদ্যালয়ের প্রধানকে। তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে এসে হাজির হলেন। তখন অবাক হওয়ার মত প্রথম ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল, অর্থাৎ যে দু'শ ছাব্বিশ জন তরুণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসেছে তাদের কাছে আছে একটিমাত্র আমন্ত্রণ পত্র। সেটা তরুণ খিবাবাসী আর্সলানভের নামে, যে এদের সবাইকে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু এই দলের ইতিহাসটি আরো বিস্ময়কর। তাসখন্দের বিভিন্ন স্কুলে লোকগুলি ভর্তি হবার পর আমি সেটা জানতে পারি।

তখনকার খরেজ্‌ম গণ প্রজাতন্ত্রের একটি গ্রামে একদিন সেচ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আমন্ত্রণ পত্র পাঠান হয়। আকসাকাল, অর্থাৎ গ্রামের মাতব্বর, কমসোমলের (যুব কমিউনিস্ট সঙ্ঘ) সদস্য আর্সলানভের হাতে এটিকে দেয়। সে সময় খরেজ্‌ম্‌ ছিল মধ্য এশিয়ার সুদূরবর্তী লোকালয়ের বাইরে একটি জেলা, তখনও পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত নয়। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য মরূদ্যানের মত কমিউনিস্টদের আনা নূতন ভাবধারা সেখানে তত জোরদার ছিল না। অন্যান্য জায়গার চাইতে এখানে অতীতের কুসংস্কার ছিল অনেক বেশী জোরালো। আর্সলানভ উজবেক মহাকাব্যের নায়কদের মত একজন হবার স্বপ্ন দেখত, সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে সে স্কুলে ভর্তি হবার কোন তাগিদ অনুভব করল না। 'অস্থিসার কেরাণীর মত বসে বসে কালিতে কলম ডোবানকে'

পুরুষের পক্ষে লজ্জার বিষয় বলে মনে করে সে। কিন্তু চেষ্টা করেও আমন্ত্রণকে সে এড়াতে পারল না। গত্যন্তর নেই দেখে মহাকাব্যের নায়কের মতই ঘোড়া জুতে, মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাতব্বরকে প্রচুর শাপশাপান্ত করে রওনা হল।

খিবা সহরে পেঁৗছে সে রাত কাটাবার জন্য একটা সরাইয়ে উঠল এবং তার সমবয়সী সরাইখানার মালিকের ছেলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। সে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করাতে মহাকাব্যের নায়কের মতই আর্সলানভ উত্তর দিল, 'যেখানে ঘোড়া আমাকে নিয়ে যাবে সেইখানে।' তার নতুন তরুণ বন্ধুটি ওকে জানাল সেও স্কুলে যাবার স্বপ্ন দেখছে—নতুন ভাবধারা তাকে ইতিমধ্যেই পেয়ে বসেছে। খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর্সলানভ তাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাইল, কোমরবন্ধ থেকে বার করল কাগজখানা, কিন্তু আমন্ত্রণটা যেহেতু আর্সলানভের নামে তরুণরা ঠিক করল তাসখন্দে ওটাকে বদলে নেবে; তা ছাড়া তাসখন্দ দেখাই বা মন্দ প্রস্তাব কি। সকালবেলা তারা খিবা ছাড়ল।

পরের গ্রামটিতে আরও দুজন জোয়ান ওদের সঙ্গী হল। গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর পেরুবার সময় তরুণ চাষী, মেষপালক আর কারিগর স্কুলে ভর্তি হবার আগ্রহ দেখিয়ে দলে দলে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। এ যেন একটা তুষারগোলক যা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে হিমবাহে পরিণত হয়, পথের সবকিছুকে উদ্দামগতিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যে জায়গা সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান, যেখানে মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বের কথা সবার ওপর ঘোষণা করা হয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে উন্মুক্ত বাতায়ন সেই তাসখন্দের যত কাছে আসে তত স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে কতটা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সে সহর, কত লোক সেই আলোতে আর সেই জগতে প্রবেশ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠছে। কমিউনিস্ট ভাবধারার মধ্যে যে সত্য নিহিত তা ইতিমধ্যেই সুদৃঢ় শিকড় গেড়েছে। অনেকেরই প্রয়োজন ছিল সামান্য একটু বাড়তি অনুপ্রেরণার যাতে তারা বাড়ি ছেড়ে স্কুলে যেতে পারে। আর্সলানভের দলটি এই অনুপ্রেরণার কাজ করল।

ভাগ্যের খেয়ালে দলশুদ্ধ নেতার পদ লাভ করে এবং সগর্বে তার নব-লব্ধ পদটিকে রক্ষা করে আর্সলানভ চলার পথে গ্রামবাসীদের তার দলে যোগ দেবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগল। প্রথমটায় সে সঙ্কোচের সঙ্গে একাজ সুরু করে, কিন্তু পরে ক্রমশ বেশী উৎসাহে এ কাজ চালাতে থাকে। যা প্রায়ই ঘটে থাকে, অপরকে জ্ঞানার্জনের উপকারিতা বোঝাতে গিয়ে সে নিজেও এর উপকারিতা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হল।

এই ভাবে সৃষ্টি হল এই অসাধারণ দলটির।

৩। আনখোরের পুল

আর্সলানভের দল তাসখন্দে পেঁাছবার পর কত দিন কেটেছে? কয়েক শতাব্দী। পুরোনো ও নূতন সহরের আগেকার সীমান্তে গিয়ে আনখোরের পুলটিতে পা দিন। তিরিশ বছর আগে ওখানকার লোকরা (ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ভাষায়) সহজেই বিংশ শতাব্দী থেকে চলে যেত একাদশ*শতাব্দীতে, একেবারে সেই মধ্য যুগে। আর ঠিক তেমনি সহজেই তারা শতাব্দীগুলি পেরিয়ে ফিরে আসত কাঠের পুলের উপর পায়ের শব্দ তুলে।

একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন এখন। যে নূতন পুলের উপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেটা এমন কিছু আহা-মরি নয়, একটা সাধারণ পাথরের পুল, ছোট্ট, চওড়া ও শক্ত। পুরোনো সহরে বাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি নূতন দালান—সাধারণ চারতলা বাড়ি, জানালা দিয়ে আসে প্রচুর আলো, শোনা যায় টেলিফোনের আওয়াজ আর সন্ধ্যাবেলা পিয়ানোর সঙ্গীত।

এখান থেকে সুরু হয়ে পুরোনো সহর পেরিয়ে যে নাভোই স্ট্রীট চলে গেছে তাতেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। উজবেক রাজধানীতে যেমনটি দেখা যায় তেমন একটি প্রশস্ত রাস্তা, দু'সারি ল্যাম্প দূরে মিলিয়ে যায় আর চার সারি করে গাছ রাস্তার পাশে, কিন্তু এখনো ওগুলো এত বড় নয় যাতে পথের উপর ছায়া ফেলতে পারে। দু'সারি করে বাড়ি, এর কতকগুলি বারান্দাওয়ালা বসবাসের ঘর গঠনশৈলী চিরাচরিত উজবেক পদ্ধতির। কতকগুলির গঠনভঙ্গী প্রাসাদের মতো, ছাঁচ করা কার্নিশ ও থাম, তাতে গ্র্যানাইট পাথরের চওড়া সিঁড়ি। নাভোই স্ট্রীটের এখানে সেখানে শেষ-না-হওয়া বাড়িও দেখা যায়, ওগুলোতে ভারা বাঁধা, ভেজান সিমেণ্ট ও কাঠের চাঁছের গন্ধ। পুরোনো সহরের চিহ্নও নজরে পড়ে। মাটির দেয়ালে কাজ করা কাঠের দরজা, অথবা চাখানার চাঁদোয়া এবং তার নীচে কার্পেট ঢাকা বেদী দেখতে পাওয়া যায়।

রাজধানীর উপযুক্ত মোটরের ইতস্ততঃ আনাগোনা, খস খস শব্দে এ্যাসফল্টের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে তাদের টায়ারগুলো, মাথার উপর ট্রাম ও ট্রলিবাসের ট্রলি থেকে নীলচে স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক মারছে। আর দেখা যাচ্ছে লোকের ভিড়। স্টাইলের টুপি-পরা লোকের পাশেই দেখা যাচ্ছে উজবেক মেয়ের মাথায় রংদার হাতের কাজ করা তুবেতেইকা, আর তারই পাশে মালার মত জড়ান কালো চুলের বেণী; অফিস কর্মচারীদের হাতে পোর্টফোলিও; স্কুলের ছেলেরা চলেছে লাফাতে লাফাতে, তাদের পড়ার বই বেল্টের নীচে গোঁজা; আইসক্রীম বিক্রেতারা চলেছে হাতগাড়ি ঠেলে। জল-দেওয়ার মোটর গাড়ি রাস্তায় জল ছিটোয়। সূর্যের

আলো থেকে থেকে হঠাৎ রামধনু রচনা করছে। যে কোন সোভিয়েত রাজধানীর মত এখানেও প্রাণের স্পন্দন।

কিন্তু এই রাস্তা আর এই পুলটিকে অন্য দৃষ্টিতেও দেখা চলে।

উদাহরণ স্বরূপ তুবেতেইকা মাথায় ঐ মেয়েটিকে ধরা যাক। এরই বড় বোন হয়ত, মা'র কথা ছেড়ে দিন, এক অন্ধকার রাতে এই রাস্তা ধরে (সে সময় আরো সরু রাস্তাটার নাম ছিল শেখান-তাউরস্কায়া স্ট্রীট) শঙ্কায় শ্বাস রোধ করে চার দিকে চাইতে চাইতে এই পুলের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। আগের দিন কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে সে তার চাচভান (ঘোড়ার লোমের অবগুণ্ঠন) ছুঁড়ে ফেলে সগর্বে মাথা উঁচু করে বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় ধর্মোন্মাদরা তার সবচাইতে প্রিয় বান্ধবীকে ছোরা মেরে হত্যা করেছে। তখন গভীর রাতে আশ্রয়ের আশায় সে পালিয়ে এসেছে নূতন সহরে। তার মত কত মেয়ে এই পুল ত্বরিতে পার হয়ে গেছে! উজবেক ইতিহাসের সে এক যুগ বটে।

কিম্বা ধরা যাক কালো মোচওয়ালা ঐ উজবেকটিকে যে দিনের কাজ সেরে মোটরে করে পুরনো সহরে বাড়ি ফিরছে। খুব বেশী দিনের কথা নয় যখন এর ভাই নূতন সহরের নূতন ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য তার জিনিসপত্র নিয়ে বলদ-টানা গাড়িতে এই পুল পেরিয়েছে। সেও বেশী দিনের কথা নয় যখন সে তার ভাইয়ের কেনা জিনিসপত্র দেখে সুবিধের কথা ভেবে, নিজে একটা ছোট্ট আলমারি, ডেস্ক ও বইয়ের তাক কিনে সবকিছু নিয়ে গেছে পুরোনো সহরে একটা বলদ-টানা গাড়িতে। সে যে সেই বছরে শরৎকালে কলেজের প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন জানাল তার পিছনে কি তাকের বইগুলি নয়? কয়েকবছর বাদে বস্ত্রবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে সে তার ছাত্রাবস্থায় তাসখন্দে যে বিরাট কাপড়ের কল তৈরী হয়েছিল তাতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছে।

এই পুলের উপর দাঁড়ালেই আমার মনে পড়ে যায় বলদ-টানা গাড়িতে দলে দলে উজবেক পরিবার চলেছে পুরোনো জগৎ থেকে নূতন জগতে অর্থাৎ নূতন সহরে। অথবা সারি সারি গাড়ি চলেছে উল্টো দিকে, নূতন জগৎ এসে হাজির হচ্ছে পুরোনো পৃথিবীর সামনে, সঙ্গে নিয়ে প্রথমত গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, পরে নূতন হরফে ছাপা গাদা গাদা বই, বেতার যন্ত্র, ড্রইংবোর্ড, স্লাইড রুল প্রভৃতি। উজবেক জাতির ইতিহাসে সেও এক যুগ ছিল বটে।

আমাদের সবকিছুই এক সঙ্গে করতে হয়েছে: আধুনিক ধরনের কারখানা নির্মাণ, প্রথম অপেরা সৃষ্টি, প্রথম প্রসূতিভবন স্থাপন। দুষ্ট আজিনা বা ডাইনীরা বাচ্চাদের উপর ভর করবে না, এই ভরসা দিয়ে মেয়েদের এখানে ভর্তি করবার জন্য বার বার অনুরোধ জানাতে হয়েছে। কোন স্ত্রীলোকের আত্মীয়া যদি প্রাচীন রীতি মাফিক তার শিয়রে একটা চাপাটি

রাখত অথবা কোন দোয়া বা দাইকে সঙ্গে এনে তাকে দিয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডে মন্ত্র পড়াত আর ইসরিক (এক ধরনের গুল্ম) পুড়িয়ে প্রসূতি ও তার সন্তানকে ধোঁয়া দেওয়াত, তাও প্রথমটায় আমাদের উপেক্ষা করতে হত।

এখন এসব সুদূর অতীতের কথা। নাভোই স্ট্রীট এখন একটি প্রশস্ত আধুনিক রাস্তা। অন্যান্য চওড়া রাস্তা এখন পুরোনো সহরের বুক কেটে চলে গেছে যেমন হমজ, পলিগ্রাফিচেস্কায়া, পেদাগগিচেস্কায়া, শতা রুস্তাভেলি ও বেস আগাচ স্ট্রীট। পুরোনো সহরে এখন জলের নল ও এ্যাসফল্ট বাঁধান রাস্তা, পার্ক, স্ট্যাডিয়াম, কিণ্ডারগার্টেন ও সিনেমা হয়েছে। সোভিয়েত স্থপতিরা কেবল যে সুন্দর সুন্দর বহুতলা বাড়ি বানিয়েছে তাই নয়, বিশেষ ধরনের উজবেক উঠোনওয়ালা ছোট ছোট অনেক আধুনিক বাসগৃহও তৈরী করেছে।

নতুন সহরেও অপূর্ব সরকারী ভবনগুলির পাশে ছড়িয়ে আছে বসবাসের উপযুক্ত উজবেক গঠনরীতির ছায়াশীতল প্রাঙ্গণ। এই সরকারী ভবনের স্থাপত্যকৌশল ও অঙ্গসজ্জার মধ্যেও সহজেই নজরে পড়ে বিশিষ্ট উজবেক শৈলী, সোভিয়েত স্থপতিরা যা সৃজনশীলভাবে নিজের কাজে লাগিয়েছে। এই কারণেই তাসখন্দের প্রাচীন রীতির শিল্পী ও স্থপতিদের মধ্যে প্রখ্যাত তাসপুলাত আস্লানকুলভ বহু নতুন • বাড়ির নির্মাণ কাজে সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছেন।

প্রতি বছর পুরোনো ও নতুন সহরের প্রভেদ ঘুচে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জল, সবুজ গাছপালা, সূর্যালোকে উজ্জ্বল একছন্দে বাঁধা বহু বাড়িঘর দালান নিয়ে একটিমাত্র সমাজতন্ত্রী তাসখন্দের মূর্তি স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে ফুটে উঠছে। আনখোরের পুল পেরিয়ে সহরের চারদিকে ঘুরে বেড়ালে আজকের তাসখন্দে তার ঔজ্জ্বল্য, মহিমা ও জীবনের পূর্ণতা নিয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

৪। বিজ্ঞানীদের সহর

বিপ্লবের বাগানে প্রবেশ করলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পরে প্রায় গোলাকৃতি যে বৃহৎ গণউদ্যানটি সেটি সহর পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থল। এখান থেকে চওড়া রাস্তাগুলো সুরু হয়ে আবছা সুদূরে মিলিয়ে গেছে, দুপাশে গাছের সারি।

বাগানের বেঞ্চে বসে আরাম করার সময় সহরের সকালের সঙ্গীত ও উজবেক রাজধানীর নানা শব্দ শোনা যায়। পদচারীদের পায়ের মিলিত চাপা আওয়াজ, ঢেউ'এর মত ভেসে-আসা কণ্ঠস্বরের গুঞ্জন এবং পাখিদের অবিরাম কাকলী এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে

যাতে মোটর ও ট্রলিবাসের হর্ণের শব্দ ও দূরের রেলগাড়ির হুইসিলও সুন্দর শোনায়। এই সঙ্গীতের সঙ্গে মৃদুভাবে মেশে সেচনালীর ক্ষিপ্র জলের কলধ্বনি। মুহূর্তের জন্য কানে আসে গঙ্গা-ফড়িং'এর উড়বার আওয়াজ। সব কিছু ছাপিয়ে উজবেক লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যময় সুর রাস্তার লাউড স্পিকার থেকে পাৎলাভাবে ওপরে স্পষ্ট উঠে আসে।

কাছাকাছি একটা বুরুজ থেকে মিষ্টি ও নিয়মিত সুরে ঘড়ি বাজে। বাগানের অপর পাশে ঘণ্টাধ্বনি। সহরের গোটা একটা অংশ জোড়া—ধূসর রঙের দালান থেকে দলে দলে তরুণতরুণী বাগানের ভিতর বেরিয়ে আসে। প্রবেশমুখে এদের মনে হয় ঘূর্ণিপাকের মতো। এই দালানটি হল মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে, ঠিক যেমন সাড়ে তিনশ বছর আগে মধ্য এশিয়ার একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় ছিল মাদ্রাসা বা মুসলমান কলেজ। পড়ুয়ারা হুজ্‌রো নামে পাথরের ছোট ছোট খুপরির ভিতর থেকে মহম্মদ কথিত বিষয়বস্তু পড়ত।

আজ যে কোন উজবেক তরুণ এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে সেকেলে এবং ঐতিহাসিকদের বানান গপ্প বলে মনে করে। কিন্তু আসলে যাদের বয়স চল্লিশের ওপর তারা এই 'কাহিনীর' প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আর্সলানভের দলটির পর তিরিশ বছরের মধ্যে উজবেকিস্তানে ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিধি কত দূর বিস্তৃত তা পরিষ্কার হয় এই থেকে যে ১৯১৪ সালে শতকরা মাত্র দু'জন উজবেক লেখাপড়া জানত। এদের বেশীর ভাগই পড়ত ধর্ম পুঁথি। আজ উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রে একজনও লেখাপড়া-না-জানা লোক নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জায়গার মত উজবেকিস্তানের স্কুলেও সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে।

নিম্নলিখিত তথ্য তুলনা করে দেখলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজবেক জনসাধারণের প্রচণ্ড অগ্রগতি আরও বেশী স্পষ্ট হবে। প্রতি ১০, ০০০ লোকের মধ্যে উজবেকিস্তানে ৭১ জন লোক কলেজে যায়, ইউরোপীয় দেশে কলেজের বিদ্যার্থীদের সংখ্যার (১০,০০০ লোকের পিছু) চেয়ে অনেক বেশী।

বেশীর ভাগ কলেজই তাসখন্দে। প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ তরুণী ট্রেনে, মোটরে, আর দূরবর্তী খরেজ্‌ম থেকে আসতে হলে বিমানে রাজধানীতে হাজির হয়। কয়েক বছর বাদে তারা ফিরে যায় ঐতিহাসিক, ইঞ্জিনিয়ার, জীববিদ্যাবিৎ বা কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

মধ্য এশিয়ায় বিজ্ঞানের প্রথম প্রবর্তক রুশরা: সেমিওনভ-তিয়েন-শানস্কি, সেভের্‌ৎসভ,

মুশ্কেতভ, ফেদ্চেঙ্কো, ভ্যাংকিন, শ্রেদের, নাভ্রৎস্কি, বের্গ, ওব্রুচেভ, বারতল্ড ও অন্যান্যরা তখন অতি সামান্য পরিচিত এই অঞ্চলে নিঃস্বার্থভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালান। এর প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনের রীতিনীতির বর্ণনা দিয়ে প্রচুর মৌলিক গ্রন্থ লেখেন এবং তুলো উৎপাদন ও বাগান তৈরীর ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রাথমিক কাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে তাসখন্দে গণ গ্রন্থাগার ও ১৮৭৪ সালে তাসখন্দে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিপ্লবের পর উজবেক বিজ্ঞানীদের প্রথম শিক্ষাদাতাও ছিলেন রুশ বৈজ্ঞানিকরা: ফের্সমান, বরভ্স্কি, প্রতদিয়াকনভ, করজেনেভ্স্কি, রমানভ্স্কি, উক্লন্স্কি, করভিন, আস্কচেন্স্কি, পস্লাভস্কি ও অন্যান্য অনেকে। ১৯২০ সালে মধ্য এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের এক নির্দেশনামায় ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সই করেন। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করার জন্য লেনিন মস্কো ও লেনিনগ্রাদের কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের তাসখন্দে যেতে আবেদন জানান। তাঁরা তাসখন্দে যান এবং তাঁদের কার্যকালের মধ্যে হাজার হাজার স্থানীয় বৈজ্ঞানিককে শিক্ষা দেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এদের বেশীর ভাগই হল উজবেক। পনের-বিশ বছরের মধ্যে এই তরুণ বিজ্ঞানীরা এত সব জিনিস আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানকে এমন এক স্তরে নিয়ে যান যাতে নিজস্ব গবেষণা ইন্স্টিটিউট, গ্রন্থাগার, যাদুঘর ও বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রসহ উজবেকিস্তানে বিজ্ঞান আকাদমী স্থাপিত হয়।

উজবেক বিজ্ঞান আকাদমীর কথা বলার আগে আমি এমন একটি কাহিনীর কথা বলব যা খুব বেশী দিন আগের নয়।

১৯৩৬ সালে মস্কোতে বিজ্ঞানী আ. ওরেখভের রসায়নাগারে ব্যাপারটা ঘটে। সেখানে কর্মীদের মধ্যে ছিলেন জনৈক উজবেক তরুণ বিজ্ঞানী — নাম সবির ইউনুসভ। উনি হলেন তাসখন্দের এক রাজমিস্ত্রীর ছেলে এবং মধ্য এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের স্নাতক। তখন পর্যন্ত তিনি কয়েকটি নূতন উপক্ষার আবিষ্কার করেছেন এবং এরই ভিতর একটির আভ্যন্তরীণ গঠনপদ্ধতি স্থির করার কাজ শেষ করতে চলেছেন।

উপক্ষারের আভ্যন্তরীণ গঠনপদ্ধতি স্থির করা খুবই কঠিন কাজ। উপক্ষার রসায়ন শাস্ত্র দেড় শতাব্দীর আগে সুরু হবার পর বিশ্ব বিজ্ঞানীরা পরিজ্ঞাত ৭০০ উপক্ষারের মধ্যে প্রায় ১৫০টির আভ্যন্তরীণ উপাদান নির্ধারণ করেছেন। এ কাজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা এই তথ্য থেকেই বুঝতে পারা যায় যে কুইনিনের গঠনপদ্ধতির জ্ঞান থাকায় রাসায়নিকরা এক্রিচিন বানাতে পেরেছেন, ঠিক এই ভাবে কোকেনের বিষয়ে জ্ঞান থাকায় নভোকেন ও অন্যান্য জিনিষ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

একদিন সবির ইউনুসভ যখন তাঁর গবেষণা চালাচ্ছিলেন, এক দল বিদেশী উক্ত রসায়নাগার দেখতে এল। ইউনুসভকে দেখে সেই দলেরই একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী ওরেখভকে জিজ্ঞেস করল, 'এ লোকটি কি আপনাদের কোন উপনিবেশের?'

'আমাদের কোন উপনিবেশ নেই,' উত্তর দিলেন আকাদেমিশ্যান ওরেখভ। 'আমাদের ভ্রাতৃসুলভ উজবেক প্রজাতন্ত্রের একজন কমরেড ইনি।'

'কত টাকা দিতে হয় এঁকে?'

'এক পয়সাও না। ওঁর কাজের জন্য সরকার থেকে উনি টাকা পান।'

বিদেশীরা নিজেদের মধ্যে চাওয়াচাউয়ি করে ঘাড় ঝাঁকাল। তারা বিশ্বাসই করতে পারল না যে একজন উজবেক আবার বিজ্ঞানী হতে পারে। কেননা ওদের দেশে আজও পর্যন্ত 'মুসলমানদের আত্মার স্বধর্ম' নিয়ে লেখা একটা ফ্যাশন, কেননা ওদের মতে 'কঠোর কৃচ্ছ্রের সঙ্গে যুক্ত প্রজ্ঞামূলক অন্তদৃষ্টি ও অতীন্দ্রিয় ধ্যান যা প্রাচ্যবাসীদের বৈশিষ্ট্য' তা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 'অনুমান ঘটিত পদ্ধতির' প্রয়োগের অন্তরায়।

যাঁরাই উজবেক বিজ্ঞান আকাদমীতে যাবেন তাঁরাই 'আত্মার স্বধর্ম' সম্পর্কে এই আবিষ্কারের চরম নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পারবেন।

আজ সবির ইউনুসভ আকাদমীর উপক্ষার রসায়নের গবেষণাগারে। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা ইতিমধ্যে উজবেকিস্তানের তিন হাজার গাছপালার উপক্ষারতা নির্ধারণ করেছেন, এ ছাড়া তাঁরা পঁয়ষট্টি নূতন উপক্ষার আবিষ্কার করেছেন। সবির ইউনুসভ নিজে এখন আকাদমীর সহ-অধ্যক্ষ।

আকাদমীতে আরও দেখা যাবে ত. জাহিদভ, জীববিদ্যার ডক্টর। ইনি আকাদমীর সভাপতি। এঁর জীবনেতিহাস সবির ইউনুসভেরই মত এবং অনেক উজবেক বিজ্ঞানীদের রীতিমাফিক। দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম এঁর, লালিত হন এক শিশু প্রতিষ্ঠানে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মধ্য এশীয় রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং মধ্য এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের প্রাণী-জগৎ সম্বন্ধে সবচাইতে নামজাদা বিশেষজ্ঞ হন।

আকাদমীতে দেখা যাবে মাকসুদা সুল্তানভাকেও, যে মহিলাটি উচ্চ পর্যায়ের গণিতের সর্বাপেক্ষা দুরূহ বিভাগে ফলপ্রসূ কাজ করেছেন। খ্যাতনামা সোভিয়েত পদার্থবিদ খ. রহমাতুলিনের বিবরণ শোনা যাক। ইনি সদ্য এসেছেন সোভিয়েত রাজধানী থেকে। মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি একজন অধ্যাপক।

উজবেকিস্তানের বিজ্ঞানীগণ—বিজ্ঞানে ডক্টর ও ক্যান্ডিডেট উপাধি প্রাপ্ত লোকেরা, সগৌরবে একথা বলতে পারেন যে মধ্য এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে জয় করে তাঁরা বিজ্ঞান



চির্চিকে ৮ নং শিশু নার্সারী।

ইয়াঙ্গি য়ূলে ১০ নং মাধ্যমিক স্কুল।



তাসখন্দ অঞ্চলে ইয়াঙ্গি য়ুল জেলায় স্ভের্দলভ যৌথখামার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রে এই ছবিটি তোলা।



চির্চিকের লেনিন স্ট্রীট।



ও টেকনিকের নূতন পথ রচনা করছেন। অন্যান্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের মত এ'দের কাজও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

ভূতত্ত্ব ইন্‌স্টিটিউটে হয়ত সাক্ষাৎ মিলবে একদল ইঞ্জিনিয়ারের যাঁরা ভূতত্ত্ববিৎ খ. আব্‌দুল্লাইয়েভের সঙ্গে শিলাইটের (scheelite) নূতন তলানি পাওয়া জায়গাটিতে একটা খনি স্থাপনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। শ্রমশিল্প ইন্‌স্টিটিউটে শক্তি বিশেষজ্ঞ গ. রহিমভের বক্তৃতা শোনা যেতে পারে। এ'র বক্তব্য হল কারখানা ভিত্তিক তূলোকে দ্রুতগতি শুষ্ক করার শেষ পরীক্ষা সম্পর্কে। আকাদমীর সভাগৃহে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমীর সহ-সদস্য স. সাদিকভ তূলো গাছের মূল ছাড়া খাদ্য যোগানর নূতন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ দিচ্ছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমীর সহ-সদস্যা অধ্যাপিকা জুলফিয়া উমিদভা হৃৎপিণ্ডের প্রক্রিয়ার উপর উষ্ণ আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। ইনি বক্তৃতা দিচ্ছেন চিকিৎসাবিদ্যা ইন্‌স্টিটিউটে।

মুসলিম জনগণের 'আত্মার স্বধর্ম' বটে! কার মাথায় এ কথা গজিয়েছিল? সেই সব লোক আজও মানুষের মাথার খুলি মেপে চলেছে এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, এমন সব লোক আছে যারা সভ্য হবার অযোগ্য, স্বয়ং প্রকৃতি তাঁদের সৃষ্টি করেছে ক্রীতদাস হবার জন্য। এ কথার উদ্ভাবক আমেরিকা ও ইউরোপের জাতিবিদ্বেষীরা। সোভিয়েত জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা উজবেকিস্তানে মাত্র প'য়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই 'আত্মার স্বধর্মকে' লোপাট করে দিয়েছে।

তাসখন্দ উজবেক জনগণের যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। উজবেক রাজধানীর প্রতি অঞ্চলে সজীব বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলে যেমন যক্ষ্মা ইন্‌স্টিটিউটে উজবেকিস্তানে যক্ষ্মাকে সম্পূর্ণ দূর করার উপায়; 'ক্ষুধিত স্তেপ'এর পুনরুদ্ধার বিষয়ে কোন সভায় মিচুরিনপন্থীদের দ্বারা উদ্ভাবিত লবণ ও হিম সহনশীল ফলের গাছ নিয়ে আলোচনা; মানমন্দিরে তাসখন্দের জ্যোতির্বিদ কজিক কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং ওঁরই নামে নাম করা নতুন ধূমকেতু; ভাষা ও সাহিত্য ইন্‌স্টিটিউটে এমন একটি অভিধান সংকলনের কথা যার সাহায্যে উজবেকরা সবপ্রথম নিজেদের পরিভাষায় প্রয়োগ শিল্প-সংক্রান্ত যাবতীয় শব্দ পাবে। যাঁরাই এখানে কাজ করেন তাঁরা কেবলমাত্র এ যুগের লোকদের সুখের জন্যই নয় ভাবী যুগের মানুষের জন্যও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। প্রতিটি গবেষণাগারে আগামী দিনের কারখানার আঁচ পাওয়া যাবে।

ত্রিশ বছর আগে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রত্যূষে তাসখন্দের পুরোনো ও নতুন সহরের সোভিয়েতের জমকালো পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নের

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি মিখাইল ইভানভিচ কালিনিন বলেন: 'আমি মনে করি যদি বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংএর প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত বিচার, তীক্ষ্ন বুদ্ধির ক্ষমতা এবং আবিষ্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন কোথাও থাকে তা হলে তার প্রয়োজন এখানে। বস্তুতপক্ষে এখানে এমন অনন্ত সম্ভাবনা বর্তমান যাকে মানুষ ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু এই সব সম্ভাবনাকে খালি হাতে করায়ত্ত করা যাবে না... এখানে বিশেষ করে বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে। মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহের সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে থাকতে হবে তাসখন্দকে। আমি বিবেচনা করি মধ্য এশিয়া যে বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ, তাকে জয় করার পথ দেখানো উচিত তাসখন্দের।'

মধ্য এশিয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক শক্তি হল জল।

জলকে ব্যবহার করার বিজ্ঞান সম্ভবত মধ্য এশিয়ায় সব চাইতে প্রাচীন। মধ্য এশিয়ার পূর্ত কর্মীদের বিশাল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শুধু হালের বছরগুলিতেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত উজবেকিস্তানের পূর্ত ও পাওয়ার (শক্তি) ইঞ্জিনিয়ারগণের অবদান হয় বিরাট রকমের। উজবেক বৈজ্ঞানিকগণ যে কেবল উজবেকিস্তানের সেচ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্র সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন তাই নয় (এর কোন কোন পরিকল্পনা পৃথিবীর সকলকার মতে ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের বিস্ময়), অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের সেচ পরিকল্পনাও রচনা করেন। যেমন এ'রা ভরনেজ অঞ্চলের যৌথখামারের সেচ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে বৃষ্টিহীন অতি-শুষ্ক বছরগুলিতেও যথেষ্ট শস্য জন্মাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫। গাছ ও ফুল

সবুজে ছাওয়া স্কোয়ার থেকে প্রসারিত এ্যাসফল্ট বাঁধানো রাজপথ আর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত রাস্তা থেকে বার হওয়া ছোট ছোট পথ আর গলি সহরের কেন্দ্রের অনেকটা দখল করেছে। এরই বিভিন্ন অংশে পাথরের ইমারত ও নূতন বহু-তলা বাড়ির ভেতর রয়েছে কলেজ ও গবেষণাগার ছাড়াও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান: নাভোই রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার প্রাচ্য দেশীয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য বিখ্যাত এবং পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম; সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনটি মানমন্দিরের মধ্যে একটি আছে এখানে, এর প্রকোষ্ঠে 'সঠিক সময়ের কাঁটা'। তা ছাড়া আছে ভূমিকম্প নির্ধারণ কেন্দ্র, তিনটি যাদুঘর, একটি সঙ্গীত

কলা বিদ্যালয়, একটি চিড়িয়াখানা এবং হোটেল, হাসপাতাল, পলিক্লিনিক, স্কুল, পার্ক ও স্তূপীকৃত ফল ও টাটকা তরিতরকারীর অনেক বাজার।

একটিমাত্র জিনিস যা তাসখন্দবাসীদের নজরে পড়ে না এবং তাদের কাছে সাধারণ বলে মনে হয় তা হল পার্ক আর পথেঘাটে ফুলের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এর তাৎপর্যও গভীর।

উজবেকেরা প্রাচীন কাল থেকে ফুল ভালবাসে। উজবেকদের বাড়ির উঠনে, মাটির দেয়ালের পাশে পাশে ডেইজি, গোলাপ, শরৎকালীন এ্যাস্টের, হলিহক, গাঁদা ও মোরগ ফুল দেখা যায়। কিন্তু মধ্য এশিয়ার সহরে পথগুলি ছিল পুষ্পহীন। শত শত বছর ধরে রাস্তা ছিল পুরুষের সম্পত্তি আর গৃহ-প্রাঙ্গণ ও ফুল মেয়েদের। মেয়েরা যখন বোরখা খুলে তাসখন্দের পথেঘাটে বেরিয়ে এল ফুলেরাও এল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথমে রকমারী ফুল ছিল অল্প। তার পর রাস্তায় ফুলের গাছ লাগানো নিয়ে ব্যস্ত নারী ও শিশুদের সাহায্য করল তাসখন্দ বটানিক্যাল উদ্যান। পিওনি আর ডালিয়া এল উক্রেন থেকে, কার্নেসন ফুল ও বিভিন্ন জাতের এ্যাস্টের এল আর্মেনিয়া থেকে আর কৃষ্ণ সাগরের উপকূল থেকে এল গ্ল্যাডিওলি, হায়াসিন্থ্ ও লতানে গোলাপ। বিদেশ থেকে আনা হল পাটল বর্ণের সাইপ্রেস লতা, চাঁদ-ফুল ও ক্যালিফর্ণিয়ান পপি, মেক্সিকোর সুগন্ধি ইয়ুক্কা, ভারতের রক্তিম ক্যানা, জাপানের হনিসাক্ল্, আফ্রিকার নীল ক্যামোমিল, কাইরোর প্রভাত-গৌরব, নীল ডেইজি… তাসখন্দের লোকেরা পৃথিবী ছেঁচে ফুল এনে তাদের সহরকে সাজাল।

তাসখন্দের পাতাবাহার গাছের মধ্যে আগন্তুক আছে অনেক। গাছেদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২২ সালে এমন একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম যা জীবনে ভুলব না। একদিন আমাদেরই পাড়ার একজন শ্রদ্ধাভাজন উজবেক একটা গোলা ঘর বানাবার কাঠের জন্য তার বাড়ির সামনের পপলার গাছটাকে কেটে ফেলল। বেশ ত এতে কিই বা এসে যায়? এতে ত অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু সমস্ত পাড়ার লোক উত্তেজিত হয়ে উঠল। সেদিন থেকে ওর উদ্দেশ্যে ঘৃণা জানিয়ে বলা হত 'পপলার কাটা লোকটা'।

ঘটনাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল, কারণ আমি জানি অন্যান্য লোকও তাদের বাড়ির সামনের পপলার গাছ কেটে বাড়ির কাজে লাগায়। কারণ মধ্য এশিয়ায় কাঠ সংগ্রহের এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এসব লোকদের ত কেউ তিরস্কার করে না। শেষটায় আমাদের পাড়ার সবচাইতে শ্রদ্ধাভাজন মুহিদ্দীনভকে জিজ্ঞেস করলাম

পপলার গাছ কেটে লোকটি কোন অপরাধ করেছে? উনি বুঝিয়ে বললেন যে, প্রাচীন উজবেক রীতি অনুযায়ী পাঁচটা নূতন গাছ লাগিয়ে, তারা শিকড় গেড়েছে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কারও অধিকার নেই গাছ কাটার। লোকটি এই নিয়ম ভেঙেছে।

উজবেকিস্তানে গাছের গুরুত্ব এত যে তার কোন তুলনা হয় না, বছরের ভেতর আট মাসেরও বেশী কাঠফাটা রোদে মানুষকে এরা ছায়া দেয়। ছায়া এখানে বিলাস নয়, জল হাওয়ার মতই অত্যাবশ্যকীয়, গাছেরা ঘরের মতই বাড়ির একটা অংশ বলে গণ্য হয়, এর ছায়ায় লোকেরা বিশ্রাম নেয়, অবসর কাটায়, ঘুমোয়।

কেবল মাত্র ফুটপাথই নয়, তাসখন্দের অনেক রাস্তাও পাতায় ছাওয়া। প্লেন গাছ, বাবলা, লম্বার্ডি ও চওড়া-মাথা পপলার, চেষ্টনাট, এলম্, ওক, আইলানথাস, উইলো, আখরোট, মধুমালতী, তুঁত-গাছ ও অন্যান্য গাছের ভীড়ে সহরটিকে মনে হয় এক বিরাট উদ্যান। তাছাড়া খুবানী, বাদাম, প্লাম, আপেলগাছ এবং সাদা, হলদে ও বেগুণী রঙের লাইলাক, মল্লিকা, ঝাউ, বারবেরি, প্রিভেট, স্বর্ণঘণ্টা ও বুদলেইয়ার চারিদিকে বিকীর্ণ। মনে হয় বাড়ির বাগান থেকে বাইরে চলে এসেছে এরা। কোন কোন ঘরের বেড়া ও বারান্দা বেয়ে উঠেছে চীনের বাহারে আঙুরলতা। ম্যাগনোলিয়া ও ইউকালিপ্টাস গাছও তাসখন্দে দেখা দিয়েছে।

এমনকি রাস্তার নামেও তাসখন্দবাসীদের বৃক্ষপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সহরে 'বার পপলার স্ট্রীট', 'কোক তেরাক' (সবুজ পপলার) এবং 'কাতোর তল' (উইলো সারি) আছে। একটি জেলার নাম 'বেশ আগাচ', মানে পাঁচটি গাছ। 'বেশ আগাচে' পুরোনো ও নূতন সহরের মিলন ঘটেছে যেমন মিশেছে উর্দার পুলের কাছে। কিন্তু এই মিলন অসাধারণ এবং সম্পূর্ণ নূতন দিক থেকে প্রমাণ করছে মধ্য এশিয়ায় গাছের গুরুত্ব কতখানি।

নতুন সহরে 'বেশ আগাচের' কাছে পুরোনো সহরের উল্টো দিকে তাসখন্দের যুবকরা একটা হ্রদ বানায়। ওরা এর নাম দেয় 'কমসোমল লেক'। এর তীরে গড়ে ওঠে স্নান-স্ট্যাডিয়াম ও নৌকা-চালাবার আস্তানা, প্রশস্ত তট, খেলাধূলার জায়গা, আমোদ-প্রমোদের পটমণ্ডপ, বিভিন্ন ক্রীড়ার সাজসরঞ্জাম, উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ, রেস্তোরাঁ ও কাফে। হ্রদটিকে ঘিরে শিশুদের জন্য একটি ছোট্ট রেলওয়ে বানান হয়। এই ছায়া-শীতল, উজ্জ্বল ও বিস্তৃত স্থানটি যে নূতন জগৎ রচনা করে তাতে পুরোনো সহরের আঁকাবাঁকা গলি থেকে দলে দলে আসে তরুণতরুণী।

পুরোনো সহরের লোকেরাও কিছুটা নির্মাণের কাজ করে। দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় এরা 'বেশ আগাচে' একটি থিয়েটার ভবন বানায়। এর দেয়াল ও খিলান-ছাদ ইঁটের তৈরী, একখানা কাঠও নেই তাতে।

আসল কথা এই যে মধ্য এশিয়ায় কাঠ বলে নিজস্ব কিছু নেই। কাঠ আনতে হয় বহু দূর থেকে। যখন যুদ্ধ সুরু হল আর রেলওয়ে পুরোপুরি যুদ্ধের কাজে লাগল তখন তাসখন্দের লোকেরা স্মরণ করল সেই সব উজবেক স্থপতিদের পুরাতন শিল্পরীতির কথা যারা কাঠ ব্যবহার না করে তৈরী করেছে বিশাল প্রাসাদ আর মসজিদের খিলান-ছাদগুলোকে। সমরকন্দে শত শত বছর ধরে ঐ খিলান-ছাদগুলো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রাচীন খিলানগুলোকে পরীক্ষা করে সোভিয়েত স্থপতিরা এর প্রয়োগকৌশলের উন্নতি ঘটান, তাতে আধুনিক রূপ দিয়ে পাতলা দেওয়ালযুক্ত দ্বি-চক্র খিলানের সৃষ্টি করেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং'এ গৃহীত এই পদ্ধতি 'উজবেকিস্থান খিলান' নামে পরিচিত। এখন মধ্য এশিয়ার বড় বড় কারখানায় ও শ্রমিকাঞ্চলের ঘরবাড়িতে এই পদ্ধতি চালু।

য়ুসুফ আলি মুসায়েভ পুরোনো আমলের খিলান-ছাদ নির্মাতা। বহু মসজিদ তিনি তৈরী করেছেন। 'বেশ আগাচে' নতুন থিয়েটারের নির্মাণ কাজে তিনি যোগ দেন। উস্তো-শিরিন মুরাদভ প্রাচীন-শৈলীর প্ল্যাস্টারের কাজে বিশেষজ্ঞ। তিনি ঐ থিয়েটারের ভিতরকার কারুকার্য করেন। উজবেক বিজ্ঞান আকাদমী দুজন বিশেষজ্ঞকেই 'অনারারী আকাদেমিশ্যান' পদবী দেন।

৬। তুলোর দেশের রাজধানী

যে সব পর্যটক কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে আসে তাসখন্দ যে তুলোর দেশের রাজধানী এ কথা তাদের মনে আসে না। কিন্তু বছরখানেক এখানে থাকলে প্রতিমুহূর্তেই এটা নজরে পড়ে।

তাসখন্দে শীতের একটি সকাল। রাতে বরফ পড়েছে। ছাদ আর গাছের ডালপালা পেঁজা তুলোর মত সুন্দর সাদা বরফে আচ্ছন্ন। পরশু রাতে যে বরফ পড়েছে গতকালের অবারিত সূর্যালোকে তা পরিণত হয়েছে ঘনীভূত তুহিনকণায়। ওরা মালার মত ঝুলছে ছাদ, জানালার তাক আর ডালপালা থেকে। আবার রোদ উঠেছে। নরম বরফকুচি গড়িয়ে পড়ছে ডালপালার ওপর থেকে। দেখতে দেখতে ঘনীভূত তুহিনকণা বড় হচ্ছে, নিজেদের ভার সহ্য করতে না পেরে একটা মৃদু আওয়াজে একটার উপর আর একটা ভেঙে পড়ছে অজস্র উজ্জ্বল টুকরোয়।

শীতকালের এমনি একটি দিনে তাসখন্দ ভরে উঠল উজবেকিস্তানী গ্রীষ্মের উজ্জ্বল বর্ণে। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ রাস্তায় বেরিয়ে এল জাতীয় পোষাকে। ফেরঘানার পোষাকের উপর সবুজ, হলুদ ও হাল্কা বেগুণী রঙের ডোরা, খরেজ্মের পোষাকের গাঢ় লাল, সমরকন্দ, বুখারা, শিরাবাদ ও শাহ্রিসাব্জের পোষাকে বহু বিচিত্র কায়দা ও রং ঝলসে উঠল। প্রায় প্রতিটি আলখাল্লা ও স্যুটের উপর (সহুরে পোষাকেও আছেন অনেকে) দেখা যাচ্ছে চকচকে সম্মান চিহ্নগুলি। এঁরা কারা? এঁরা হলেন প্রজাতন্ত্রের সব চাইতে সেরা তুলো চাষী, এসেছেন তাঁদের কুরুলতাই বা কংগ্রেসে।

সভা বসে নাভোই অপেরা ভবনে। এটি মধ্য এশিয়ায় বৃহত্তম এবং সম্ভবতঃ সব চাইতে সুন্দর বাড়ি। এর পরিকল্পনা করেন স্থপতি আকাদেমিশ্যান শ্চুসেভ।

প্রতিনিধিরা চলেছেন একটি ফোয়ারার পাশ দিয়ে -- প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ফোয়ারার একটি। এর মাঝখানে পাথরের তৈরী বিরাট তুলোর গোলক। তার উপর উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে একশ ছাব্বিশটি জলধারা। এর পর প্রতিনিধিরা এলাবাস্টারে চিকনের কাজ করা বাইরের ঘর পর্যন্ত প্রসারিত গ্র্যানাইটের সিঁড়ি ধরে এগুতে থাকেন, অলিন্দ পার হলেন। এর দেয়ালের সুদৃশ্য প্যানেল এঁকেছেন চিঙ্গিজ আহ্মারভ। সব শেষে আসেন প্রেক্ষা গৃহে। মুক্তা ঝিনুকের মত উজ্জ্বল, তুষার সাদা এই ঘরে বসে তুলো চাষীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করেন, নিজেদের নূতন পদ্ধতির কথা বলেন, খামারের যন্ত্রপাতির ডিজাইন নিয়ে আলোচনা চলে, তুলো উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেন, গতবছরের কাজের সালতামামি করেন এবং আগামী বছরের পরিকল্পনা বানান।

কুরুলতাই শেষ হলে প্রতিনিধিরা বাড়ি ফিরে যান। এ হল ফেব্রুয়ারীর শেষ। তাসখন্দের পথেঘাটে বসন্ত দেখা দেয়। গতকাল পর্যন্ত যে আরিকগুলো শুকনো আর স্তব্ধ ছিল, জানালার নীচে আজ তাদের মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। রাস্তার কোণে ফেরিওয়ালা টিউলিপ বেচে। এর মানে তাসখন্দ মরূদ্যানের বাইরের সমগ্র স্তেপ অঞ্চল এই ফুলে লালে লাল হয়ে গেছে। সহরের বাগানে এবং এর সীমানার বাইরে বিরাট ফুলফলের বাগান একটা শ্বেত-গোলাপী ফেনা চাদর; এরাই পরে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে বিকশিত হয়ে উঠবে। প্রথম ভীরু পাতারা গাছে গাছে উঁকি মারছে। এর পর ফুটন্ত বাবলা ফুলের গন্ধে মাথা ঝিম ঝিম করবে। এই ভাবে দিনগুলি চলবে এগিয়ে। হঠাৎ মে মাসের এক সকালে তাসখন্দবাসী রাস্তার মোড় থেকে এক থলে স্ট্রবেরি কিনে মনে মনে বলে উঠবে বসন্ত শেষ হল, গ্রীষ্ম দেখা দিল।

সহর প্রকৃতির এই পরিবর্তনের মধ্যে তুলো সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই, কিন্তু আর

একটু মন দিয়ে তাকালেই নজরে পড়বে বসন্তে কত লোক তাসখন্দে নেই। প্রথমেই ধরা যাক পার্টি তথা সরকারী কর্মকর্তার দল, সাংবাদিক,সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর চলচ্চিত্রকারক ও লেখকদের কথা। অভিনেতা ও শিল্পীরাও চলে গেছেন সহর ছেড়ে তুলো চাষীদের সামনে অভিনয় করতে, কাজের দিনগুলির ছবি আঁকতে। তুলোর ভবিষ্যৎ ফসলের ব্যাপারে তাসখন্দের অর্ধেকের বেশী লোক কোন না কোন ভাবে কাজ করে থাকে।

এ ছাড়া আর কিছু বা হতে পারে? সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদিত তুলোর দুই তৃতীয়াংশই উজবেকিস্তানের। ১৯৫৬ সালে উজবেকিস্তানে ২৮ লক্ষ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন কাঁচা তুলো উৎপন্ন হয়। ১৯৫৯ সালে উজবেকিস্তানে ৩১ লক্ষ ৬৩ হাজার মেট্রিক টন তুলো উৎপন্ন হয়েছে।

তাসখন্দের অগণিত নরনারীর জীবনে তুলোর স্থান যে এত গুরুত্বপূর্ণ এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই তুলোই ওদের চিন্তাকে রূপ দেয়, শক্তিকে চালিত করে।

যে বাড়িটি সোভিয়েত তুলো উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র তার রঙটিও সাদা—দাঁড়িয়ে আছে গাছ-ছাওয়া পুশকিন স্ট্রীটের ওপর। নিখিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলো উৎপাদন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট এটি,এবং তুলো বিজ্ঞানের সর্বাদিসম্মত বিশ্বকেন্দ্র।

ইন্‌স্টিটিউটের পরীক্ষামূলক ক্ষেত ও সুপ্রজনন কেন্দ্রের গবেষণাগারগুলি তাসখন্দের কাছে বাগানের ভেতর। এখানে মিচুরিনের পন্থামত তুলোগাছের বিশেষজ্ঞরা এমন সব রকমারি গাছ বানিয়েছেন যা থেকে পৃথিবীর যে কোন জায়গার তুলনায় বেশী পরিমাণ ও দীর্ঘতর আঁশযুক্ত তুলো পাওয়া যায়। এখানে সর্বাধিক হিম সহনশীল ও অতি দ্রুত পাক-ধরা গাছের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন রোগকে এরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। পৃথিবীর মধ্যে এখানেই সব প্রথম বিচিত্র রঙের তুলো বানান হয়। এই সব গাছ থেকে পাটল, সবুজ বা বহু বর্ণযুক্ত বাদামী তুলো পাওয়া যায়। এমন রকমারি গাছ তৈরীর চেষ্টা চলছে যা থেকে নীল ও হাল্কা-নীল তুলোও পাওয়া যাবে। এ ছাড়া পশমের মত তন্তুযুক্ত রকমারি তুলোগাছ তৈরী হয়েছে; এই তুলো পশমের জায়গা নিতে পারে।

ইন্‌স্টিটিউটের এই কেন্দ্রে তথা অন্যান্য জায়গায় যেমন কৃষিবিদ্যা, বৃক্ষ-রক্ষণ ও আঞ্চলিক কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিকদের লব্ধ কাজের গভীরতা ও ব্যাপকতা কতখানি, কী প্রচণ্ডভাবে যৌথখামারীরা হাজার হাজার মাঠে গবেষকদের আবিষ্কারকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছে তা স্পষ্ট হয় এই তথ্য থেকে: বিপ্লবের আগে পৃথিবীর তুলো উৎপন্নকারী অঞ্চলের মধ্যে

সবচেয়ে কম তুলো জন্মাত একেবারে উত্তরে অবস্থিত তুর্কিস্তানে। আজ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নে তুলোর ফসল বেশী।

তুলো চাষকে যন্ত্রচালিত করার ব্যাপারেও উজবেকিস্তানের স্থান প্রথম। এর পরিচয় কেবল এই প্রজাতন্ত্রের মাঠেই নয়, তাসখন্দের পথেঘাটেও দেখা যাবে।

সেপ্টেম্বরের শুরু। মাসখানেক আগের মত রোদের তেজ ততটা নেই। গাছের পাতাগুলো ধুলোয় ঢাকা, মনে হয় মৃত, মনে হয় ধাতুতে গড়া। স্কুলে যাবার পথে ছেলেরা রাস্তার গাছ থেকে আখরোট পাড়ছে। যৌথখামারের দোকানে সুগন্ধী ফুটি আর ঝুরি বোঝাই আঙুর, পীচ, পিয়ার বিক্রি হচ্ছে। শরতের এই দিনগুলিতে অনেক লোকের কাঁধের উপর ঝোলা ঝুলি। ঐ যে লরি করে এক দল চলেছে গান গাইতে গাইতে। এরা কারা? পাহাড়ে ওঠার লোক বা পর্যটক দল কি? না, এরা হচ্ছে কলেজের ছাত্র আর অফিস কর্মী, চলেছে তুলো চয়নের কাজে সাহায্য করতে।

অনেক বছর আগে তাসখন্দের লোকদের তুলো তুলতে হত না, কিন্তু পরে যন্ত্রীকরণের ফলে তুলোর চাষ দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়। ইঞ্জিনিয়াররা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত তুলো কাটা যন্ত্র ডিজাইন করতে পারল না। যতদিন না এ সমস্যার সমাধান হয় ততদিন কি অপেক্ষা করা হবে কিংবা দেরী না করে চাষকে দ্বিগুণ করার জন্য তুলো চয়নের ব্যাপারে সাধারণের সাহায্য নেওয়া হবে? এ দুয়ের একটা পথ বেছে নেওয়া দরকার। তাসখন্দ, সমরকন্দ, আন্দিজানবাসী—বস্তুত সমগ্র প্রজাতন্ত্র দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিল।

কমিউনিস্ট পার্টির এক আবেদনের ফলে সহরসমূহের মেহনতী মানুষরা তুলো তোলার ব্যাপারে যৌথখামারকে সাহায্য করতে লাগল। এই দেশাত্মবোধক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল ব্যাপকভাবে।

এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করলেন উজবেকিস্তান কমিউনিস্টদের অন্যতম প্রধান কাজ হল তুলো তোলার ক্ষেত্রে যন্ত্রীকরণের সমস্যা সমাধান। কেন্দ্রীয় কমিটির সাহায্য ও উৎসাহে একদল সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ার তুলোচয়ন যন্ত্র তৈরী করার নিরলস চেষ্টা করতে লাগল। এদের সাহায্য করতে লাগল গাছ বিশেষজ্ঞরা, এরা উৎপন্ন করেছে নূতন ধরনের ঘনসন্নিবিষ্ট তুলো গাছ। এগিয়ে এল চাষের নূতন পদ্ধতি চালু করা কৃষি যন্ত্রবিদরা। রাসায়নিকরা বার করল এমন এক তরল রস যাতে ফসল তোলার আগেই পাতারা গাছ থেকে খসে পড়ে, এর ফলে তুলোকাটা যন্ত্রের কাজ সহজ হবে। এরাও সাহায্যে এল।

সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা এমন একটি যন্ত্র বার করল যা মাত্র একটি চল্লিশজন তূলো চয়নকারীর কাজ করতে পারে। একের পর এক এই যন্ত্র তৈরী হতে লাগল এবং ১৯৪৯ সালে একে মাঠের কাজে লাগান হল। আজকাল প্রজাতন্ত্রের যৌথখামার মাঠে তূলোকাটা যন্ত্র ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে। দু'এক বছরের মধ্যে তাসখন্দবাসী কাঁধের উপর ঝোলা নিয়ে চলেছে, এ দৃশ্য আর দেখা যাবে না। যৌবন, অগ্রসরণ ও বাধাবিপত্তি দূর করার স্মৃতির কঠিন অথচ উচ্ছল অতীতের কথা এক বিশেষ আকর্ষণ ও মোহে চিরদিন জেগে থাকবে আমাদের মনে।

৭। রাজভবনের সম্মুখে

ভোর হয়েছে। উজবেক রাজধানীর প্রধান চত্বরে, মস্কোর মত এরও নাম রেড স্কোয়ার, রাজভবনের সামনে মোটরগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। এই বিরাট ধূসর বাড়িটির পরিপ্রেক্ষিতে চত্বরের উপরে লাল গ্র্যানাইট ও কালো ল্যাব্রাডোরাইটের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে লেনিনের ব্রোঞ্জের মূর্তি। তাসখন্দের নরনারীর উদ্দেশ্যে লেনিনের বাহু প্রসারিত।

চত্বরে ডালিম গাছ জন্মেছে রাজভবনের জানালার নীচে। এর অপর দিকে এ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তার পাশে আঙুরের ঝোপ। দুটি টিউলিপ গাছ, মে মাসে এরা হলদে সবুজ ফুলে ছেয়ে যায়, এখন শরতে পপলার ও বাবলা গাছের সঙ্গে মাথা মিলেছে। উজবেকরা কি ভাবে রাষ্ট্রসত্তা লাভ করল তা বলার এই হল উপযুক্ত সময়।

বিপ্লবের আগে গবর্ণর জেনারালের বাসস্থান এই 'শ্বেত ভবন'টি ছিল এই চত্বরে। জারের কর্মচারীরা সমগ্র তুর্কিস্তান অঞ্চল শাসন করত। সে সময় মধ্য এশিয়ার ছিল এই নাম। গবর্ণর জেনারাল ছিল জারের নায়েব। উজবেকরা তাকে বলত 'ইয়ারিম পাদশো', অর্থাৎ ছোট লাট।

'রুশ অধিকৃত অঞ্চল' ছাড়াও তুর্কিস্তানে ছিল আর দুটি সামন্ত রাষ্ট্র, বুখারা ও খিবা। রাশিয়ার জার অশেষ কৃপাবশতঃ বুখারার আমিরকে 'মহামান্য' ও খিবার খানকে 'মহা মহামান্য' উপাধীতে ভূষিত করে যেন এই কথার উপর জোর দেওয়ার জন্য যে উভয়েই জার 'শাহান্‌শাহ'এর দাসানুদাস। বস্তুত দুজনাই ছিল রুশ সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর ও অনুগত সামন্ত।

তুর্কিস্তানবাসীদের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও সামন্তপ্রথাগত অনৈক্য জার ও খানদের পক্ষে সুবিধের ব্যাপার ছিল। বিখ্যাত লোক গীতিকার 'উজবেক বুলবুল' এরগাস্ জুমান বুলবুল ওগলি তাঁর একটি প্রাক-বিপ্লব গানে উজবেক শব্দটির শ্লেষালংকার প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন যতদিন তিনজন বেক, অর্থাৎ রুশ, বুখারান ও খিবান ওদের লুটপাট করে খাবে ততদিন উজবেকরা 'উজ বেক' (নিজের প্রভু) হতে পারবে না।

রুশ জমিদার ও পুঁজিপতি এবং তাদের নিজস্ব সামন্ত প্রভু ও বাইদের দ্বারা চাপানো এই দু'রকমের দাসত্বশৃংখল ছিন্ন করার যে সব চেষ্টা তুর্কিস্তানের মেহনতী জনতা করেছিল তার সবগুলিই বিফল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে রুশ শ্রমিক ও কৃষকরা জারতন্ত্রকে উৎখাত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি বড় সহরে এমন এক একটি কলকারখানা আছে যার সম্পর্কে বিশেষ অনুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এগুলি হল বিপ্লবের গৌরব স্থল। জার শাসিত তুর্কিস্তানের উপনিবেশে একটিও বড় ধরনের শিল্প সংস্থা ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে রেল কর্মচারীরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী এবং সবচাইতে বড় সংস্থা ছিল তাসখন্দের কেন্দ্রীয় রেল কারখানা।

এখানে নিযুক্ত শ্রমিকরাই তুর্কিস্তানের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করে। ১৯০৫ থেকে মধ্য এশিয়ার রেল কর্মীগণ রাশিয়ার প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনায় সাড়া দেয়। রুশ রেল কর্মীদের ধর্মঘট ও আন্দোলন তুর্কিস্তানের মেহনতী জনতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। তাসখন্দের রেলকর্মী কর্তৃক অনুষ্ঠিত মে দিবসের গুপ্ত সভায় পুরোনো সহর থেকে উজবেক কারিগররা এসে যোগ দিতে লাগল। প্রথমটায় ওদের কয়েকজন মাত্র আসত, কিন্তু উজবেকিস্তানের ঐ মেহনতী জনগণই ত ভবিষ্যতের নিয়ামক, কারণ প্রথমে ক্ষীণ হলেও সেই হল পুরোনো ও নূতন সহরের মধ্যে সেতুবন্ধনের শুরু। এতে কেবল আনখোরেই বাঁধা পড়ল না পরন্তু মিলন ঘটল দু'টি সংস্কৃতির, দুই পৃথিবীর। সেই হল মহান বন্ধুত্বের প্রথম অংকুর যা সারা দেশটাকে নাড়া দেয় এবং পরে রূপান্তরিত করে তাকে।

দরিদ্র উজবেক ও রুশ শ্রমিকদের মধ্যে বন্ধুত্ব দিন দিন বেড়ে চলল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে সব উজবেকদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের পিছনে কাজে লাগানো হয় এই বন্ধুত্বে তাদের অবদান মহৎ। রাশিয়ায় যেখানে তাদের গাছ কাটার কাজে এবং দুর্গ ও রেল নির্মাণের কাজে লাগানো হল সেখানে তাদের পরিচয় হল রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন কর্মীদের সঙ্গে। উজবেকদের রাজনৈতিক সচেতনতা এখানে পাকা হল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের

পর তারা বৃহত্তম সহরগুলিতে 'মোসলেম শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত' বা 'মেহনতী মুসলমানদের সোভিয়েত' গঠন করে গরীবদের সঙ্ঘবদ্ধ করল। সর্বতোভাবে তারা উজবেক মেহনতী জনগণ ও রুশ শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য বাড়াল।

১৯১৭'র সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাসমূহ প্রমাণ করল এই বন্ধুত্ব কত গভীর ও সুদৃঢ়। ১২ই সেপ্টেম্বর নূতন সহরে এক বিরাট সভা ডাকা হল। বক্তাদের প্লাটফর্মের চারপাশে গিজগিজ করল কালো ইউনিফর্ম পরা রেল কর্মীর দল আর খাকি উর্দি পরা সৈনিকরা। এর মধ্যে ছিল পুরোনো সহরের শত শত উজবেক — তাদের পরনে উজ্জ্বল রঙের আলখাল্লা আর মাথায় তুবেতেইকা। মনে হচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে চেহারা ও আকৃতি বদলানো বিরাট ফুলের কেয়ারি ওরা। বলশেভিকদের আনা একটি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। এতে দাবী করা হয় অবিলম্বে ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ হোক, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হোক এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব — সমস্ত শক্তি সোভিয়েতের হাতে আসুক। এই কার্যসূচীকে কাজে লাগাবার জন্য সভায় একটি বৈপ্লবিক কমিটি নির্বাচিত হল।

সেদিন থেকে নিকলাই শুমিলভ, আলেক্সান্দ্র পেরশিন, পাভেল পলতরাৎস্কি ও তুর্কিস্তানের অন্যান্য কমিউনিস্টরা উজবেকিস্তানে সোভিয়েত শাসনের জয়ের জন্য জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তোড়জোড় সুরু করল। কেন্দ্রীয় রেল কারখানার হুইসিলের সঙ্কেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ২৮শে অক্টোবর ভোর ৬টায় বিদ্রোহ সুরু হয়।

'শ্বেত ভবন' ও সহরের দুর্গ ছিল প্রতি বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি। বিপ্লবী দলের প্রধান ঘাঁটি হল রেল কারখানা বা 'শ্রমিক দুর্গ' তখন এই নামে ওটি পরিচিত। ২৯শে অক্টোবর যখন রাস্তার লড়াই চরমে উঠেছে এমন সময় তাসখন্দে খবর এল পেত্রগ্রাদে সোভিয়েত শাসন জয়লাভ করেছে। খবরটা তাসখন্দ রেল শ্রমিকদের সংগ্রামী ভাবকে প্রবল করে তুলল। বিপ্লবী সৈন্য ও উজবেক কারিগরদের সঙ্গে একযোগে তারা দুর্গ আক্রমণ করল। পয়লা নভেম্বর দুর্গের পতন ঘটল। তুর্কিস্তানে ঘোষিত হল সোভিয়েতের শাসন।

১৯১৮ সালের এপ্রিলে তুর্কিস্তান সোভিয়েতের পঞ্চম কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তারবার্তায় লেনিন জানান, 'কমরেডগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে গণ কমিশারদের সোভিয়েত আপনাদের অঞ্চলে সোভিয়েত ভিত্তিতে স্থাপিত স্বায়ত্তশাসনকে সমর্থন করবে। আমরা আপনাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই দৃঢ় ধারণা পোষণ করি যে আপনারা আপনাদের সমগ্র অঞ্চলকে সোভিয়েত সংস্থায় ছেয়ে ফেলবেন এবং ইতিপূর্বে স্থিত সোভিয়েতগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রেখে আপনারা কাজ করে যাবেন।' কংগ্রেসে তুর্কিস্তানকে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক ও ঘরের শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের, সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণের গৃহযুদ্ধ সুরু হল। আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার প্ররোচনা দিয়ে তুর্কিস্তানকেও দখলে আনার সিদ্ধান্ত করল। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে সোভিয়েতের উত্তর, দূর প্রাচ্য ও সাইবেরীয় অঞ্চল আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাল, অপর দিকে মধ্য এশিয়ায় তারা 'পিছনে থেকে' সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে লাগল। আমেরিকার কন্সাল হয়ে যে তাসখন্দে এল সেই ট্রেডওয়েল মধ্য এশিয়ার বিপ্লব বিরোধী শক্তির প্রধান হয়ে দাঁড়াল। তার সাহায্যে মেসেদে ব্রিটিশ সামরিক মিশনের প্রধান জেনারাল মালেসন তুর্কিস্তানের বিভিন্ন সহরে শ্বেত কসাক দলদের দিয়ে পরের পর কয়েকটা বিদ্রোহ করাল এবং পরে ট্রান্স কাস্পিয়ান অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে সরাসরি ঢুকিয়ে দিল। কাশগরে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মাকার্টনি ফেরঘানা উপত্যকার বাসমাচদের অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করতে লাগল। ব্রিটিশ দালাল বেইলি সোভিয়েত শাসনকে উৎখাত করার জন্য তাসখন্দের গুপ্ত শ্বেত-প্রহরী দলের সঙ্গে গোপন চুক্তিপত্রে সই করল। কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময় তুর্কিস্তানের লাল-প্রহরী দল এবং রেল শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী বাসমাচ, শ্বেত কসাক, ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে তাসখন্দের সোভিয়েতগুলিকে এবং তুর্কিস্তানের বেশীর ভাগ অঞ্চলকে রক্ষা করতে সমর্থ হল।

তরুণ তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়া থেকে যে সাহায্য পেল তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তুর্কিস্তানে খাদ্যশস্যের ১১৫টি রেল ওয়াগন পাঠান হল।

কিন্তু ঠিক সেই সময় ব্রিটিশরা তুর্কিস্তানকে কাস্পিয়ান সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আর উত্তরে জেনারাল দুতভের দল তাকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ছিন্ন করে। ভ. ই. লেনিনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক তারবার্তায় তুর্কিস্তানের গণ কমিশার পরিষদের সভাপতি কলেসভ লেখেন: 'তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত ... তাসখন্দ বিচ্ছিন্ন। এই মারাত্মক বিপদের সময় আমরা আপনার বাণী চাই। আমরা অর্থ, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকের সাহায্যের অপেক্ষায় আছি।' তারবার্তার উত্তরে তুর্কিস্তানে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল।

যে রাস্তা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হল তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি দুঃসাহসিক: ৎসারিৎসিন থেকে সুরু করে রাস্তাটা গেছে আস্ত্রাখানে, তারপর কাস্পিয়ান সাগর পেরিয়ে আলেক্সান্দ্রভ্স্কি দুর্গে এবং তারও পর বিশাল উস্ত উর্তের ঊষর মালভূমি ও কাজাখ

প্রদেশের স্তেপ পেরিয়ে তাসখন্দ রেলওয়ের নিকটতম রেল স্টেশনে। যারাই গ্রীষ্মের উত্ত উর্ত মালভূমিতে গেছে তারাই জানে যে ঐ পথ কী ভয়ঙ্কর। কিন্তু তখন আর কোন পথ ছিল না। অস্ত্রশস্ত্রের এই চালান তুর্কিস্তানের বিপ্লবী শ্রমিকদের অশেষ সাহায্য করেছে।

১৯১৯এর শুরুতে মিখাইল ফ্রুঞ্জের নেতৃত্বে যখন লাল ফৌজের সৈন্যদল ওরেনবুর্গ রণাঙ্গনে দুতভের দলকে সাবাড় করতে সুরু করে, আমেরিকান ও ব্রিটিশরা স্থির করল এক কোপে তুর্কিস্তানের সোভিয়েতগুলিকে শেষ করবে। তাসখন্দে ট্রেডওয়েল ও বেইলি ত্রৎস্কিপন্থী ওসিপভ প্রমুখ 'বাম' সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ও শ্বেত রক্ষীদের বিদ্রোহ পাকিয়ে তোলে। ১৮ই জানুয়ারীর রাত্রিতে ওসিপভ (প্রজাতন্ত্রের তদানীন্তন সামরিক কমিশার) বাহ্যত এক জরুরী সলাপরামর্শের জন্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন চৌদ্দজন কর্মকর্তাকে, চৌদ্দজন তুর্কিস্তানের কমিশারকে ডেকে পাঠায়। ওসিপভের সদর ঘাঁটিতে পৌঁছানমাত্র তাদের আটক করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান দালালরা হিসেবে ভুল করেছিল। তাদের প্রিয় কমিশারদের হত্যার খবরে তাসখন্দবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রেল শ্রমিকেরা 'ওসিপভদের' উপর এমন আক্রোশ আর প্রচন্ডতা নিয়ে আক্রমণ চালাল যে তিন দিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমিত হল।

সেই বছরেই কলচাকের দক্ষিণী বাহিনী শেষ করে লাল ফৌজের সৈন্যদল তুর্কিস্তান রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনার সঙ্গে যোগ দেয়। তুর্কিস্তানের বিষয় সংক্রান্ত কমিশন (এটি 'তুর্ককমিশিয়া' বলে পরিচিত) মধ্য এশিয়ায় প্রেরিত হয়। কমিশনকে দেওয়া হয় ব্যাপক ক্ষমতা।

তুর্ককমিশিয়ার যাত্রা উপলক্ষে তুর্কিস্তান কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে এক পত্রে লেনিন এই আহ্বান জানান যে তারা যেন, 'তুর্কিস্তানের লোকদের সঙ্গে সখ্যতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদাহরণ ও কার্যের দ্বারা সর্ববিধ চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে আমরা যে চরম রুশ সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছুক, একথা যেন তারা তাদের কাজের দ্বারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন'... 'রুশ সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে তুর্কিস্তানের লোকদের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব এখন এমন যাকে, অতিশয়োক্তি না করে বলা চলে বিরাট ও যুগান্তকারী।'

ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা বিষম তাড়াহুড়ো করে ইরানে তাদের ঘাঁটিগুলি থেকে সোভিয়েত সীমান্ত পর্যন্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা তৈরী করতে থাকে। ১৯১৯এর ডিসেম্বর নাগাদ জেনারাল মালেসন ২০,০০০ ভাড়াটিয়া সৈন্যের এক দল তৈরী করে, তার মৎলব এদের মধ্য

এশিয়ায় পাঠানো। বুখারার আমিরকে সে 'মন্ত্রণা দাতা' ও অর্থের জোগান দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আর কখনও সোভিয়েত তুর্কিস্তানের মাটিতে পা ঠেকাতে পারেনি। ভালেরিয়ান কুইবিশেভের নেতৃত্বে লাল ফৌজের সৈন্যরা এক দুঃসাহসিক অভিযানে কারা কুম মরুভূমি অতিক্রম করে। এ ঘটনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

এই অভিযানে যোগ দেয় উজবেক সৈন্যদলও। তখন কবি হমজ রচিত উজবেক সৈন্যদের প্রিয় একটি গানে সে সময়কার মনোভাবের পরিচয় মেলে:

অনেক দিনের আশায় থাকা রাত পোহাল আজ
পেয়েছি সে মুক্তি মোরা তাকে রাখাই কাজ;
থাকবে অটুট স্বাধীনতা, শত্রু বৃটিশ জানি,
করব লড়াই, দেব নাক একটি ফোঁটা ভূমি।

এগিয়ে এস শ্রমিক মানুষ, দাঁড়াও দেখি রুখে
শত্রু যেন জায়গা না পায় তোমার দেশের বুকে!
চির স্বাধীন যেন থাকে শোভন জন্মভূমি
উঠে দাঁড়াও, এগিয়ে চল, জয়কে লই জিনি!

ট্রান্স কাস্পিয়ান থেকে রুশ ও তুর্কমেন লাল ফৌজের সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে যখন তরুণ উজবেক সৈন্যেরা ব্রিটিশ ও শ্বেত রক্ষীদলকে তাড়াতে থাকে তখন তারা এই গান গায়। মিখাইল ফ্রুঞ্জের নেতৃত্বে যখন তারা ফেরঘানা উপত্যকা থেকে বাসমাচদের ধ্বংস করে তখনও এই গান ছিল তাদের মুখে। আবার যখন তারা বুখারা ও খিবার সশস্ত্র বিদ্রোহী লোকদের সাহায্য করার ডাকে সাড়া দিয়েছিল তখনও তারা গেয়েছিল এই গান।

'শাহানশাহ' সম্রাটের পর জনগণ ১৯২০ সালে 'মহামান্য' বুখারার আমির ও 'মহা মহামান্য' খিবার খানকে তাড়িয়ে দিল। জারের স্বৈরাচার এবং আমির ও খানদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন তুর্কিস্তানের জাতিসমূহ তাদের ইতিহাসে এই সব প্রথম এক একটি জাতিতে গ্রথিত হল। জাতীয় সীমারেখা বরাবর মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক বিভাগ ও উজবেক, তুর্কমেন ও অপর জাতিসমূহের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির ভিত্তি রচিত হল।

জাতীয় অঞ্চল স্থির করার জন্য ম. ই. কালিনিন সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় যান। ১৯২৪ সালে ডিসেম্বরের শেষভাগে উজবেক প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ছ'সপ্তাহ বাদে সোভিয়েতের নিখিল উজবেক কংগ্রেস উজবেকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। উজবেক সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি পদে ইউলদাস আখুনবাবায়েভ নির্বাচিত

হন। এই প্রাক্তন ক্ষেতমজুর, ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারী ও বাসমাচী দলের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম করেছিলেন, অটল কমিউনিস্ট তিনি। মৃত্যু পর্যন্ত আঠার বছর ধরে এই পদটিতে তিনি আসীন ছিলেন।

এই ভাবে পত্তন হল জাতীয় উজবেক রাষ্ট্রের। উজবেক জনগণ পুরোপুরিভাবে জাতিতে পরিণত হয়ে যোগ দিল সোভিয়েত জাতিসমূহের বিরাট পরিবারের সঙ্গে।

৮। কাপড়ের সহরে

তাসখন্দে এমন একটি অঞ্চল আছে যেটা আগেকার রুশ অথবা এশীয় অংশের মতো নয়। এর নাম কাপড়ের সহর। এখানে নূতন বহু-তলা বাড়ির সারি, পাঁচমিশালী দোকান, একটা বাজার, পলিক্লিনিক, বাগান, সংস্কৃতি ভবন ও সাঁতার কাটার পুকুর আছে।

তাসখন্দ শ্রমশিল্পের সবচাইতে বড় মিল হল কাপড়ের কল। এর আকার যে কত বড় তা বোঝা যায় এই থেকে: সমগ্র ইরানের তুলো শিল্পে মাত্র ত্রিশ হাজার টেকো ব্যবহৃত হয়, এ হল তাসখন্দ কাপড়ের কলে ব্যবহৃত টেকোর এক সপ্তমাংশ মাত্র। কল থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ গজ কাপড় বেরিয়ে আসে।

কারখানাটিকে দেখলে একটা প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। মূর্তি শোভিত এর প্রধান বাড়িটির সামনে একটি উঁচু ফোয়ারা আর পার্কের গাছ গাছড়ার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন বিভাগের সাদা বাড়িগুলি। এর ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানাবে যে সত্যিই এটিকে প্রাসাদের মতো করে গড়া হয়েছে।

বিপ্লবের ঠিক আগে তাসখন্দে ১১০টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা ছিল: রেলওয়ে কারখানা ও যন্ত্রাগার, তুলো শোধন-কারখানা, তেলের কল, সুরাসার পরিশ্রুতাগার, ও অন্যান্য ছোটখাট কলকারখানা। এই ১১০টি সংস্থার সবগুলিতে যত লোক কাজ করত তা আজকের তাসখন্দে কাপড়ের কলে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যার চাইতে কম।

১৯৪১ সাল নাগাদ উজবেকিস্তানে জারের ভূতপূর্ব এই উপনিবেশে আর আজ স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে এমন শিল্প গড়ে ওঠে যার থেকে আসে তার জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশী। এর সমস্ত প্রধান সহরগুলি এক একটি নূতন শ্রমশিল্প কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে আর এদের সবচেয়ে বড় হল উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ। প্রথম দিককার পাঁচ-সালা পরিকল্পনাগুলির সময় শিল্প কেন্দ্র ও যে সব বৃহত্তম সংস্থা উজবেক কর্মীদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছে তার একটি হল তাসখন্দ কাপড়ের কল।

কারখানাটি দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫১ সালে অস্ট্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল তাসখন্দ পরিদর্শন করেন। তাঁদের নেতা মার্টিন গ্রুনবের্গ লেখেন: 'উজবেকিস্তানের জনসংখ্যা অস্ট্রিয়ার সমান। অস্ট্রিয়ার যখন শ্রমশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি উজবেকিস্তান তখন পিছিয়ে-পড়া দেশ। সে আজ মাত্র কয়েক দশকের কথা। আজ আমরা উজবেকিস্তানে দেখতে পাচ্ছি এমন একটি কারখানা যেখানে কর্মী শ্রমিকের সংখ্যা চার হাজারেরও বেশী। এত কর্মীর নিয়োগকারী এমন কোন সংস্থা নেই যা নিয়ে অস্ট্রিয়া গর্ব করতে পারে। অস্ট্রিয়ায় যা আছে তার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশী। কারখানায় আমরা দেখতে পেলাম শ্রমিকদের জন্য কত যত্ন নেওয়া হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল কারখানার পলিক্লিনিক ও হাসপাতাল। কারখানার একটি চমৎকার সংস্কৃতি ভবনও আছে। অস্ট্রিয়ার কোন সংস্থায় এমন কিছুই নেই যা এর সমকক্ষ।'

কারখানার যে কোন কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাক। ধরা যাক ঐ বয়নকারিণী নুরিয়া মাকসুমভার কথা, তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে মোলাকাৎ হোক। অন্যান্য উজবেক স্ত্রীলোকের মতো যৌবনে তাঁর মাও লেখাপড়া জানতেন না; তাঁর যৌবন কাটে অজ্ঞতা ও অন্ধকারে। সম্ভবত ১৯২২ সালে একথাই তাঁর মনে এসেছিল যখন তিনি তাঁর মেয়ের জন্য নাম বাছতে যান? কারণ 'নুর' মানে উজ্জ্বল।

নুরিয়া মাকসুমভা এমন এক সময় জন্মান যখন তাঁর জন্মভূমিতে দেখা দেয় এক উজ্জ্বল অবিনশ্বর আলো। জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী, কিসে তিনি উদ্বুদ্ধ হন, কোন স্বপ্ন তিনি দেখেন বা কার প্রতি তাঁর সহানুভূতি এ কথা বলতে গিয়ে শুধু এটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট যে, তিনি আজ চব্বিশটি তাঁত চালান, উজবেকিস্তান কাপড়ের কলে তিনি সবচেয়ে সেরা বয়নকারিণী। ১৯৫০ সালের শরৎকালে দ্বিতীয় সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি রক্ষা সম্মেলনের জন্য কারখানা যখন প্রতিনিধি নির্বাচন করে সমস্ত কর্মীরা — বয়নকারী, টেকোচালিকা, ওয়াটার-ফ্রেমচালিকা অন্যান্য সবাই একবাক্যে ওঁকে উক্ত পদে নির্বাচিত করে। শ্রমিক হিসাবে এত খ্যাতি ওঁর।

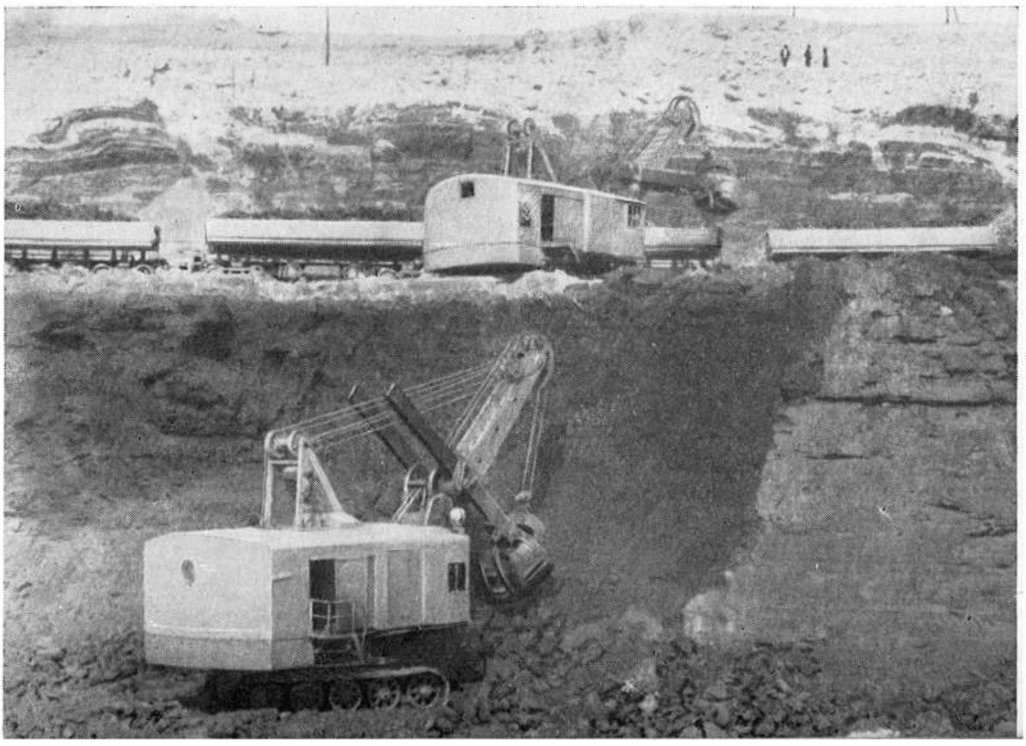
'যে আলো জ্বালে, সে থাকে অন্ধকারে,' উজবেকিস্তানের প্রাচীন এই প্রবাদটি অর্থহীন। যে এখানে আলো জ্বালবে সে কখনই অন্ধকারে থাকবে না।

তাসখন্দের নূতন তৈরী বাড়ির মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্রকল শ্রমিকদের সংস্কৃতি ভবনে দেখা যায় নুরিয়া মাকসুমভার প্রতিকৃতি। সেই সঙ্গে আছে বয়নকারিণী ইয়েভ্‌দকিয়া [illegible]গালভা, টেকোচালিকা তুরসুন ওয়ে ইয়েরমুহম্মেদভা, কাটনা কাটিয়ে নাসিবা বাহা[illegible] ও কারখানার অন্যান্য নামজাদা লোকের প্রতিকৃতি। কোন পুঁজিবাদী



তাসখন্দ টেকস্টাইল মিলে তৈরী কাপড় বাছাই করা হচ্ছে।

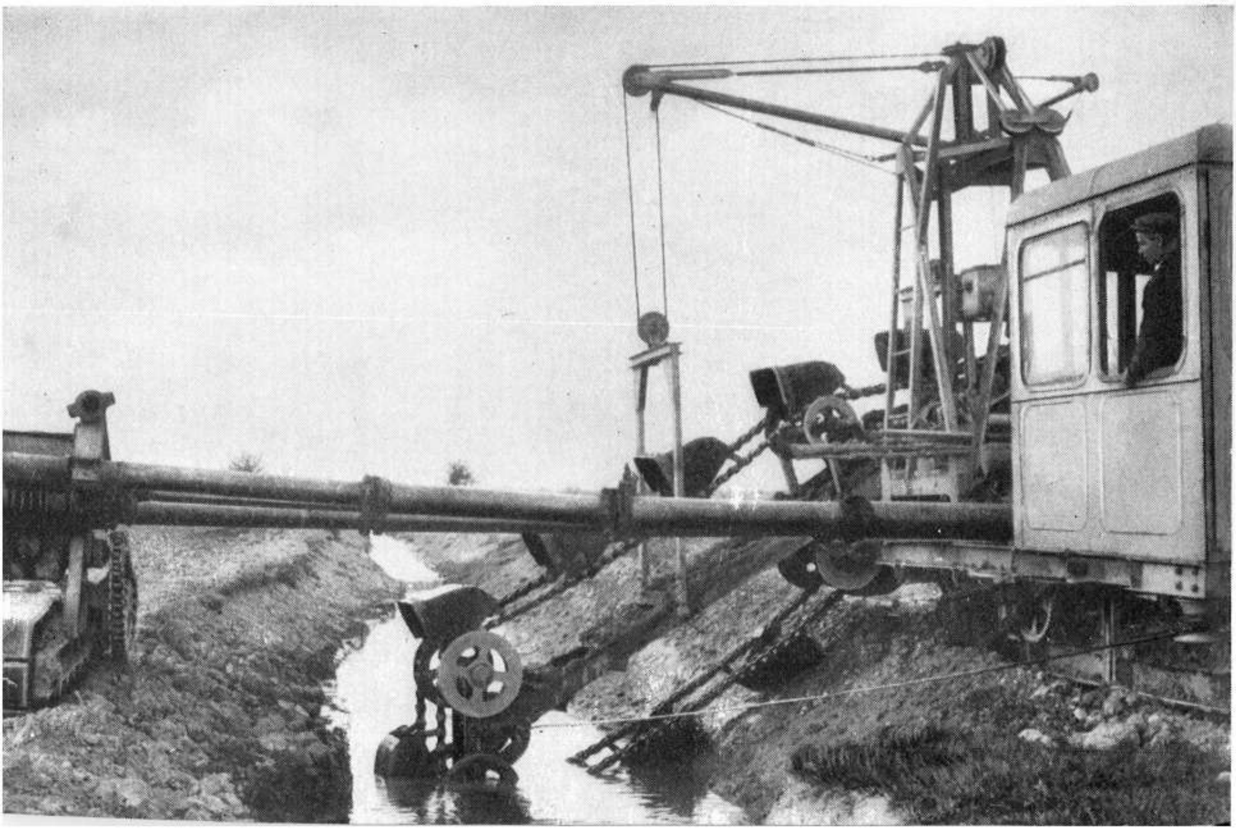
আন্‌গ্রেনে ওপেন-কাট কয়লা তোলা।





একটি মেশিন ও ট্র্যাক্‌টর স্টেশনে ডেসপ্যাচ ঘরে আদানপ্রদানের 'উরোজাই' বেতার যন্ত্র।

ইয়াঙ্গি য়ুল জেলায় ভূমি-উদ্ধারের কাজ।



বা ঔপনিবেশিক দেশে এমনটি সম্ভব? কোন পুঁজিবাদী বা ঔপনিবেশিক দেশে শত শত শ্রমিক সহকর্মীর উদ্ভাবিত নতুন পন্থা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে আর তারই নাম হাজার হাজার লোকের মুখে ফিরতে থাকে?

তাসখন্দ কাপড়ের কলের যন্ত্র নির্মাণ কারখানার সুবিখ্যাত বাষ্প হাতুড়ি চালক সালিখ আদিলভের কথা ধরা যাক। ওঁর মত লোকের কাহিনী আর কোথায় পাওয়া সম্ভব? একদিন যে ছিল দরিদ্র দেখান, কাজ করত গাড়োয়ানের, সেই সালিখ আদিলভ আজ চালান দু'টনের বাষ্পচালিত হাতুড়ি, তাসখন্দ সহর সোভিয়েতের ডেপুটি তিনি। উদ্ভাবনী ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ, উদ্যোগী তেমনি। কাজে এমন বুদ্ধিদীপ্ত নতুন কৌশল প্রয়োগ করেন যাতে ২৬ বাৎসরিক নর্ম যুদ্ধ পরবর্তী প্রথম পাঁচ সালা পরিকল্পনার মধ্যে তিনি শেষ করে ফেলেন। বলতে গেলে তিনি একটি ছোট্ট বাতি জেবলেছিলেন মাত্র — ওটি হল বাষ্প হাতুড়ি চালাবার ব্যাপারে। নিজের দেশবাসীর কাছে পরিচিত হবার পক্ষে সেই স্বল্প আলোই যথেষ্ট।

আদিলভের খ্যাতির কথা ছেড়েই দিলাম। যে কারখানায় আজ তিনি কাজ করছেন প্রাক-বিপ্লব উজবেকিস্তানে তার অস্তিত্বও কল্পনা করা যেত না। তখন উজবেকেরা তুলো বানাত বটে কিন্তু বস্ত্রশিল্প বলে ওদের কিছু ছিল না। আর বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির কথা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত একমাত্র বৃহৎ যন্ত্র নির্মাণ কারখানা ছিল জার-শাসিত কেন্দ্রস্থল সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে।

১৯২১ সালে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেসে জাতীয় প্রশ্নের ওপর যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়: '... রাশিয়ার ঐ সমস্ত সীমান্ত-অঞ্চলগুলি (বিশেষত তুর্কিস্তান), যাদের অবস্থা ছিল উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশের মতো, বাধ্য হয়ে ভূমিকা নেয় নানা ধরনের কাঁচা মাল জোগানদারের, সে সব কাঁচা মাল যেত কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রস্তুত প্রক্রিয়ার জন্য। এই কারণে ঐ সব অঞ্চল স্থায়ীভাবে পিছিয়ে পড়ে আর ওখানে নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যে শ্রমশিল্পজীবী প্রোলেতারিয়েতদের উৎপত্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়।'

বিপ্লবের আগে তুভের, ইভানভো এবং ওরেখভো-জুইয়েভোর বস্ত্র তৈরীর কেন্দ্রগুলি মধ্য এশিয়া থেকে তুলো পেত আর বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আসত সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে। আজকের উজবেকিস্তান কেবল তুলো ও বস্ত্রই সরবরাহ করে না, ঐ সঙ্গে কার্ডিং যন্ত্র, স্পীড ফ্রেম ও ওয়াটার ফ্রেম তৈরি করে। তাসখন্দ বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্র নির্মাণ কারখানার ট্রেড মার্কা দেওয়া পয়লা নম্বরের যন্ত্রপাতি দেখতে পাওয়া যাবে স্তালিনাবাদ ও ভিসনি ভলচক, পলতাভা ও লজ, হ্যাংকাউ ও সাংহাইয়ের কারখানাগুলিতে।

৯। 'সেলমাশের' ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা

তাসখন্দের অপর প্রান্তে খরস্রোতা সালার। তীরে স্নানার্থীর ভীড়। নদী পেরিয়ে, বৃহৎ পার্ক ঘেরা তাসখন্দ মেডিকাল ইনস্টিটিউটের ক্লিনিকাল কেন্দ্রের সাদা বাড়িগুলো ছাড়িয়ে, রেল ক্রশিংয়ের ডোরাকাটা বার'এর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে ভরশিলভের নামে কৃষিযন্ত্র নির্মাণ কারখানা (এর সংক্ষিপ্ত রুশ নাম সেলমাশ)। সেই প্রথম দিককার পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির সময় তৈরী এই কারখানাটিকে কাপড়ের কলের চাইতে অধিকতর সঙ্গত কারণে গণ বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। এ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম কারখানা যাতে তুলোর বীজ নিষ্কাশনযন্ত্র ও তেল কলের যন্ত্রপাতি ছাড়াও তুলো আবাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র তৈরী হয়। বেশীর ভাগ যন্ত্রই উজবেকিস্তানে আবিষ্কৃত ও পরিকল্পিত।

রঙীন ফুলের কেয়ারি করা এ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তা ধরে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যেতে যেতে রুশি লোকেরা যে উজবেকদের ভাইদের মতো সাহায্য করেছে. সে কথাই মনে হয়। কারখানায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বসানো তার উপর দেখতে পাওয়া যায় উরাল, মস্কো অথবা লেনিনগ্রাদের কারখানার ট্রেড মার্কা। সেলমাশে যে কোন মাঝবয়েসী রুশি শ্রমিক এমন উজবেকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে যাদের সে তার শিল্প কৌশল শিখিয়েছে। ঢালাই কারখানার লোকেরা সেলমাশের ইতিহাসের এমন অদ্ভুত ধরনের অবিস্মরণীয় কাহিনী বলবে যাতে আছে জাতিগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা। কিন্তু প্রথমেই আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত।

সকলেই জানেন যে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও অন্যান্য উপনিবেশবাদীরা সর্ব উপায়ে প্রাচ্যের জাতিগুলির মধ্যে বিরোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তাদের ঠেলে দেয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আর দাঙ্গায়। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে আমাদের দেশের বাইরে এখনও এমন লোক আছে যাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, সোভিয়েত জাতিসমূহকে সত্যিকার মহান বন্ধুত্ব ও মৈত্রী একসূত্রে বেঁধেছে। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম বহু কোটি লোকের এক শক্তিশালী জাতি, এই রুশ জাতি ক্ষুদ্র জাতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের লুণ্ঠন করে লাভবান না হয়ে তাদের সাহায্য দিল, তাদের জন্য প্রকৃত সমানাধিকার স্থাপনের প্রয়াসে তাদের নিজস্ব শক্তিশালী শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধুত্ব বহু রূপে দেখা দেয়। যেমন স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় উজবেকরা তাদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক নির্দেশনামায় বলে: 'মনে রেখো তোমাদের রাস্তার সুরু বেলরুশিয়াতে আর উক্রেনীয়বাসীদের

ঘর তোমাদেরই মহল্লায়।' সেই যুদ্ধের ঝড়ের দিনগুলিতে উজবেকিস্তানে এই বন্ধুত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা ফ্রন্টের বন্ধুত্বের চেয়ে কম জোরদার নয়। তখনই সেলমাশ (বিশেষ করে ঢালাই বিভাগ) নিজের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় পৃষ্ঠা যোগ করে।

সে সময় অসাধারণ সব কারখানা, হাজার হাজার মাইল দূরে তৈরী সব কারখানা এসে হাজির হল তাসখন্দে। জ্বলন্ত সহরের আলোয়, শত্রুর বিমানের গোলা ও মেসিনগানের মুখে কারখানাগুলিকে রেলগাড়িতে চাপিয়ে পূব দিকে সরিয়ে আনা হল। যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছনে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ওগুলিকে বসাতে হয়েছে, শ্রমিক খুঁজে বার করতে হয়েছে, তাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ এবং কারখানায় বিদ্যুৎ শক্তি যোগানোর জন্য শক্তিশালী বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়েছে। এ সব কিছুই করতে হয়েছে তাড়াতাড়ি। তাসখন্দে আনা যন্ত্রপাতি কারখানার দুই বিভাগের মাঝখানে বা বাইরে কাঠফাটা রোদে বসানোর সঙ্গে সঙ্গে চালু হল। প্রথমত এগুলি ছিল সেলমাশের যন্ত্রপাতির অংশের মতো। প্রথম কয়েক সপ্তাহ কারখানাগুলির মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন চালানো হল আর তাসখন্দের সর্ববৃহৎ কল স্বভাবতঃই হল এই উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র, কেননা সেখানে ঢালাই বিভাগ ছিল।

তাসখন্দবাসীরা দেখতে পেল খোলা জায়গায়, চালু যন্ত্রপাতির চারপাশে কিছু দিনের মধ্যেই নূতন কারখানার দেয়াল আর বিশাল খিলান-দেওয়া ছাদ তৈরী হচ্ছে। দেখতে পেল দ্রুত গতিতে একটার পর একটা চিমনি মাথা তুলছে। এক একটা চিমনি দিয়ে যেই ধোঁয়া বার হত তখনি লোকে বুঝত যে কারখানাটি আর সেলমাশ কারখানার অংশ নয়, তার নিজস্ব জীবন শুরু হয়ে গেছে। আগামী দিনের লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সময়ের কথা মনে রাখবে। সেই অপ্রত্যাশিত কঠিন অবস্থার মধ্যে মানুষ যখন লড়াই করছে যুদ্ধক্ষেত্রে আর নারী, বৃদ্ধ ও কারিগরী-ছাত্ররা কাজ করে চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে, তখন একমাত্র উজবেকিস্তানেই যুদ্ধ সীমানা থেকে সরিয়ে-আনা প্রায় একশ বড় কারখানা চালু করা হয়। যুদ্ধ শুরু হবার পর প্রথমবার যেই আমাদের জয় ঘোষণা করে তাসখন্দে কামান গর্জে উঠল, ঐ কারখানাগুলিকে দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত করা হল শান্তিকালীন উৎপাদনের কাজে।

সেলমাশেরও পরিবর্তন ঘটল। এর শ্রমিকেরা ফিরে এল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। ঘরে-ফেরা ছেলেদের অভ্যর্থনা জানিয়ে রুশ মায়েরা তাদের বুকে জড়িয়ে ধরল। ঐ সময়ে পুরোনো রীতি অনুযায়ী উজবেক নারীরা সন্তানের আনত মাথার উপর মিষ্টি ও মুঠিভরা মুদ্রা বর্ষণ করল যাতে সুখী হয় তারা। এই সন্তানরা, যারা শ্রমিক হিসেবে জটিল যন্ত্রপাতি চালাতে শিখেছে এবং পরে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধের আগুনে দৃঢ় হয়েছে — মিষ্টি বা

মুদ্রা তাদের একমাত্র সুখ নয়। মায়েদের অবশ্য সবচেয়ে বড় সুখ এই যে তারা বেঁচে ফিরে এসেছে। তবু তারা সেই পরিচিত অনুষ্ঠানে যোগ দিল কেউ নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে কেউ বা সানন্দ কৌতুকে। প্রকৃত সুখের কথাই ভাবল তারা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার শান্তিপূর্ণ কাজে লাগার ব্যাকুলতা তাদের।

সেই সুখ আবার ফিরে এসেছে। এর প্রমাণ অসংখ্য।

সেলমাশ শ্রমিকরা ইস্পাত-নীল নূতন তুলো-কাটা যন্ত্র শুষ্ক কঁরান ঘর থেকে রোদে-রাখা এ্যাসফল্ট অংশে নিয়ে যাচ্ছে। জোড় লাগাবার বিভাগের কর্তা তালিপ সাদিকভ চেয়ে চেয়ে দেখছেন রেলওয়ে ট্রাকে ওগুলিকে বোঝাই করা হচ্ছে। উনি কী ভাবছেন? হয়ত সেই দূরের উক্রেনীয়, আজারবাইজানী ও রুশ যৌথখামারীদের কথা যারা পাবে এই যন্ত্রগুলি। যৌথখামারীদের কাছে তুলো-কাটা যন্ত্র একটা ঘটনার মত ঘটনা। ইউনিয়নের রৌদ্রালোকিত দশটি প্রজাতন্ত্রে সেলমাশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। তুলো উৎপন্নকারী উজবেকরা অন্যান্য তুলোচাষকারী সোভিয়েত জাতিগুলিকে শুধু পরামর্শই দেয় না, তুলো চাষের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি দিয়েও সাহায্য করে। এটাই হল তাসখন্দের সেলমাশ কর্মীদের গর্বের বিষয়।

সেলমাশ দেখার সময় এক বিভাগ থেকে আর একটিতে গেলে নজরে পড়ে সুখী ও শান্তিপূর্ণ শ্রমের লক্ষণ। ৭ নম্বর বিভাগের কাছাকাছি গেলে দূর থেকে কানে আসে অদ্ভুত ঐকতানের মতো একটা আওয়াজ।

এখানে রুশ শ্রমিক দ. সুদাকভ উজবেকিস্তানের দ্রুতগতি কর্মী আন্দোলনের পত্তন করেন। 'লিফ্‌ট' কারখানার তরুণ টার্ণার বরিস পাভ্‌লভ্‌স্কি সুদাকভের পন্থা গ্রহণ করেন, তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মধ্য এশিয়ায়। তিনি এখন প্রচন্ড গতিতে প্রতি মিনিটে ৮০০ গজ ধাতু কাটেন (আগেকার কাটার হার ছিল ৭৭ থেকে ৮৭গজ)। কিন্তু সেলমাশ কর্মীরাও নিজেদের সুনাম রক্ষা করল। সুদাকভ অনেক কর্মীকে, এর মধ্যে উজবেকও আছে অনেক, তাঁর নূতন কায়দা শিখিয়ে দিয়েছেন; ফলে সবাই এখন জানে যে ৭ নম্বর বিভাগটি হল দ্রুতগতির কাজে ওস্তাদ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, এই বিভাগে যারা কাজ করে তার মধ্যে আছে মুসতাকিম ইউসুপভ। ইনি হলেন সেলমাশের বিখ্যাত ফোরম্যান। তাসখন্দের কেন্দ্রে কার্ল মার্ক্স স্ট্রীটে সম্মান তালিকায় পাভ্‌লভ্‌স্কির পাশে তাঁর নামও সোনার অক্ষরে লেখা।

কারখানায়, উৎপাদন সংক্রান্ত সভায় বা গৃহে, সেলমাশে নূতন-পন্থী আন্দোলনের জন্মদাতা যে কোন উজবেক কর্মীর সঙ্গে কথা বললে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একই ধরনের

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়। ধরা যাক ইস্পাত ঢালাইকারী সাদিকভ, ছাঁচ-প্রস্তুতকারী ইসমাইলভ, কিম্বা প্যাটার্ণ-প্রস্তুতকারী সাকুরভের কথা: যে কোন বিষয় নিয়েই কথা সুরু করা যাক না কেন, আলোচনাটা উৎপাদন ও যন্ত্রঘটিত সমস্যায় বাঁক নিতে বেশী দেরী হবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা উত্তেজিতভাবে যন্ত্রসংক্রান্ত সূক্ষ্ম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে ওস্তাদ। কারও যদি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকে, তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার এদের আগ্রহ চমকপ্রদ। রুশ জনগণ উজবেক জনগণের একটি নূতন, অজানা জগৎ উদ্ঘাটিত করেছে — এটি হল আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং'এর জগৎ।

সেলমাশে বলতে গেলে এরকম কোন যন্ত্র বা কর্মস্থান, টেক্নলজিকাল পদ্ধতি বা রীতি নেই যা রাশেনাইলেজসনকারীদের কর্মগুণে উন্নত হয়নি। সেলমাশের কর্মীরা নূতন কার্য-প্রণালী নিয়ে আলোচনা করছে এরকম কোন উৎপাদন সংক্রান্ত সভায় যোগ দিলে সবসময়ে মনে হবে উজবেকিস্তানে আছেন, কারণ উজবেক বক্তারা স্বচ্ছন্দে টেক্নিকাল শব্দসমূহ ব্যবহার করলেও তাদের কথায় আছে স্থানীয় ধাঁচ।

তাসখন্দ মর্দ্যানে পথের উপর উটের খুরের চওড়া চিহ্ন আজকের দিনে এক বিরল ব্যাপার। তার বদলে নজরে পড়বে রবার টায়ার আর ক্রলার ট্র্যাক্টরের দাগ। উটের উল্লেখ পাওয়া যাবে শুধু প্রবাদবাক্যে, উজবেকরা প্রবাদ আওড়াতে বড়ো ভালোবাসে আর যথা সময়ে বলে।

উৎপাদন সংক্রান্ত সভায় কোন পিছিয়ে পড়া শ্রমিক তার খারাপ কাজের দোষ যন্ত্রটির ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলে তাকে এই জনপ্রিয় বিজ্ঞ প্রবাদবাক্যটি বলে সিধে করা হয়: 'অপটু লোক উটও চালাতে পারে না।' নূতন পন্থা প্রয়োগের ভার নিয়ে জনৈক নামজাদা কর্মী যদি কোন না কোন অসুবিধের কথা তোলে তা হলে তাকে এই ধরনের ক্রুদ্ধ জবাব শুনতে হয়: 'উটে চেপে ছাগলের পিছনে লুকোতে চেও না।' আমি একবার এক সভায় যোগ দিয়েছিলাম। সে সভায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, কাজে যে ভয়ানক ভুল করে, অনেকক্ষণ আর যুক্তিহীন কথা দিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চাইছিল। এমন সময় শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে এই মুষলটি তার উপর নিক্ষিপ্ত হতে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল:

'অত কথার কাজ কি? পিছিয়ে পড়লে উটের পায়ের ধুলো চোখে ঢুকবেই ত!'

রুশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতির সঙ্গে উজবেকদের বন্ধুত্বের অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে একটি ছোট্ট ঘটনা বিশেষ মর্মস্পর্শী। প্রতি বছর নব বৎসরের উপহার হিসেবে সাইবেরিয়ার শ্রমিকরা তাসখন্দের শ্রমিকদের ছেলেপুলেদের ট্রেন বোঝাই ফার

গাছ পাঠায়। তখন রেল স্টেশনের সংলগ্ন চত্বর আর শ্রমিকদের পাড়ার রাস্তাগুলি ফারের কাঁটার মধুর গন্ধে সুরভিত হয়ে ওঠে। এই সৌরভ তাসখন্দে কতই না অসাধারণ। আর সুদূরে সাইবেরিয়ায় নববর্ষের উৎসবে শিশুরা বাড়িতে যে ফার গাছ সাজায় তাতে ঝুলিয়ে দেয় তাসখন্দ শ্রমিকদের দেওয়া উপহার আপেল, পিয়ার, ডালিম ও কুইনস্ ফল, তাতে দক্ষিণের, সুদূর উজবেকিস্তানের আর সূর্যের সৌরভ।

আমরা আগামী দিনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিজমের কথা ভাবতে এত অভ্যস্ত যে এর জীবন্ত ও স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনেক সময় খেয়াল করতে ভুলে যাই। কারখানার সমগ্র শ্রমিক সম্প্রদায় দূরাঞ্চলের বাচ্চাগুলির জন্য যে মমতা ও আগ্রহ প্রকাশ করে, যেন তারা নিজেদের সন্তান, প্রকৃতপক্ষে এটি কি জাতিসমূহের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি নয়? যে সাম্যবাদকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ সুদূর ভবিষ্যতের জিনিস বলে উল্লেখ করেছিলেন, এটি কি তারি একটি বৈশিষ্ট্য নয়?

সত্য যে তাসখন্দের রাস্তায় ফার গাছের সৌরভ এমন একটি জিনিস যা আপনার মনে থাকবে, কিন্তু এটা ছোট্ট একটা বৈশিষ্ট্য মাত্র। বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের কথা যদি তোলা যায়, আমার বিশ্বাস সোভিয়েত জাতিসমূহকে যে মহান বন্ধুত্ব এক ডোরে বেঁধেছে সাম্যবাদের জীবন্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে তার সব চেয়ে মর্মস্পর্শী প্রকাশ হল স্তালিনগ্রাদ বা কুইবিশেভ জলবিদ্যুৎ স্টেশন বা অন্যান্য গঠনমূলক নির্মাণ কাজের কথা বলা বা ভাবার সময় সোভিয়েত নরনারীর সার্বজনীন উৎসাহ, তাতে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেবার আগ্রহ। তাসখন্দের বহু কারখানা এসব মহান নির্মাণ কাজের ফরমাইস নেয়। কতখানি শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি ও আগ্রহ নিয়ে শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ ঐ কাজে যোগ দেয়, এই কাজ করার জন্য কতখানি গর্বিত তারা, নিজের চোখে সেটা দেখলে মার্ক্সের সেই সুন্দর কথাটির প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে হয়: মানুষের সমস্ত সৌন্দর্য ওদের মুখে দেখতে পাচ্ছি আমরা।

তাসখন্দ 'লিফ্‌ট' কারখানার নক্সাকার ধাতুকর্মী ও জোড় লাগাবার লোকরা নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস আগে কুইবিশেভ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য একটি নতুন ধরনের বিশেষ একটি ক্রেন ট্রলি তৈরী করে। স্তালিনগ্রাদ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাতাগণের অর্ডারে বৈদ্যুতিক উইঞ্চ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য চলন্ত ক্রেন তৈরী করে।

যারা তাসখন্দের এক্সকাভেটর, ঘর্ষণের মালমশলা ও যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানায় কাজ করে, সোভিয়েত জনগণের মহান নির্মাণ কাজের জন্য অর্ডার নেয় তাদের পক্ষে ঐ সব নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করা সহজ, কিন্তু সেলমাশ কর্মীরা কী করবে? যেখানে নূতন

গঠনের কাজ সুরু হয়েছে সেখানে তাদের যন্ত্র ব্যবহারের সময় এখনো আসেনি। কিন্তু দেশব্যাপী পরিকল্পনায় কি তাদের কোন অবদান থাকবে না, তারা শুধু অপেক্ষা করবে ঐ সব পরিকল্পনা শেষ হওয়া পর্যন্ত? তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য এক পথ বার করল: সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য বহু সংস্থার শ্রমিকদের মতো তারা সুরু করল খরচ কমাতে যাতে ঐ ভাবে বাঁচানো টাকা উক্ত কাজে লাগতে পারে।

এই ভাবে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, প্রত্যেকটি যন্ত্রে আমাদের লোকেরা আমাদের যুগের বিস্ময়কর কাঠামো গড়ে চলেছে। আগামী দিনের লোকেরা এর প্রশংসা করবে, এরা বলে দেবে আমাদের সময়কার কথা যে সময় ছিল মহৎ প্রত্যাশা আর মহান সাফল্যে পরিপূর্ণ।

১০। শিল্প চক্র

ভোরে যখন দরজাগুলো খুলে যায়, আর কাজের পোষাক ও ঢিলা জামা পরে সকালের কাজের জন্য নরনারী রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তাসখন্দে এমন কে আছে যে সহরের এই প্রাতঃকালীন কাজের দৃশ্য দেখে আনন্দ না পায়?

এ্যাসফল্ট বাঁধানো পথের উপর তাদের পদধ্বনি জেগে ওঠে। তারা যায় ট্রামে বাসে ট্রলিবাসে চুপচাপ, সংহত, টের পাওয়া যায় তাদের শক্তি কত, কারণ তাদের মধ্যে যে সংহত ভাব সে হল হাজার হাজার মিলিত লোকের পূর্ণ বিশ্রামের পর যারা সতেজ মনে নব সঞ্চিত শক্তিকে কুঁদযন্ত্রে ও কারখানার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যাচ্ছে।

সকালের শিফ্ট যখন রাতের শিফ্টকে ছুটি দেয়, তখন কয়েক মিনিটের জন্য রাস্তাঘাট থাকে নির্জন। পরেই আবার রাস্তা জেগে ওঠে কাজ থেকে ঘরে-ফেরা মানুষের পায়ের আওয়াজে। চলতে চলতে তারা প্রাঙ্গণ ও খোলা জানলার ভিতর দিয়ে বাসনকোষণ ও কাটা চামচের মধুর আওয়াজ শুনতে পায়। মেয়েরা তাদের পাতরাশের আয়োজন করছে।

সোভিয়েত আমলে নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে তাসখন্দ সবচাইতে বড় শিল্প নগরীতে পরিণত হয়েছে। সহরতলীতে গড়ে-ওঠা কলকারখানা তৈরী করেছে একটি শক্তিশালী শিল্প চক্র। আর একটি বৃহত্তর চক্র সমগ্র প্রজাতন্ত্রটিকে ঘিরে রেখেছে। সমস্ত উজবেক নগরী পরিণত হয়েছে শিল্প কেন্দ্রে। বর্তমানে উজবেক প্রজাতন্ত্রে প্রায় এক হাজার বড় ধরনের শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। হ্যাঁ, একটা-দুটো নয় — এক হাজার প্রতিষ্ঠান যা গড়ে উঠেছে রুশ জনগণের সাহায্যে।

কি ধরনের প্রতিষ্ঠান? বেশীর ভাগ উজবেক কল ও কারখানার ফটকের উপর যে কোন লোক স্বচ্ছন্দে একটি চারাগাছের প্রতীক আঁকতে বা খোদাই করতে পারে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদের মতে এটি মালভাসি উদ্ভিদ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সামাজিক নেতারা এর সম্পর্কে অনেক বেশী কবিত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে। তারা বলে এটি হল বন্ধুত্বের প্রতীক, সেই মহান বন্ধুত্ব যা উজবেক জনগণ পোষণ করে রুশ জনসাধারণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিগুলির জন্য। এই চারাগাছটি হল তুলো।

'তুলো উৎপাদনে সুদৃঢ় উন্নতির জন্য প্রাণপণ কর!' উজবেকিস্তান শ্রমশিল্পের উৎপাদনের দিকে এটিই হল মূল মন্ত্র। তাসখন্দের সেলমাশ ছাড়াও তুলো চাষ যন্ত্রীকরণের জন্য যন্ত্র প্রস্তুত হয় উজবেক সেলমাশ ও চির্চিক সেলমাশে। এ দুটি হল কৃষি যন্ত্রের নূতন কারখানা। খুচরো যন্ত্রপাতি তৈরী হয় 'আন্ড্‌তত্রাক্তরদেতাল' কারখানায় আর মেরামতের কাজ হয় কৃষি মন্ত্রিদপ্তরের অগণিত ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানায়। এগুলি প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো। ঐ সব কারখানায় বসানো সব যন্ত্রপাতির উপর স্বচ্ছন্দে তুলোর শুঁটি খোদাই করা যায়।

ইচ্ছে হলে, উজবেকিস্তানের বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসমূহের যন্ত্রপাতির উপরও ঐ প্রতীক আঁকা যায় যেমন এক্সকাভেটর বা অন্যান্য কারখানা। সেখানে তৈরী হয় এক্সকাভেটর, মনিটরস, সাকসন ড্রেজ, সেনট্রিফ্যুগাল পাম্প, গর্ত করার যন্ত্র এবং বহুবিধ সেচ যন্ত্র। নতুন জমির সেচের অর্থই হল অনেক বেশী তুলোর শুঁটি লাভ।

প্রজাতন্ত্রের বহু কেমিক্যাল কারখানার যন্ত্রপাতির উপর প্রতীক হিসেবে তুলোর শুঁটি ঠিক এমনিভাবে আঁকা চলে—যেমন নাইট্রোজেন সার ও সুপারফস্‌ফেট কারখানা, প্রকাণ্ড ইলেকট্রোকেমিক্যাল কারখানা যেখান থেকে যৌথখামার মাঠে অবিরাম ধারায় কৃত্রিম সার জোগান দেওয়া হয় এবং যে সব কারখানায় তৈরী হয় ফসলের কীট প্রতিরোধী রাসায়নিক জিনিস তাদের যন্ত্রপাতির উপরও এমন প্রতীক আঁকা চলে। কিন্তু সবচাইতে চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, প্রজাতন্ত্রে একটি কেমিক্যাল যন্ত্রেরও কারখানা আছে যেখানে প্রস্তুত হয় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির যন্ত্রপাতি।

উজবেক জনগণ যাতে প্রকৃত সমানাধিকার পায় তা স্থির নিশ্চয় করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি উজবেকিস্তানে ব্যাপকভাবে উৎপাদন উপকরণের কলকারখানা বানিয়েছেন। আজকের প্রজাতন্ত্রে একটি ইঞ্জিন কারখানা ('ক্রাসনি দ্ভিগাতেল'), বল বিয়ারিং কারখানা, লিফ্‌ট্‌ কারখানা, শাণ-পাথর প্রস্তুতকারী ঘর্ষণযন্ত্রের কারখানা, ছোটখাট যন্ত্রের কারখান, লোহা

ঢালাইয়ের কারখানা এবং উজবেকদের গর্বের জিনিস লৌহ ও ইস্পাতের প্রথম কারখানা আছে।

প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক তারের কারখানা, ল্যাম্প কারখানা ও দুইটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানায় তৈরী হয় কেব্‌ল্‌ ও সূক্ষ্ম তার, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌, বেতার বাল্‌ব্‌, তুলোর দ্রুত শুষ্ককরণ যন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রে নির্মীয়মাণ বিদ্যুৎ স্টেশনের জন্য বহু বিচিত্র ধরনের যন্ত্রপাতি। এখানে এমনকি হাইড্রলিক টারবাইন তৈরী হয়।

নূতন কলকারখানার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি ছাড়াও জ্বালানি চাই প্রচুর পরিমাণে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে জ্বালানি আনার দায় থেকে বাঁচার জন্য উজবেকিস্তানেই বৃহৎ কয়লাখনি ও তৈলকূপ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দূরের দেশ থেকে যাতে খনি কাটা আর তৈলকূপ খননের যন্ত্রপাতি না আনতে হয় সেজন্য, সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা অনুযায়ী কাছাকাছি এই সব জিনিস উৎপাদনের কারখানা বসানো হয়েছে।

প্রজাতন্ত্রে তৈল নিষ্কাশন এত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে যে তৈল শোধনাগার শিল্প না গড়লে নয়। তৈরী করা হচ্ছে একটি বৃহৎ তৈল শোধনাগার।

এই সব কলকারখানার প্রধান উদ্দেশ্য হল কোটি কোটি তুলোর শুঁটি উৎপাদন, লক্ষ লক্ষ টন তুলো তন্তু লাভ করা। আর কত কলকারখানা উজবেকিস্তানে সৃষ্টি করা হল যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে তুলোর শুঁটিরই উপর।

ডজনখানেক তুলো শোধন-কারখানা ও তুলোবীজ-জাত তেল কলের কাঁচা মাল হল উজবেকদের দ্বারা উৎপন্ন তুলোর শুঁটি। বর্তমানে উজবেকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে বস্ত্র চালান দিয়ে সেখানকার লোকেদের পরিচ্ছদ জোগায়। দুইটি বিরাট কাপড়ের কল ছাড়াও উজবেকিস্তানে আছে বহু সুতো ও কাপড়ের কল, একটা হোসিয়ারি কারখানা, সমস্ত বড় বড় সহরে গড়ে উঠেছে পোষাক তৈরীর কারখানা। এই তুলোর শুঁটি কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় হাউড্রলিসিস্‌ কেমিক্যাল কারখানায় ও প্যাকিং বস্ত্রের বয়ন কলে। এ ছাড়া আছে একটি বড় কাগজ তৈরীর কারখানা। এই কাগজে উজবেকিস্তানের সাময়িক পত্রিকা ও বই ছাপা হয়। সমাজতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী বস্ত্র বয়নের যন্ত্রপাতির নির্মাণ কারখানাও বসেছে এই সব কলকারখানার কাছাকাছি। আর তাসখন্দে আছে নির্মীয়মাণ তুলো শোধন-কারখানা ও তুলোবীজ-জাত তৈল কারখানার যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা।

গৃহ নির্মাণ সাজসরঞ্জামের শিল্প না থাকলে এত ব্যাপক, শক্তিশালী ও আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্মত শ্রমশিল্প গড়ে উঠতে পারত না। প্রথম শ্রেণীর সিমেণ্ট প্রস্তুতকারক

পুরোনো খিলকভো সিমেণ্ট কারখানা পরে বড় ও পুনর্গঠিত করা হয়েছে। উজবেকিস্তানের কলকারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্রগুলির ভবন ও ভিত্তি নির্মাণ করার জন্য এই সিমেণ্ট ব্যবহৃত হয়। এখন প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অন্যান্য নূতন ও বড় সিমেণ্ট কারখানা গড়ে উঠেছে, ঐ সঙ্গে গড়ে উঠেছে কাঁচ তৈরীর কারখানা, ইঁট ও টাইল, বিটুমেন, স্লেট, এস্‌বেসটস নল, এলাবাসটার ও বাড়ি তৈরীর ব্লকের কারখানা।

কোন না কোন প্রকারে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তুলোর শুটির সঙ্গে জড়িত কলকারখানা ছাড়াও, উজবেকিস্তানে স্থাপিত হয়েছে অন্যান্য শক্তিশালী শ্রমশিল্প। এখানে আছে দুটি বিরাট রেশমের কল ও কয়েকটি রেশম-গুটানো কারখানা, একটি লুসার্ন কারখানা, কারাকুল ভেড়ার চামড়ার কারখানা, ভিসকোস জিনিস ও রোজম্যালো ফ্যাক্টরি, চামড়া ও জুতার কারখানা এবং চলচ্চিত্রের যন্ত্রাদি প্রস্তুতকারী, গ্রামোফোন রেকর্ড ও বার্নিশ রঞ্জক দ্রব্য ও রঙের কারখানা।

চারটি চিনি শোধনাগার, কুড়িটি টিনে ভর্তি ফল দ্রব্য ও কাঁচা মাল হিসেবে ফল ব্যবহার করা কারখানা, বিভিন্ন মদ তৈরীর কারখানা, একটি চা প্যাক করার কারখানা, তামাক ও মিঠাই প্রস্তুতের কারখানা, মাংস প্যাক ও নানাবিধ মাংসদ্রব্য করার বৃহৎ কারখানা, বিয়ার কারখানা এবং খাদ্য শিল্পের আধুনিক যন্ত্রচালিত কারখানাও আছে এখানে। এগুলিও প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছোট নয়। তাসখন্দ ময়দা কল ও এলিভেটর প্রাক-বিপ্লব সময়কার উজবেকিস্তানের সমস্ত ময়দা কলগুলকে ছাড়িয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের রীতি অনুযায়ী এই সব কলকারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য একটি কারখানাও নির্মিত হয়েছে।

উজবেকিস্তানের রেলওয়েও সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত। বহু জংসন স্টেশনে ইঞ্জিন রাখার নূতন ঘাঁটি ও যান্ত্রিক মেরামতি কারখানা বসেছে। তাসখন্দে রেল যানবাহন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির কারখানায় প্রস্তুত স্বয়ংচালিত ব্লক সিগনাল ও অন্যান্য সব চাইতে আধুনিক ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা উক্ত রেলওয়েতে প্রবর্তন করা হয়েছে।

তাসখন্দে আর একটি রেল যানবাহন কারখানা আছে — এটি হল প্রসিদ্ধ কেন্দ্রীয় রেলওয়ে কারখানা, পরে এটিকে লোকমটিভ ও ট্রাক মেরামত কারখানায় বিবর্ধিত করা হয়েছে। ত্রিশ বছর আগে যুদ্ধজাহাজ 'আভ্‌ররা'য় তোপধ্বনির সঙ্গে তার সাইরেন বেজে উঠে ঘোষণা করল, মধ্য এশিয়ায় জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধের যুগের অবসান ঘটল, এমন নূতন যুগের শুরু হল শতাব্দীর পর শতাব্দী যার স্বপ্ন দেখেছে মানুষরা। এই যুগের

পূর্বসূরী পুশকিন এ সম্বন্ধে লিখে গেছেন: এ হল সেই সময় 'যখন মানুষ দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে এক বৃহৎ পরিবারে মিলিত হবে।'

অক্টোবর বিপ্লবের দিনে রেল শ্রমিকরা যে ছয়টি কামান ব্যবহার করেছিল তার একটিকে রাখা হয়েছে কারখানার ছোট্ট মিউজিয়ামটির প্রবেশ দ্বারে। সযত্নে রক্ষিত মিউজিয়ামের প্রদর্শনী দ্রব্য উজবেকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন ও গুপ্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপের কথা প্রকাশ করে প্রমাণ করে শ্রমিক শ্রেণীর সেই গণ রাজনৈতিক পার্টি কি ভাবে একটা পিছিয়ে থাকা ঔপনিবেশিক অঞ্চলকে সমুন্নত শিল্প সহ স্বাধীন, উন্নতিশীল সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে। এই পার্টিকেই লেনিন বলেছিলেন আমাদের যুগের বুদ্ধি, সম্মান ও বিবেকের দর্পণ।

১১। সহরের উপর যখন রাত নামে

সন্ধ্যায় একবার তাসখন্দের রাস্তায় বেরোন। এ সময়টিতে বাতাস স্নিগ্ধ, পপলার গাছগুলোকে দেখায় কালো, বাড়ির জানলা নীল দেখতে, প্রথম তারারা আকাশে মিটমিট করে, কার্নিশ থেকে কার্নিশে বাদুড়ের ছায়া সরে সরে যায় এবং সুবেশ নরনারী সহরের পার্কে, সিনেমায়, থিয়েটারে আর ক্লাবঘরগুলিতে ভীড় করে। বিজ্ঞাপনগুলো একবার দেখুন। সহরের নয়টি থিয়েটার এবং দশটি পার্কে খোলা রঙ্গমঞ্চের এবং অগণিত চলচ্চিত্রের রকমারি প্রচারপত্র। নজরে পড়বে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত সমাজ, সঙ্গীত কলেজ ও সংস্কৃতিভবনের অনুষ্ঠানলিপি। নজরে পড়বে একটি সার্কাসের বিজ্ঞাপন, সেখানে সাধারণ অনুষ্ঠান ছাড়াও আছে উজবেক খেলোয়াড়দের সেই রাস্তার খেল ও দড়াবাজির পুরোনো কলা কৌশল।

যদি আপনার মৌলিক সুষমায় গাওয়া উজবেক লোক সঙ্গীতের সুর পছন্দ হয় তাহলে যান মুকিমি সঙ্গীত থিয়েটারে। এটি হল লোক সঙ্গীতমূলক কমেডি রঙ্গমঞ্চ, খুব জনপ্রিয়। আধুনিক উজবেক অপেরায় পাওয়া যায় লোক সঙ্গীতের সুর ও ছন্দের আদিম আবেগ। রুশ সঙ্গীত সংস্কৃতির সম্পদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে উজবেক বাজনার সুরের বৈশিষ্ট্য। এ জিনিস শুনতে হলে যেতে হবে নাভোই রাষ্ট্রীয় অপেরা থিয়েটারে। এখানে সাক্ষাৎ ঘটবে উজবেকিস্তানের সেরা গায়িকা ও নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গে। কিন্তু উজবেক নাট্যকলার জীবন্ত আবেগ অনুভব করতে চাইলে যেতে হবে হমজ রাষ্ট্রীয় থিয়েটারে নাটক দেখার জন্য।

এর দেয়ালে প্ল্যাস্টারের কারুকার্য, কিনারায় জালি দেওয়া ছাদ এবং প্রফুল্ল নরনারীকে দলে দলে এর ভিতর যেতে দেখলে একথা কল্পনা করাও কঠিন যে বছর পঁচিশেক আগে এখানে বসত এশীয় বাজার। এখানে গণৎকার ভাগ্য গণনা করত আর মাঝে মধ্যে দেখা যেত আপাদমস্তক ঢাকা নারীমূর্তি। প্রত্যেক মানুষের মাথায় নিজের শবাচ্ছাদন, কারণ বাড়ি ছেড়ে দূর দেশে মরে গেলে মুসলমানরা মাথায় যে পাগড়ী জড়ায় সেটাই হল তাদের শবাচ্ছাদন।

ছেলেবেলায় এই বাজারে প্রায় ঘুরে বেড়িয়েছি। চিড়িয়ার লড়াই দেখতাম, কখনো বা শুনতাম দরবেশদের সুর করে আওড়ানো ছড়া। একদিন এক নাটক দলের অভিনয় দেখলাম। নটনটিরা সামনের সারিতে বসা বণিকদের বিদ্রূপ করছিল। ওরা টাকাওয়ালা লোকের হারেমে বিক্রি করা একটি মেয়ের করুণ কাহিনী বলল, উত্তেজনাময় গান গাইতে লাগল। স্ত্রী ভূমিকায় ছিল পুরুষরা। নাটকের ঘটনা অনুযায়ী যখন কারও কাঁদার কথা তখন সে সত্যি সত্যি চোখের জল ফেলল। মঞ্চের উপর মারামারিও হল জোরদার যার ফল দাঁড়াল ক্ষতবিক্ষত মুখ আর রক্তাক্ত নাক। এই দলটিই পরে হম্‌জ থিয়েটার সৃষ্টি করে। গৃহযুদ্ধের সময় এরা ট্রান্স কাস্পিয়ানের রণাঙ্গনে ও ফেরঘানা উপত্যকায় অভিনয় করেছে। বিশেষ ট্রেনে করে তরুণ উজবেক নটরা যেত ওসব জায়গায়।

১৯১৮ সালের বসন্তের এক সন্ধ্যায় নমানগানের প্রধান রাস্তায় প্লাম গাছ-ছাওয়া লোকভর্তি উন্মুক্ত চাখানায় এই হম্‌জ থিয়েটারের লোকরা অভিনয় করেছিল, সেই দিনের কথা ওরা কোনদিনই ভুলতে পারবে না। ওটা ছিল হম্‌জ'র লেখা এক নাটক। পুরুষ কণ্ঠে কুঁদুলে বুড়ীদের পার্ট শুনে লোকে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল। পুরুষদের নারীর ভূমিকায় দেখতে ওরা অভ্যস্ত। হঠাৎ উজবেক পোষাকে এবং খাঁটি উজবেক ভাষা বলতে বলতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল একটি স্ত্রীলোকের, জনতা নিঃশব্দ হয়ে গেল। অভিনেত্রীর অভিনয় চলল। দর্শকদের ভেতর থেকে হাসির রোল, ক্রুদ্ধ চীৎকার ও করতালির ধ্বনি শোনা গেল ... আর তার পরেই 'বাসমাচরা!' বলে এক প্রচণ্ড চীৎকার। চক্ষের নিমেষে চাখানা খালি। মিনিটখানেকের মধ্যে অভিনেতারা থিয়েটারী পোষাক না খুলে অভিনেত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে জোর কদমে চলল।

সেই হল উজবেক রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের প্রথম আবির্ভাব। এঁর নাম মারিয়া কুজনেৎসভা, বর্তমানে উজবেকিস্তানের লোক অভিনেত্রী এবং সারা প্রজাতন্ত্রে পরিচিতা। নমানগানে এক রুশ মেকানিকের পরিবারে তার জন্ম, শৈশব থেকে সে খাঁটি উজবেক ভাষা বলতে পারত।

তার পরে অন্যান্য অভিনেত্রীরা উজবেক রঙ্গমঞ্চে যোগ দেয়, এদের মাতৃভাষা উজবেক। এদের মধ্যে প্রথমে নাবেন মাকস‍ুমা কারিয়েভা, তাঁকে বহ‍ুদিন ছদ্মবেশে থাকতে হয়। অভিনয় শেষ হওয়া মাত্র পারানজায় আপাদমস্তক ঢেকে জানলা দিয়ে পালিয়ে যেতে হত এঁকে।

ত্রিশ বছর আগে মস্কোতে কাজান রেল স্টেশনে একটি চোদ্দ বছরের উজবেক মেয়ে এল। ট্রেন থেকে নেমে সে তার চাচভান খ‍ুলে ফেলল। এটা হল ঘোড়ার লোমে তৈরী ঘোমটা এবং পারানজার অংশ। তার সঙ্গী অন্তরঙ্গ বন্ধ‍ু তুরস‍ুন ওয়ে ছাড়া প্লাটফর্মে ভীড় করা মান‍ুষগ‍ুলির মধ্যে কেউ জানত না এই মেয়েটির জীবনে সেই ম‍ুহ‍ূর্তটি কী মহান: যে ম‍ুখ সে অনাবৃত করল তাতে আর বোরখা লাগবে না কোনদিন। এর নাম সারা ইশানতুরায়েভা। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উজবেকিস্তানের লোক অভিনেত্রী। ইনি নাট্যকলা শেখবার জন্য মস্কোয় এসেছিলেন।

সারার শৈশব কাটে দ‍ুঃখে। তিনি বলেন, 'সে সময়কার কথা মনে পড়ে যখন ভেঙ্গে পড়া মাটির দেয়াল ঘেরা ছোট্ট উঠোনটুকুতে ঘ‍ুরে বেড়াতাম, দেওয়ালের উল্টোদিকে প্রায়ই দেখতে পেতাম পারানজা-পরা একটি স্ত্রীলোকের ম‍ুখ। তার চাচভান ঈষৎ উপরে তোলা। সে কেন আসে ভেবে অবাক হতাম। এসে অনেকক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালের উপর দিয়ে এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকাত। তার আয়ত কালো চোখদ‍ুটি জলে ভরে উঠত। তারপর চাচভান নাবিয়ে সে চলে যেত। বড় হয়ে আমি জানতে পারলাম উনি আমার মা।' নিদার‍ুণ দারিদ্র্যের জন্য সারার মা বাধ্য হয়েছিল তার সন্তানদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বিলিয়ে দিতে।

সারার যখন ন'বছর বয়স তখন তার পালক পিতা তাকে নিয়ে যায় মসজিদে। 'বাবা আমায় কেন যে মসজিদে নিয়ে গেলেন কিছ‍ুই জানতাম না। সেখানে পাগড়ী পরা পাকা দাড়ি ব‍ুড়োদের দেখতে পেলাম। বাবা তাদের কাছে অন‍ুরোধ জানালেন, ক্রেতা আরতিক বাই পাঁচশ র‍ুবল ফিরিয়ে নিক। আমি আরতিক বাইকে জানতাম। লোকটা ধনী, বয়স পঁয়ষট্টি গোছের, চারটে বউ তার। আমাকে প্রায়ই তার বাড়ি পাঠান হত, সে আমাকে দিত শ‍ুকনো খ‍ুবানী। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম সেখানে আমাকে বউ হিসেবে দেখাবার জন্য পাঠান হত। আরতিক বাই পাঁচশ র‍ুবল দিয়ে আমাকে বউ হিসেবে কিনে নিয়েছিল। কিন্তু বাবার দয়া হল আমার উপর। তিনি সাশ্র‍ুনয়নে চুক্তিটাকে বাতিল করার জন্য বৃদ্ধদের কাছে অন‍ুরোধ জানালেন।' সারার পালক পিতা অভাবের তাড়নায় সারাকে বাইয়ের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বাই সারাকে বউ হিসেবে পায়নি, কারণ সে পালিয়ে গিয়ে এক শিশ‍ুভবনে আশ্রয় নেয়।

শিশুভবনে সে সৌখীন নাটকের চক্রে যোগ দেয়, ঠিক করে অভিনেত্রী হবে। আরও কয়েক বছর বাদে চৌদ্দ বছরের এই মেয়েটি নিজের বয়স বাড়িয়ে বলে ভাখতানগভ থিয়েটারের সাথে যুক্ত উজবেক নাটক স্টুডিওতে ভর্তি হওয়ার জন্য মস্কোয় রওনা হয়। এখানে সে বিখ্যাত রুশ অভিনেতা র. সিমনভ, ল. স্ভের্দলিন, ও. বাসভ ও অন্যান্যের কাছে শিক্ষা নেয়। সোভিয়েত কালের প্রথম যুগের অ-রুশ অভিনেত্রীর এই সাধারণ পথ। দেয়াল-ঘেরা মধ্যযুগীয় আবেষ্টনী থেকে নাট্য কলার বিশ্বকেন্দ্রে আগমন, এর সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ!

স্টুডিওর শিক্ষা শেষ করে সারা দেশে ফিরে যায়। উজবেক রঙ্গমঞ্চে তখন চলেছে দুঃসাহসিক অভিযান। বীর বিপ্লবী হমজ'র পরিচালনায় সাহসের সঙ্গে উজবেক রঙ্গমঞ্চ মধ্য যুগীয় প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। বাই ও মুসলমান মোল্লাদের স্বরূপ প্রকাশ করে, নারীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাতে থাকে। এই সময়েই সারার ঘনিষ্ঠতম ও বিশ্বস্ত বন্ধু তুরসুন ওয়েকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এর কারণ হল সারা অভিনেত্রী হবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে। কিন্তু এতে সারা বা অন্য অভিনেত্রীদের আর কেউ ভয় পেল না। তারা পুরাতন জীবনের সংস্কারের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম চালাতে লাগল। ১৯২৯ সালে হমজ নিজেই এ সংগ্রামে প্রাণ দিলেন। এ সত্ত্বেও তরুণ উজবেক অভিনয়শিল্পী ও তার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি যে লড়াই চালাতে লাগল তার পরিসমাপ্তি ঘটল উজবেক জনগণের জয়ে।

সেই সেদিনের অথচ কত সুদূর কাল থেকে উজবেকদের অগ্রগতি বুঝতে হলে দেখতে হবে হমজ থিয়েটারের যে কোন নাটক, যেমন আবদুল্লা কাহহার কৃত 'ইয়াঙ্গি ইয়ের' (সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু রঙ্গমঞ্চে এটিকে দেখান হয়), কিম্বা উজবেক বা সোভিয়েত নাট্যকারের লেখা অন্য কোন নাটক বা কোনো চিরায়ত নাটক। হমজ'র সহ-প্রতিষ্ঠাতা মান্নন উইগুরের চমকপ্রদ ও বিশেষভাবে উজবেক পরিচালনা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দেখা যাবে পেশাদারী নটনটীর বিরাট এক দলকে যারা পৃথিবীর যে কোন রঙ্গমঞ্চের গৌরব হতে পারে, যেমন আব্রার হিদয়াতভ, সারা ইশানতুরায়েভা, আবিদ জালিলভ, শুকুর বুরখানভ, আসাদ ইসমাতভ, লুৎফুল্লা নাজরুল্লায়েভ, নাবি রাহিমভ, আলিম খজায়েভ অথবা সাগদি তাবিবুল্লায়েভের মত অভিনেতাবৃন্দ। যাঁরা তাসখন্দ চলচ্চিত্র-স্টুডিও কর্তৃক প্রযোজিত 'তাহির ও জুহুরা', 'নাভোই' ও অন্যান্য ছবিতে অভিনয় করেছেন তাঁদের অনেকেই সোভিয়েত সিনেমা দর্শকদের পরিচিত।

হমজ থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'ওথেলো'র অভিনয় দেখা উচিত। সোভিয়েত

ইউনিয়নের লোক অভিনেতা আব্রার হিদয়াতভ ও সারা ইশানতুরায়েভা ওথেলো ও ডেস্‌ডেমোনার চরিত্র অভিনয় করেন। এ'দের অভিনয় দেখে একবারও সে রকম মন্তব্য করার কথা মনে আসবে না, যে মন্তব্য প্রায়ই করা হত এই থিয়েটারের প্রথম দশ বা পনের বছরের মধ্যে, 'যাই বল, উজবেক অভিনেতারা আদৌ খারাপ নয়!' এই প্রশংসার মধ্যে অভিনেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবের জন্য অনুকম্পা প্রকাশ পেত। অনুকম্পা এই কারণে যে উজবেক সংস্কৃতিকে উন্নত করার ব্যাপারে আন্তরিক যত্ন সত্ত্বেও যেন এই মন্তব্য করাই স্বাভাবিক: সম্পূর্ণ অন্য ও দূরবর্তী জগতের চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করা উজবেকদের পক্ষে কতই না কষ্টসাধ্য!

আজ কিন্তু একেবারে সুরু থেকেই নাটক ও চমকপ্রদ অভিনয় দেখে সবকিছু ভুলে যেতে হয়। অভিনয় শেষ হয়ে যায়, দর্শকদের তুমুল করতালি, অভিনেতাদের ডাক দিয়ে আনতে নিজেরও গলা ভেঙে যায়, তারপর, বাইরে এসে বড় বড় তারা খচিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আপনার মনের কথার হিসেব নিতে পারেন।

১২। একটি উৎসব প্রসঙ্গে

এক নাগাড়ে দশদিন ধরে উজবেকরা একটি উৎসব করে। এর তোড়জোড় সুরু হয় অনেক আগে থেকে। কয়েক বছর পর পর হয় এই উৎসব কিন্তু প্রজাতন্ত্রের বাইরে। ১৯৫১ সালে তারা এটি পালন করেছিল। উজবেক শিল্প ও সাহিত্যের দশদিনব্যাপী উৎসবের জন্য বহু বিমান ও বিশেষ ট্রেনে করে তাসখন্দ থেকে শত শত লোককে মস্কো আনা হয়।

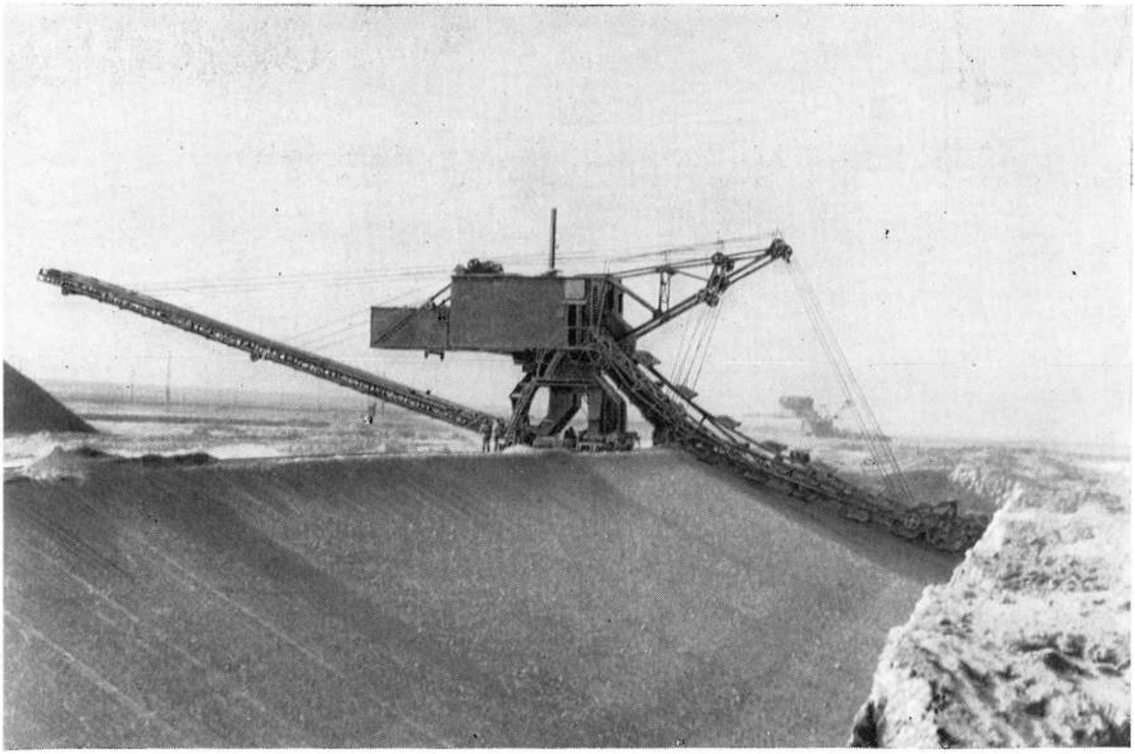
মস্কোতে দশদিনের শিল্প-উৎসব সোভিয়েত মানুষের কাছে একটি রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। স্টেশনে ফুল দিয়ে মস্কো উৎসব-যোগদানকারীদের সানন্দ অভ্যর্থনা জানায়। গত দশদিন ব্যাপী উজবেক উৎসবের সময় সোভিয়েত রাজধানীর সর্ববৃহৎ সিনেমা ঘরগুলিতে উজবেক ছায়াছবি দেখান হয়। উৎসবের কিছু আগে তোলা 'সোভিয়েত উজবেকিস্তান' ছবিটিতে মস্কোবাসীদের সঙ্গে এই প্রজাতন্ত্রের পরিচয় ঘটে। মস্কো সার্কাসে উজবেক খেলোয়াড়রা জাতীয় সার্কাস কলা দেখায়। সোভিয়েত শিল্পকলা আকাদমীতে উজবেক চিত্র ও হস্তশিল্পের এক প্রদর্শনী খোলা হয়। মস্কোর বইয়ের দোকানগুলিতে উজবেক উপন্যাস, গল্প, কবিতা, লোক সঙ্গীত ও মহাকাব্যর সংগ্রহ এবং রূপকথার রুশ অনুবাদ বিক্রি হয়। তাসখন্দের পুস্তক প্রকাশালয় উৎসব উপলক্ষে একশরও বেশী নানা নামের বই বার করে। প্রতিদিন সোভিয়েত লেখক সংঘ সোভিয়েত নামজাদা

সুধী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান উজবেক লেখকদের বই আলোচনার জন্য। সহরের সেরা কনসার্ট হলগুলিতে উজবেক অভিনেতাদের সঙ্গীতানুষ্ঠান চলে। উজবেক কার্পেটের নক্সা-আঁকা উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন ও প্রাচীর পত্রে অনুষ্ঠানলিপি প্রকাশিত হতে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত বেতার কেন্দ্র থেকে এই কনসার্ট প্রচারিত হয়। এর ফলে সারা দেশের লোক উজবেক অভিনেতাদের কনসার্ট শুনতে পায়। হাজার হাজার মস্কোবাসী টেলিভিশনে এই সব কনসার্ট দেখে। যাদের টিকিট জোটে তারা ভাগ্যবান, কারণ রঙবেরঙের জাতীয় পোষাকে উজবেক নাচগানের বৈচিত্র্য তারা উপভোগ করতে পারে।

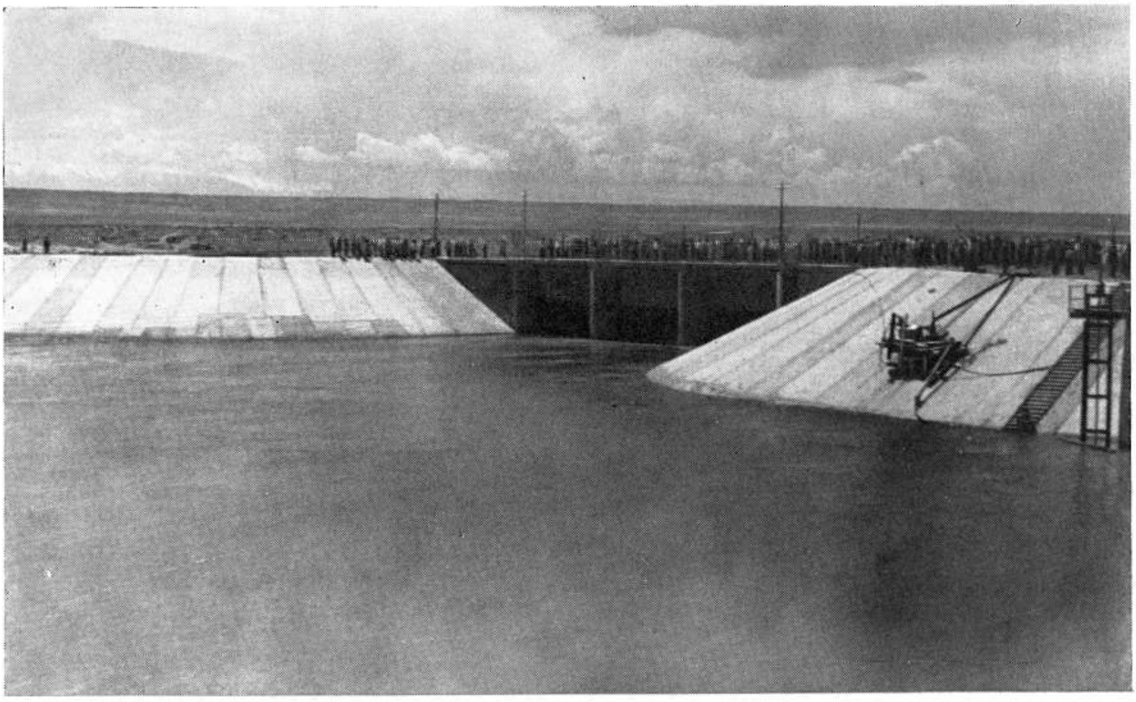
কল্পনা করা যাক আমরা আছি উৎসবের এক কনসার্টে। হালিমা নাসিরভা গাইছেন ফেরঘানার প্রেমমূলক লোকসঙ্গীত 'তানাভার'। সুরকার আলেক্সেই কজলভ্স্কি এটিকে অর্কেস্ট্রার জন্য চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন। গান শুনে কিছুতেই আশ মেটে না। আভ্জ্ ও আক্সের (সুরের আরোহী ও অবরোহী) লোক কৌশলে তার দক্ষতা উপভোগ করার জন্য বার বার অভিনেত্রীকে গাইতে অনুরোধ জানান হয়। সে দক্ষতার দরুণ তিনি সৃষ্টি করেন বিভিন্ন ভাবের, কখনও বা বিনয়নম্র ধ্যানভাব, কখনো মিনতি, কখনো বা আবেগময় আবেদন। তাঁর কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট এত মধুর অথচ বলিষ্ঠ যে কোনো অর্কেস্ট্রা বাজনার মধ্যে চাপা পড়ে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তা এত নিজস্ব যে চিরদিনের জন্য মনের উপর গভীর দাগ কাটে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে লোকসঙ্গীতের আদি-সম্ভারে তিনি গলা সেধেছেন। সম্ভবত সেই জন্য তিনি রুশ লোকসঙ্গীতও এত ভাল গাইতে পারেন, তাই উৎসবের সময় তাঁর গাওয়া রুশ চাস্তুস্কি মস্কো শ্রোতাদের কাছে তুমুল করতালিতে প্রশংসিত হয়। যাহোক, 'তানাভারের' কথাই আবার বলা যাক। সোভিয়েত ইউনিয়নের লোক অভিনেত্রী হালিমা নাসিরভা মস্কো সঙ্গীতশালার গ্র্যান্ড হলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন 'তানাভার' গাইতে সুরু করলেন তাঁর মনে পড়ে গেল একটি ঘটনার কথা। এটা এত বিশেষ ধরনের যে উল্লেখযোগ্য।

উৎসবের কিছুদিন আগে তাসখন্দ অঞ্চলের একটি তুলো উৎপাদন যৌথখামারে হালিমা নাসিরভা গান গাইতে যান। ব্যাপার হল এই যে উজবেকিস্তানে ভাল কাজের জন্য প্রথম শ্রেণীর যৌথখামারগুলি পুরস্কার হিসেবে তাদের প্রিয় গায়ক গায়িকার গান শুনতে পায়। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। উজবেক যৌথখামারীরা হালিমা নাসিরভার এত ভক্ত যে, তাঁর গান শুনতে পাওয়া তাদের একটা রীতিমত সৌভাগ্য। সুতরাং 'সঙ্গীতরূপী পুরস্কার' হিসেবে তিনি এসে পেশছলেন যৌথখামারটিতে। খবর পেয়েই খামারের লোকেরা ছুটল তাদের ক্লাবে, কিন্তু ঘরটা ছোট, বেশীর ভাগ লোকই বসার জায়গা পেল না।



ক্ষুধিত স্তেপের দক্ষিণ খাল নির্মাণ।

ক্ষুধিত স্তেপের দক্ষিণ খালের লকগেট।





তুঁত গাছ।

শেষ পর্যন্ত সবাই গুঁতোগুঁতি করে কোনরকমে জায়গা করে নিল। আলো নিভে গেল। হালিমা নাসিরভা মঞ্চে এসে হলের দিকে চেয়ে দেখলেন। আধো অন্ধকারে শ্রোতাদের রোদে-পোড়া মুখের মধ্যে চোখগুলো চক চক করছে। গুনগুন আওয়াজ বন্ধ হল। গায়িকা বলতে সুরু করলেন।

'পাঁচ মিনিট আগে,' শান্ত কণ্ঠ ভেসে এল, 'আপনাদের সভাপতি আমাকে জানিয়েছেন একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মনে হচ্ছে জেলার নগরে ফসলের হিসাবে কিছু গোলমালের ফলে আপনাদের খামার সেরা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আসলে আপনাদের খামার পিছিয়ে আছে, আর একথা আপনারা ভাল করেই জানেন। মন্ত্রিপরিষদ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন আপনাদের ভাল কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে। এখন কী করা যেতে পারে?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ছোটখাট চেহারার পক্ককেশ এক বৃদ্ধ শ্রোতাদের মাঝখান থেকে এগিয়ে গেল। তার তুবেতেইকার চারপাশে কপালের উপর শক্ত করে একটি সাদা রুমাল জড়ানো। এটা প্রাচীন দেখানদের রীতি, কাজ করার সময় ঘাম গড়িয়ে যাতে জামা কাপড়ে না পড়ে। মঞ্চে উঠে সে বুকের উপর হাত রাখল।

'হালিমা খান,' অভিনেত্রীকে সম্বোধন করে বিনীতভাবে বলল সে, 'বসন্তে যখন আমরা মাঠের কাজে লাগি তখন যৌথখামার কাজের দিনের ইউনিট হিসেবে আমাদের আগাম দেয়। আমরা সবাই যখন আপনার গান শুনবার জন্য জমায়েৎ, একখানা গান গেয়ে আমাদের কিছুটা আগাম দেন না কেন? আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি আমরা আপনার আগাম ফিরিয়ে দেব, সামনের শরতে এত তুলো বানাবো যাতে আপনার গানের আসর বসানোর অধিকার পাই। আপনার গান টাকার চাইতে অনেক বেশী দামী আমাদের কাছে।'

অভিনেত্রী প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। শ্রোতারা সবাই বিনয়ী বৃদ্ধকে সায় দিল, তার অনুরোধে 'আগাম টাকা' হিসেবে তিনি 'তানাভার' গেয়ে শোনালেন। মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। পরে সেই জেলার পার্টি কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে শিল্পীর হঠাৎ তাসখন্দে দেখা হয়ে যাওয়াতে সে জানাল, যৌথখামারীদের আত্মসম্মানে অত্যন্ত গভীর আঘাত লেগেছে তাই 'আগাম টাকার' জন্য অতি উৎসাহে তারা কাজ করছে, কারণ ওরা যে হালিমা নাসিরভার গান শোনার উপযুক্ত তার প্রমাণ দিতে চায় প্রতিবেশীদের কাছে। তারা ওদের নিয়ে হাসিতামাসা করছে। সে বছর শরতে যখন উজবেকিস্তানের মাঠে ওজনের যন্ত্রের কাছে তুলোর গাঁইট স্তূপীকৃত করা হল, যৌথখামারীরা সবাইকে দেখিয়ে দিল, সত্যিই তারা সবচেয়ে এগিয়ে গেছে। বিখ্যাত অভিনেত্রীকে সাফল্যের কথা জানাবার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল। হালিমা নাসিরভা এর জবাবে যৌথখামারে বড় একটি গানের আসরে নামলেন।

হালিমা নাসিরভা যখন দেশের সব জনগণের সামনে গান গাইছেন মস্কোয়, উৎসবে যোগ দিচ্ছেন তখন অনেকগুলির মধ্যে একটি, এই সাদাসিধে ঘটনাটিকে বিচার করলে 'লোক কলা' — এই দুইটি ছোট্ট কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। হাঁ, এটা প্রকৃত লোক কলা। এই শিল্পের উদ্ভব জনসাধারণের ভিতর থেকে জনগণেরই সেবার জন্য। এই একই কথা মনে হবে ব্যালে নর্তকী গালিয়া ইসমাইলভার অভিনয় দেখলে। ইনি আর একজন অনন্যসাধারণ উজবেক, তাসখন্দ ও মস্কো ছাত্রদের প্রিয়।

১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব উৎসবের সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে যখন ইনি বুদাপেশ্‌তে যান তখন তরুণ নর্তকীটিকে খুব কম লোকই জানত। উৎসবে তাঁর 'জাঙ্‌' নামে ঘণ্টাসহ তাজিক লোক নৃত্যটির সময় সমস্ত দর্শকরা আসন থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে, (উৎসবের চলচ্চিত্র 'বিশ্বের যৌবন' ছবিটিতে এই ঘটনাটিকে সুন্দর দেখান হয়েছে) উদ্দেশ্য, তাঁর বাহুর অপূর্ব ভঙ্গিমা ভাল করে লক্ষ্য করা। সে ভঙ্গী এত প্রকাশব্যঞ্জক ও মনোরম যে তার যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। বুদাপেশ্‌ৎ উৎসবে তিনি লরিয়েট উপাধি পান।

মস্কোতে এই দশদিন উৎসবের প্রতিটি আসর দক্ষ কারিগরের বোনা অপূর্ব কার্পেটের মত শ্রোতাদের সম্মুখে প্রসারিত হয়। প্রসিদ্ধ উজবেক লোক নর্তকী মুক্কারাম তুরগুনবায়েভার প্রযোজিত দল বেঁধে নাচের কথা কেউ কোনদিনও ভুলতে পারবে না। প্রাচ্যের যাদুকরদের মত তিনি পোষাকগুলিকে অপূর্ব কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করেন। 'পোষাক নৃত্য' অত্যন্ত অদ্ভুত রঙের নেশা ধরিয়ে দেয়। আর তামারা খানুমের অভিনয় চিরকাল স্মরণে রাখবে না এমন কে আছে? ইনি সোভিয়েত কনসার্ট মঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর একজন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির লোক নৃত্য ও লোক গীতিকে একই উদ্দীপনা ও দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেন। বার্লিনের আন্তর্জাতিক যুব উৎসবে নৃত্যশিল্পী হিসেবে লরিয়েট উপাধীপ্রাপ্ত হালিমা কামিলভা ও ইরগাস শুকুরলায়েভের নাচ দেখে হাততালি দিতে দিতে লোকের হাত ব্যথা হয়ে যায়। শুকুরলায়েভ দেখান 'থালা নৃত্য'। এতে দেখা যায় নৃত্যের সময় কখনও থালাটি মাথার উপর স্থির হয়ে আছে, কখনও ঘুরতে ঘুরতে পিঠের উপর সরে গিয়ে আবার জীবন্ত জিনিসের মত মাথার উপর ঘুরে আসছে। নাচটি দেখে রৌদ্রালোকিত ফেরঘানা উপত্যকার কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে লোকপ্রিয় খেলাধুলোর আর হাসিঠাট্টার আনন্দের হাট বসে। এ ছাড়া আরও বহু জিনিস আছে — সবগুলি উল্লেখের চেষ্টা করে লাভ নেই। সেই অনন্যসাধারণ দৃশ্যাবলীর জাঁকজমক, সঙ্গীত ও ছন্দের বৈচিত্র্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

তামবুরিন এক ধরনের ঢোলক ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু উজবেকদের হাতে এটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সেই কত কাল আগে থেকে, কত প্রাচীন অতীত থেকে তারা দয়রা নামের সেই বৃহৎ সুরেলা তামবুরিনটিকে নিয়ে এসেছে মস্কো শিল্প উৎসবে। অশ্রুতপূর্ব মধুর ধ্বনিতে রাজধানীর প্রেক্ষাগৃহগুলি ভরে গেল। দয়রার মধুর ধ্বনি দীর্ঘায়িত, মাঝে মাঝে মৃদু উচ্ছ্বাসময় শব্দে এর বিরতি, বিভিন্ন ধ্বনির দ্রুত ছোট ছোট ঠেকা এক ধরনের জলপ্রপাতের মত শব্দের প্রতিবেশ সৃষ্টি করে। মনে হয় যেন তামবুরিনটিই শুধু নয়, এর চারপাশের বাতাসও শিল্পীর হাতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতমুখর ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। কখনো হাতখানা তামবুরিনের সঙ্গে সঙ্গে মাথার একেবারে উপরে উঠে যাচ্ছে, কখনো আবার অনায়াসে বুকের উপর নেবে আসছে।

মস্কোতে উজবেক সঙ্গীতানুষ্ঠানে লোক-সঙ্গীতের এই যন্ত্রগুলির বিভিন্ন নিজস্ব গুণ বিশেষ ধ্বনি সম্পদের সৃষ্টি করে। এ হল সেই সব যন্ত্র যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উজবেকেরা বাজিয়ে আসছে। অথচ এরা একই যন্ত্র নয় — এদের নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে। সিমফনি অর্কেস্ট্রায় উজবেক লোক-যন্ত্রগুলিকে ব্যবহার এবং এদের প্রয়োগক্ষেত্রকে বাড়াবার জন্য যন্ত্রগুলিকে নূতন আকার দেবার প্রয়োজন হয়। স্বরের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ওদের ধ্বনি মুখরতাকে বাড়ানো হয়েছে যাতে অন্যান্য যন্ত্রের আওয়াজে এদের সুর চাপা না পড়ে। তাসখন্দে একদল লোক বহু বছর ধরে সমস্যাটির সমাধানের প্রয়াস করে।

আগে তুঁত গাছের কাঠকে সবচাইতে 'ধ্বনিমুখর' বলে মনে করা হত উজবেকিস্তানে। বর্তমানে তারা এমন সব কাঠ দিয়ে যন্ত্র বানায় যার শব্দ আরও ভাল, যথা ফার বা কম রজনওয়ালা পাইন গাছের কাঠ। কতকগুলি যন্ত্রের যেমন গিজাকের এখন গলা বানানো হয়েছে, তারগুলোকে আগের চাইতে উঁচু করা হয়েছে। কিন্তু বাজিয়েরা যন্ত্রটিকে আগের কায়দাতেই ধরে অর্থাৎ খাড়াভাবে, নীচু অংশটিকে হাঁটুর উপর রাখা হয়, বেহালার মত নয়। এতে তার পক্ষে 'দোলায়মান' লোমে ছাওয়া ছড়িটিকে ব্যবহার করার সুবিধে হয়, বাজাবার সময় আঙুলের সাহায্যে লোমগুলোকে টান ও ফিতার মত চওড়া করা হয়, পুরো আওয়াজের জন্য এরকম করা জরুরী। গিজাকের ছড়ি বৈশিষ্ট্যময় শব্দ সম্পদ সৃষ্টির সহায়ক।

দশ দিনের এই অনুষ্ঠানকে মস্কোবাসীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও পুস্তকের উৎসব হিসেবে মনে রাখে। আর এতে যারা যোগ দেয়, অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, লোকদের সঙ্গে মেলামেশা তাদের মনে গভীর দাগ কাটে। উজবেক তুলো থেকে যারা সুন্দর কাপড় তৈরী করে মস্কোর ত্রিয়োখগরনাইয়া কলের সেই শ্রমিকরা তাদের কারখানায় কনসার্ট দেবার জন্য আসা উজবেক

লেখক ও অভিনেতাদের অভ্যর্থনা জানায়। লিখাচভের নামে মস্কো মোটর কারখানার শ্রমিকরা, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল ও রেল কর্মীরা উৎসবে যোগদানকারী এই লোকদের পেয়ে কতই না খুশি। উজবেক লেখকরা তুরস্কের বিখ্যাত বিপ্লবী কবি নাজিম হিকমেতের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে দেখে মনে পড়ে যায় প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির মেহনতী জনতার জীবনের কথা। উজবেক লোক কাহিনীর কথক বৃদ্ধ ফজিল ইয়ুলদাসের সঙ্গে করমর্দন করে নাজিম হিকমেত যখন বৃদ্ধের হাতের উপর সন্তানের মত মাথা পেতে রাখলেন সবাই তখন গভীরভাবে বিচলিত হন।

... দশদিন কেটে গেল, উৎসব শেষ হল। উজবেক বন্ধুদের বিদায়-দিতে-আসা লোকজনে স্টেশনের প্লাটফর্মটি গম গম করছে। উজবেকরা ফিরে গেল নিজের দেশে।

১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যান্য বারের চেয়েও বেশী সাফল্যে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয় দশদিন ব্যাপী উজবেক চারুশিল্প ও সাহিত্য উৎসব। উজবেক জীবনে আমূল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য এটি। গত তিন বছরে ৭৫টি দেশ থেকে ৬২৯টি বিদেশী প্রতিনিধিদল আসে উজবেকিস্তানে। ১৯৫৮-তে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত হয় একটি আফ্রো-এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব, স্বাস্থ্য রক্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে এবং এশিয়া ও আফ্রিকা, এই দুটি মহাদেশের লেখকদের সব চেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সম্মেলন বসে, যে সম্মেলনের ফলে সৃষ্টি হয় 'তাসখন্দ মনোভাবের'। শান্তি ও আন্তর্জাতিক দোস্তির জন্য সংগ্রামশীল এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্ব ও সংহতির চিহ্ন হল এই মনোভাব।

দশদিন ব্যাপী উৎসবের সময়ে মস্কোবাসীরা সাধুবাদ দেয় 'বাহোর' উজবেক লোক নৃত্যের অনুষ্ঠানকে, লোক বাদ্যযন্ত্রের দলকে, সিমফনি অর্কেস্ট্রা, সঙ্গীত ও নৃত্যের দলকে, কয়েরকে, খরেজ্মের সঙ্গীত ও নৃত্যের দলকে আর সেই দলকে যার পরিচালক হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার জনশিল্পী তামারা খানুম, উজবেক স্টেট ভ্যারাইটি অর্কেস্ট্রাকে এবং কারা-কল্পাকিয়ার বেরদাখের নামে ফিলহারমোনিক সঙ্গীত ও নৃত্য দলকে। উৎসবে যোগ দিয়েছিল উজবেকিস্তানের চারটি প্রধান থিয়েটার: হম্জ আকাদমিক ড্রামা থিয়েটার, গোর্কি রুশী ড্রামা থিয়েটার, আলিশের নাভোই উজবেক স্টেট অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার এবং মিউজিক্যাল ড্রামা ও কমেডির মুকিমি উজবেক থিয়েটার।

তাসখন্দের চলচ্চিত্র-কর্মীরা মস্কোয় তাদের সেরা কাহিনীমূলক ছবিগুলি দেখান— 'ছেলেদের অগ্রগতি', 'তুমি আমাকে যাদু করেছিলে', 'অগ্নি বর্ষ', 'লেনিন পাঠিয়েছিলেন',

এবং ডকুমেণ্টারির মধ্যে 'মানুষের পাঁচ হাত', 'উজবেকিস্তান দেখে যান', 'শান্তি ও বন্ধুত্ব' ইত্যাদি।

উজবেকিস্তানে অনেক গুণী চিত্র শিল্পী। মস্কোয় উৎসবের সময়ে চারুকলা প্রদর্শনীতে অভ্যাগতেরা দেখেন উ. তানসিকবায়েভ, আ. আব্দুল্লায়েভ, ল. আবদুল্লায়েভ, ও. তাতে-ভোসিয়ান, ভ. উফিমৎসেভ, ভ. কাইদালভ, আ. ইভানভ, র. আহমেদভ, ইউ. ইয়েলিজারভ এবং অন্যান্য শিল্পীদের আঁকা ছবি।

চারুকলা প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য জিনিসের মধ্যে ছিল হাজার হাজার উজবেকীয় বিদরি কাজ।

উৎসবের সময়ে উজবেকীয় লেখকেরা প্রায় ৪০০টি নূতন রচনা পেশ করেন। শুধু ১৯৫৮-তেই উজবেকিস্তানে এক হাজারেরও বেশী বই দু'কোটির বেশী কপিতে ছাপা হয়।

নিজের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য উজবেকিস্তান ঋণী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণশক্তির কাছে, কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন সাহায্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা ভ্রাতৃজাতি, যাদের অগ্রণী হল মহান রুশী জনগণ, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তার কাছে।

১৩। চির্চিক

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি বড় রাজধানীতে সকালবেলা ট্রেনের হুইসিল শোনা যায়, দেখা যায় সহরতলীগামী ট্রেনগুলো শ্রমিকদের নিয়ে চলেছে। রাজধানীর পরিবারভুক্ত শ্রমশিল্প সহরগুলির দিকে বিভিন্ন রেললাইন প্রসারিত। রাজধানী তাসখন্দ বেশী দিনের নয়, তাই এর পরিবারভুক্ত শিল্প সহরের সংখ্যাও বেশী নয়। তবু এর চারপাশে চারটি নতুন শ্রমশিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে: চির্চিক, আন্‌গ্রেন, ইয়াঙ্গি য়ুল ও বেগাবাদ।

উজবেক রাজধানীর প্রথম শিল্পসহর চির্চিকের নাম রাখা হয়েছে সির দরিয়ার একটি উপনদীর নামে। তাসখন্দের প্রত্যেকটি আরিকে যদিও চির্চিকের জল শব্দ করে, আজকের তাসখন্দবাসী কিন্তু জানলার নীচে জলমর্মর শুনে এই নদীর কথা ভাবে না। কেবলমাত্র আলো জ্বাললেই এর কথা মনে হয়, কারণ তাসখন্দ চির্চিক বিজলীর সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমিকদের ট্রেনে চেপে তাসখন্দ থেকে চির্চিক যাত্রা করলে সহরতলীর ফলের বাগান ও তরমুজ খেতের উপর হাই-টেন্‌সন বৈদ্যুতিক তারের থামের জটলা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

উজবেকিস্তান জলবিদ্যুৎ শক্তিতে অসাধারণ সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানী ব. ভেদেনেয়েভ হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, সমস্ত নদীর শক্তি সম্পদকে যদি পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে উরাল ও ভলগা অঞ্চলের তুলনায় জনসংখ্যার মাথা পিছু তিনগুণ বেশী এবং উক্রেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের কেন্দ্রীয় ভাগের চাইতে আঠার গুণ বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি উজবেকিস্তান উৎপন্ন করতে পারবে। এক কোটি কিলোওয়াটেরও বেশী জলবিদ্যুৎ শক্তি উজবেকিস্তান উৎপন্ন করতে পারে। বিপ্লবের আগে এই সম্পদকে কোন কাজে লাগানো হয়নি। বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনে জার-শাসিত রাশিয়ার স্থান পৃথিবীতে ছিল পঞ্চদশতম এবং উজবেকিস্তানে মাথা পিছু বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল রাশিয়ার গড়পড়তা হিসাবের এক চৌদ্দাংশ।

পঁচিশ বছর আগেও চির্চিকের ওপর ভাগের উপত্যকায় নদী বরাবর দেখা যেত তুগাই বা ঝোপঝাড়ের সরু ফালি। তার মধ্যে বুনো শুয়র দেখাও বিচিত্র ছিল না। আশেপাশের অঞ্চল ছিল রোদে-পোড়া বন্ধুর স্তেপভূমি। সেখানে নজরে পড়ার মত একমাত্র ছিল গরিব মানুষের এক একটা নির্জন ইয়ুরত্‌ বা জলহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক ধরনের তাঁবু। এর সম্পর্কে লোকে বলত 'হাজারটা পাথর ছুঁড়ে ফেললে ওপরে থাকে না একখানাও, সবগুলিই হাজার ফুটো দিয়ে নীচে নেবে আসে।' আর একটা কথা থেকে বোঝা যেত এধরনের ইয়ুরতে থাকা কী ব্যাপার: 'ভিতরে দেখা যায় না কিছুই, উপরে তাকালে তারা আর নীচে তাকালে কালো মাটি।'

সোভিয়েত দেশের বিজলীকরণের জন্য লেনিনের যে বিখ্যাত GOELRO (গোয়েলরো) পরিকল্পনা তার মধ্যে ছিল উজবেকিস্তানে দুটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। চির্চিকে বজ্‌সু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নামে যেটি সবপ্রথম তৈরী হয় তার কাজ সুরু হয় ১৯২৬এ। এর পর প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য নদীতে আরও অনেক কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাধিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্নকারীদের মধ্যে উজবেকিস্তানের স্থান আজ চতুর্থ।

প্রজাতন্ত্রের সব চেয়ে প্রাচীন 'বৈদ্যুতিক নদী' হল চির্চিক। এই নদী থেকে বিভিন্ন দিকে চালিত খালগুলোর তীরে তেরটি শক্তিশালী স্বয়ংচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র ইতিমধ্যে

গড়ে উঠেছে। এই সংখ্যা কুড়িতে পেঁছবার কথা। তখন এটি হবে পৃথিবীর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বৃহত্তম কাস্‌কেড।

চির্চিক উপত্যকার ওপর দিয়ে লম্বা থামের সঙ্গে বাঁধা ট্রান্সমিশন লাইনগুলো আড়াআড়িভাবে চলে গেছে। দিনরাত ধরে এগুলি যে বিদ্যুৎশক্তি চালান দিচ্ছে তাতে কলকারখানা চালু হয়ে আছে, সহর ও কিশ্‌লাকগুলি আলো পাচ্ছে। তাদের মধ্যে অন্যতম নতুন সহর চির্চিক।

চির্চিকের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ যে বৈদ্যুতিক আলো দিচ্ছে তাতে রাত্রিবেলা সহরের আকাশ মাইলের পর মাইল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেখানে একদিন যাযাবররা তাদের তাঁবু গাড়ত সেখানে আজ সমাজতন্ত্রী সহরের রাস্তায় মাথা তুলেছে সারি সারি বাসভবন, বড় জানলাওয়ালা স্কুল, বাগান-বাড়ি, সংস্কৃতি প্রাসাদ, ক্লাবঘর আর ফলের বাগান — সবকিছুই কল্পনাতীত ত্বরিৎগতিতে। চির্চিকের নতুনত্ব তাসখন্দ কাপড়-কলের অঞ্চলের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এর চওড়া রাস্তা, ভোরের কুয়াসায় ঢাকা প্রশস্ত জাথ খাল, পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ভেসে-আসা সোমরাজের গন্ধ সহরকে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব কঠোর ও বীর্যবান পরিবেশ দান করেছে। এর বিশেষ চেহারার আরও কারণ হল লোহার কাঠামো যুক্ত কংক্রীটে ঢাকা খালগুলি, এর বিরাট চলমান ক্রেন এবং অগুনতি রেললাইন সাইডিং যার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে চির্চিক বিদ্যুৎ-কেমিক্যাল কারখানায়। এই বিরাট কারখানাটি তৈরী হয় তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী (১৯৩৭—৪২)।

কারখানাটি তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় চির্চিকের ইতিহাস। দ্নেপ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চাইতে দ্বিগুণ মাটি খুঁড়তে হয় প্রকান্ড এই পরিকল্পনার জন্য। সমগ্র উজবেকিস্তান এই কাজে মাথা ঘামায়, কারণ কারখানাটির তৈরী জিনিস তুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায়।

চির্চিক শ্রমিকেরা নিজেদের 'জমি নির্মাতা' বলে। এটা কোন রূপাত্মক কথা নয়। ওরা সত্যিই জমি তৈরীর কাজে লেগে আছে। বিদ্যুৎ কেমিক্যাল কারখানায় ওরা নাইট্রোজেন, অর্থাৎ তুলোর ক্ষেতের জন্য নাইট্রোজেন সার তৈরী করে। অবিরাম ধারায় রেল ট্রাকভর্তি সার যেতে থাকে কারখানা থেকে। কিন্তু কারখানার ফটক দিয়ে কেউ ট্রাকভর্তি কাঁচা মাল যেতে দেখেনি। এই প্রকান্ড কারখানার একমাত্র কাঁচা মাল হল চির্চিকের বরফ শীতল জল আর পাহাড়ের নীচেকার বিশুদ্ধ বাতাস। বিদ্যুতের সাহায্যে চির্চিক শ্রমিকেরা এ থেকেই নাইট্রোজেন সার বানায়।

উঁচু বাড়ির চতুষ্কোন সহরের পাড়া ছাড়াও চির্চিক বিদ্যুৎ-কেমিক্যাল কারখানার চার পাশে গড়ে উঠেছে নূতন বড় বড় যন্ত্র তৈরীর ও অন্যান্য কলকারখানার বাড়িগুলি। এক কথায় চির্চিক এখন একটি বড় শ্রমশিল্প সহর। দেশ বিজলীকরণ সম্পর্কে লেনিনের পরিকল্পনার প্রতিরূপে হিসেবে বিশেষ করে উজবেক প্রজাতন্ত্রে চির্চিকের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

১৪। উজবেকিস্তানের জ্বালানি

উজবেক্ রাজধানীর চারপাশে গড়ে-ওঠা নূতন সহর পরিবারবর্গে দ্বিতীয়টি হল আন্‌গ্রেন। ওখানে যেতে হলে তাসখন্দ থেকে শ্রমিকদের ট্রেনে চাপতে হয়। সহযাত্রীরা খনি শ্রমিক।

গাড়ি চলে শাখালাইন ধরে আন্‌গ্রেন উপত্যকায়। লাইনের ওপরে কয়লার গুঁড়ো, হাল্কা-সবুজ ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে কালো সাপের মত লাইনটা গিয়েছে। ডাইনে আর বাঁয়ে ঘন ঘন পাহাড় ও ছাড়াছাড়া বন্ধুর পর্বত দেখা দিতে থাকে। আর এক পাশে চাৎকাল ও আর এক পাশে কুরামা — এই দুই পর্বতমালার কালো-হয়ে-আসা স্তূপ ক্রমশ এগিয়ে আসে। হাজার হাজার বছর ধরে আন্‌গ্রেন নদী এই দুই পর্বতমালার মধ্য দিয়ে কেটে বেরিয়ে এদের আলাদা করেছে আর অবারিত করে গেছে কয়লা ও মাটির গভীরে লুকোনো অন্যান্য সম্পদ।

এমন সময় গেছে যখন এই অঞ্চলে ছিল লোহার খনি। আন্‌গ্রেন নামটি মধ্যযুগীয় 'দরিয়া-ইয়ে-আহনগেরান' কথাটির বিকৃতি, এর অর্থ লোহকর্মীর নদী। নামটির সঙ্গে একটি সুন্দর কাহিনী জড়ানো আছে।

'লোভ আর বিদ্বেষে উন্মাদ' সৈন্য সামন্ত নিয়ে ইস্‌কান্দার জুলকারনাইন, অর্থাৎ মাসিডোনিয়ার আলেকজান্দার যেসময় এগিয়ে আসছিলেন সে সময় ভাটির দিকে আহনগেরানে একটি সুন্দর দুর্গে বাস করত এক রাজকুমার, নাম তার হামরা। সবে মাত্র বিয়ে করেছে একটি পরমা সুন্দরীকে, 'তার চোখের ভ্রূ বীবরের লোমের মতো কালো', রাজকুমার তার প্রেমে এমন মশগুল যে 'কোন কথাতেই সে কর্ণপাত করত না'। বৃথাই দরবারের কবি তাকে উদ্দেশ্য করে এই আবেগময় পৌরুষের কথাগুলি বলেছিল, 'যখন স্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছে তরোয়াল থেকে, তখন কি প্রিয়তমার চোখের দ্যুতি উপভোগ করার সময়?' বিজ্ঞ কথায় কান দেয়নি হামরা।

তখন বোবো কামবার নামে এক বুড়ো লোহার কারিগর তার শিক্ষানবিশদের

জমায়েৎ করল। 'দারিদ্র্য ধ্বংস হোক, কারণ এতে আনে দ্বঃখ, কিন্তু প্রেম দারিদ্র্যের চাইতেও সর্বনাশা!' উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠে সে তার লোকজনকে নিয়ে গেল পাহাড়ে। সেখানে তারা গোপনে মাটির তলা দিয়ে নদীর একটি ন্তন রাস্তা বানাল। আহনগেরানের লোকেরা হঠাৎ দেখতে পেল নদীর জল শেষ বিন্দ্র পর্যন্ত শ্বকিয়ে গেছে। তারা সবাই তৃষ্ণায় ছটফট করে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তখন এল ইস্কান্দারের যোদ্ধারা কিন্তু আহনগেরানে জলের দ্বর্ভিক্ষ চলছে খঁবর পেয়ে তারা ওখানে এগ্বতে সাহস করল না, চলে গেল সেখান থেকে।

এই ভাবে লোহার কারিগররা তাদের দেশকে বাঁচাল আগ্বন আর ল্বঠের হাত থেকে। আক্রমণকারী চলে যেতে ওরা আবার নদীটিকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল।

এই সেই কাহিনী যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য মান্বষের স্বপ্ন। সোভিয়েত উজবেকিস্তানে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত লোকেরা নদীগ্বলোকে বশে এনেছে। উদাহরণস্বর্প আন্গ্রেনের কথাই ধরা যাক।

বেশী দিনের কথা নয়, আনগ্রেনের ভাটির অঞ্চলে সেচ জলের অভাব ছিল প্রচণ্ড। তখন সোভিয়েত সেচ ইঞ্জিনিয়াররা স্থির করল, খরস্রোতা চির্চিক থেকে খাল কেটে জল আনবে আনগ্রেনে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪১—৪৫ সালের দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সামান্য আগে খাল খোড়া হয় আর চির্চিকের সঙ্গে মিশে আনগ্রেনের জলধারা আক কুরগান জেলার মাঠের উপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে। এখানে শ্বধ্ব রঙীন ত্বলো বানানো হয়।

লোহার কারিগরদের কাহিনীতে স্বপ্নের মতো প্রতিফলিত হয়েছিল যে সম্ভাবনা তাকে যন্ত্রের সাহায্যে র্প দিল সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা আনগ্রেনের অন্যখানে, পাহাড়ের উপরে। আনগ্রেনের গিরিসঙ্কটের মধ্যে কয়লার একটি স্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পর শক্তিশালী যন্ত্রচালিত খনি তৈরী হয় এবং কাছেই একটি খনি সহর গড়ে উঠল। ভূতত্ত্ববিদ দ. বগ্দানভিচ ও জ. চেক্রিজভ এই সহরে থেকে আনগ্রেনের কয়লা সম্পর্কে অন্বসন্ধানের কাজ চালাতে থাকেন। তাঁরা আবিষ্কার করেন কয়লার স্তর অংশত রয়েছে নদীগর্ভে, অর্থাৎ নদী বয়ে চলেছে কয়লার উপর দিয়ে। ঠিক করা হয় নদীটিকে সরিয়ে দিয়ে মাটির উপর থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হবে।

সোভিয়েত মান্বষ আগেকার সেই লৌহকর্মীর নদীকে, বর্তমানে খনি শ্রমিকদের নদীকে অন্যদিক ঘ্বরিয়ে দিল একটি জলধারায়। সেখানে এটিকে কংক্রীটের শৈলশিলা ও পাথরের স্তর দিয়ে ঘিরে ফেলল। আর সেই সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্যে, যেখানে মাত্র

কিছুদিন আগেও আনগ্রেন ছিল গর্জমান ও ফেনায়িত, সেখানে দেখা দিল যন্ত্রচালিত কয়লা খাত। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয়।

কয়লা খাতের সর্বত্র এক্সকাভেটরের দণ্ড আকাশে মাথা তুলেছে। উরালে তৈরী UZTM মার্কা বৈদ্যুতিক এক্সকাভেটরের বিরাট কোদালগুলো খাতের গভীর পরিখার মধ্যে যাতায়াত করছে। টিপ-আপ ট্রাকে আনগ্রেনের কয়লা ভর্তি হচ্ছে। জায়গা বদলের জন্য ESH-1 জাতীয় ওয়াকিং এক্সকাভেটর তার ধাতব স্কিগুলোকে বার করে অনায়াসে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দিক থেকে আসা ঘর্ষণের আওয়াজ এত প্রচণ্ড যে, যে বিস্ফোরণের দ্বারা কয়লা আলগা করে ফেলা হচ্ছে তার শব্দও কদাচিৎ কানে আসে। কেবল কখনো এখানে, কখনো সেখানে উৎক্ষিপ্ত কয়লা গুঁড়োর কালো মেঘ দেখে বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি আঁচ করতে হয়। রেলগাড়ি ইঞ্জিনের কথা না বললে কয়লা খাতের বর্ণনা সম্পূর্ণ হবে না। ইঞ্জিনগুলি প্রায় অবিরাম গতিতে আসা যাওয়া করতে থাকে, কয়লা খনির পরিখায় খালি গাড়িগুলোকে নিয়ে আসে, পাথর বোঝাই ট্রাকগুলোকে টেনে নিয়ে যায়, কিংবা কয়লা-ভর্তি ভারী গাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যায় স্টেশনের প্রধান রেল লাইনে।

বেশী দূরে নয়, পাহাড়ের পটভূমিকায় স্তূপীকৃত হয়ে আছে আনগ্রেন খনির গুঁড়ো আর খুঁটি-পোঁতা যন্ত্র। ওখানে অবিরাম ধারায় 'কালো সোনাকে' উপরে তোলা হচ্ছে। খনি খনন এবং খাতের ভিতর থেকে খাতের মুখে কয়লা আনার কাজও করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। শক্তিশালী স্ক্রেপার কনভেয়র, বেল্ট কনভেয়র যন্ত্র ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিন একাজ করে। খাতের মধ্যে রেলট্রাকে করে অবিরাম খনন কাঠ সরবরাহ করা হয়।

পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখলে দৃশ্যটি অপূর্ব: কয়লার খাত ও খনিগুলি নীল নদীর বাঁ তীরে আর দক্ষিণ তীরে গাছের সারি দেওয়া সমাজতন্ত্রী সহরের পাড়া। নদীর উপর নানা স্থানে পুলের উপর দিয়ে লোকে নদী পার হয়। আনগ্রেন চির্চিকের চাইতে অনেক অল্প দিনের, কিন্তু এর জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক হাজারে পৌঁছেছে। সহরে আছে একটি থিয়েটার, দুটি সিনেমা, তিনটি ক্লাবঘর, গ্রন্থাগার, চারটি হাসপাতাল, ডজনখানেকের উপর স্কুল, স্ট্যাডিয়াম, কিণ্ডারগার্টেন, একটি বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্র এবং জল সরবরাহের আধুনিক ব্যবস্থা।

সহরটি দ্রুত বেড়ে চলেছে। কেবল সুন্দর বাড়িই নয়, একটি বড় সিমেণ্ট কারখানাও তৈরী হচ্ছে। এর অর্থ, শ্রমিকেরা ওখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছে। কিন্তু আনগ্রেনের

লোকরা সবচাইতে বেশী গর্ব বোধ করে প্রস্তাবিত গ্যাস কারখানায়। উজবেক রাজধানীতে যখন গ্যাসের লাইন যাবে তখন বিজলী আলোর সমার্থক চির্চিকের মতো গ্যাসচুল্লীর সমার্থক হবে আনগ্রেন তাসখন্দের গিন্নীদের কাছে।

১৫। নূতন পথ

উজবেক রাজধানীর তিন নম্বর সহর ইয়াঙ্গি য়ুল দেখতে হলে তাসখন্দ থেকে ট্রেন ধরা যায়, কিন্তু আরো ভাল হয় মোটরে করে গেলে, কারণ রাজপথ যে কেবল সহরের মাঝখান দিয়ে ওখানে চলে গেছে তাই নয়, আক্ষরিক ও রূপক অর্থে এটা 'ইয়াঙ্গি য়ুল' (নূতন পথ), অর্থাৎ যে পথ ধরে সংস্কৃতি এসেছে উজবেক কিশলাকের দিকে।

বেশী দিনের কথা নয়, তাসখন্দ মরূদ্যানের মাঝখানে অবস্থিত ইয়াঙ্গি য়ুল ছিল একটি সাধারণ কিশলাক। ফুটির জন্য এর খ্যাতি ছিল। এর আগের নাম হল কাউন্চি বা 'ফুটির দেশ'।

মোটরে করে ইয়াঙ্গি য়ুল যাবার পথে নজরে পড়বে অন্যান্য উজবেক মরূদ্যানের মতো রাজপথের দুধারে মাটির দেওয়াল-ঢাকা ফল, আঙুর বাগান আর তরমুজের ক্ষেত। কিন্তু প্রায়ই চোখ পড়বে তুলো ক্ষেতের উপর। শরতে মনে হয় মাঠের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা পাখি বসে আছে। এটি হল প্রজাতন্ত্রের অগ্রণী তুলো উৎপাদন অঞ্চল।

ইয়াঙ্গি য়ুলের মাঠে নূতন ধরনের তুলো বানানো হয়েছে। দেখা যাবে পথের দুপাশে বহু যন্ত্রপাতি কাজ করছে। এগুলিও সর্বাধুনিক কায়দার। চওড়া আরিকের পাশে তৈরী যৌথখামার বিদ্যুৎ স্টেশন, বড় ও ছোট স্লুইস দরজা পেরিয়ে গাড়ি চলবে। আগে কিন্তু মধ্য এশিয়ায় কোন স্লুইস (জল যাওয়া আসা নিয়ন্ত্রণ করার দরজা) ছিল না। উজবেক দেখানদের জীবনে এ সব হল তাদের ইয়াঙ্গি য়ুল বা নূতন পথ।

ইয়াঙ্গি য়ুলের তুলোবীজজাত তেল কলের দিকে এগুতে থাকলে চোখে পড়ে টেলিগ্রাফের তারে তুলোর ফেঁসুয়া জড়ান। চালু যন্ত্র থেকে বাতাসে এগুলি উড়ে এসেছে। গ্রাম্য রাস্তায় কিন্তু এক টুকরো তুলোও নজরে পড়ে না। রাস্তা বরাবর টেলিগ্রাফের থাম আর কোন কোন বাড়ি দেয়ালের উপর বিশেষ ধরনের বাক্স লাগানো। সামান্য একটু তুলো নজরে পড়লেও তা কুড়িয়ে এই বাক্সে রেখে দেওয়া নিজের কর্তব্য হিসেবে পথিক মনে করে। জনগণের সম্পদের প্রতি যত্নের ও মিতব্যয়িতার এই মনোভাবও উজবেক দেখানদের জীবনে ইয়াঙ্গি য়ুল।

ইয়াঙ্গি য়ুলের একটি নিজস্ব পরিবেশ আছে। এখানে শিল্প কেন্দ্রের বড় বড় বাড়িগুলোর পাশেই ছোট্ট মাটির দেয়াল-ঘেরা দেখানদের উঠোন। আধুনিক রেস্তোরাঁর টেবিলের পাশে নজরে পড়বে চাখানার রঙীন নক্সা করা পালাস ও কার্পেট।

সহরটি সংস্কৃতির কেন্দ্রও বটে, প্রতিভাবান তরুণ তরুণী সমগ্র প্রজাতন্ত্র থেকে আসে যৌথখামারীদের সঙ্গীত স্কুলে ভর্তি হতে। রাস্তায় শোনা যায় সব উজবেক মরূদ্যানের গান। ইয়াঙ্গি য়ুলের প্রধান রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি থিয়েটার ও 'ভিক্‌ট্রি' সিনেমা। আয়তন, আরাম ও সৌন্দর্যের দিক থেকে সিনেমাটির সমকক্ষ একটিও নেই মধ্য এশিয়ায়, এমন কি তাসখন্দেও না। সন্ধ্যায় এখানে দেখা যাবে সিনেমাঘরের কাছে থামের সঙ্গে জিন পরান ঘোড়া বাঁধা, মোটর সাইকেল আর সারি সারি মোটরগাড়ি ও লরি। জেলার নানা জায়গা থেকে যৌথখামারীরা এসেছে নূতন ছবি দেখতে।

ইয়াঙ্গি য়ুল জেলা লক্ষপতি যৌথখামার ও নূতন কিশলাকে ভর্তি। এখানে কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রচালিত করা হয়েছে।

'স্তালিনচি' ইয়াঙ্গি য়ুল জেলার একটি যৌথখামার। এখানকার গ্রাম ছিল একসময় চার পাহাড়ের মাঝখানে আর তাই এর নাম ছিল তুর্‌ত তেপে, অর্থাৎ চার পাহাড়। বৃদ্ধেরা বলেন গ্রামের দুর্দশা যে কোন পাহাড় থেকে দিব্যি নজরে পড়ত। কিশলাক ছিল খাটো, আধা ধসে-পড়া মাটির কুটিরে ভর্তি। এই জেলার অপর কিশলাক ও কাউন্‌চিরও (ইয়াঙ্গি য়ুল) ছিল একই দশা।

'বির্‌লাশু' যৌথখামার এখন যে গ্রামে, পনেরো বছর আগে তার দশাও ছিল ঐ রকম। সে সময় এক শরতে দুটি লোক আসেন এখানে। এদের একজন উজবেকিস্তানের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ইউলদাশ আখুনবাবায়েভ, আর একজনের নাম কেউ তখন জানত না। যৌথখামারের সভাপতি আর দলপতিকে সঙ্গে নিয়ে এই লোক দুটি দুর্বল ছোট তুলোর গাছে ঢাকা এবড়োখেবড়ো মাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'শোন, হামরাকুল,' তাঁর সঙ্গীকে বললেন আখুনবাবায়েভ, 'বির্‌লাশু যৌথখামার এই জমি থেকে প্রতি একরে মাত্র ৫৩৫ পাউন্ড তুলো পাচ্ছে। আমাদের এই বন্ধু বলেন,' আখুনবাবায়েভ মাথা নেড়ে সভাপতিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই জমিতে শুধু ভেড়া চরানো চলে আর জ্বালানীর জন্য আগাছা আর উট কাঁটা তোলা চলে।'

'জমিকে দোষ দেওয়া চলে না,' বললেন হামরাকুল, 'জমির যত্ন চাই।'

'আমারও তাই মনে হয়,' একটু হেসে বললেন আখুনবাবায়েভ, 'এখানকার চাখানা

নোংরা আর খামারের ঘোড়াশালাটি ধসে পড়ছে, এজন্যে সভাপতিমশাই চাখানা ও ঘোড়াশালাটির দোষ ধরবেন নাকি।'

সেই দিনই আখুনবাবায়েভের মাথায় ঢুকল যে একশত ফেরঘানা পরিবারকে বির্‌লাশ্‌ যৌথখামারের পাশে পতিত জমিতে বসাবেন। তিনি তাসখন্দ মরূদ্যানের লোকদের দেখাতে চান যে এখানকার জমিতেও ফেরঘানার মত প্রচুর তুলো হতে পারে। ফেরঘানার লোকেরা এই ডাকে সাড়া দিল। এই ভাবে যে নূতন যৌথখামার গড়ে উঠল তার সভাপতি হলেন আখুনবাবায়েভের সঙ্গী হামরাকুল তুরসুনকুলভ। ইনিও ওঁর সঙ্গে গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এই খামারটিকে গড়ে তোলেন তুরসুনকুলভ এবং এটি শুধু এই মরূদ্যানেরই শ্রেষ্ঠ তুলো উৎপাদক নয়, সমস্ত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সেরা হয়ে দাঁড়ায়।

এই যৌথখামার যে সব পরিবর্তন এনেছে তা বুঝতে হলে প্রতিবারই একজন নূতন গাইড নিয়ে কয়েক বার খামারটি দেখা প্রয়োজন।

গাইড হিসেবে, যিনি 'মেহনাত রাহাত' (শান্তিপূর্ণ শ্রম), অর্থাৎ যৌথখামারের নূতন সমাজতন্ত্রী বসতির নক্সা করেন, সেই স্থপতি আ. বাবাখানভকে সঙ্গে নেওয়া ভাল। ইনি এমন করে প্রতিটি বাড়ি দেখাতে পারবেন যা আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়। সবকিছুরই সুবিধে আছে এখানে। নূতন বাগান বাড়ি ও সরকারী ভবন থেকে শুরু করে ডাক্তারখানা ও স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা, এর সবকিছুই তৈরী হয়েছে সুদৃঢ় সুবিধেজনক ও শোভন করে। কিন্তু স্থপতি আপনাকে বলবেন, এ হল সুরু মাত্র, আরো সুন্দর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের, জানাবেন অপর দুই স্থপতি, দলগভ ও জাহাঙ্গীরভের নক্সা অনুযায়ী অন্যান্য গঠন কাজের কথা।

তুলো উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ এমন কোন বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে নিয়ে যৌথখামার দেখাও একটি ভাল প্রস্তাব। ধরা যাক সের্গেই স্তেপানভিচ কানাশের কথা। ইনি একজন বিখ্যাত চারা উৎপাদক। তিনি দেখাবেন, মাঠের প্রতিটি অংশের আছে নিজস্ব জীবনধারা ও বৈশিষ্ট্য। একটি আর একটি থেকে আলাদা।

সন্ধ্যায় যাওয়া যাক কানাশের সঙ্গে যৌথখামার পরিষদের অফিসে। এখানে তিনি এবং তুরসুনকুলভ সারাদিনের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবেন। তুরসুনকুলভ তুলো উৎপাদনে পাকা ওস্তাদ। ইনি যৌথখামারের এমন এক সভাপতি যাঁকে তাঁর অধীনস্থ সমগ্র যৌথখামারের জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদনের জন্য দু দু'বার সমাজতন্ত্রী শ্রমবীর উপাধি দেওয়া হয়েছে। কানাশের মত জনগণ তাঁকেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে মনোনীত করেছে।

পরদেশ ছারখারকারী নৃশংস তৈমুরলঙ্গ নিজের বুদ্ধির বড়াই করে এই কথা বলতে ভালবাসত, 'যে শাসকের ত্রাস তার চাবুকের চেয়ে কম, সে নেতা হবার যোগ্য নয়।' চাবুকের গুণগান করে তৈমুরলঙ্গ। তৈমুরলঙ্গ, সামন্ত আর জার অফিসারীদের উদ্যত চাবুকে শত শত বছর ধরে জর্জরিত হয়েছে উজবেক দেখান, কারিগর ও লোক গায়ক। তারপর ঘটল সব চেয়ে মহান বিপ্লব: রুশ বিপ্লবী শ্রমিকরা জারের হাত থেকে চাবুক ছিনিয়ে নিল, সেই 'জাতিসমূহের কারাগার' রুশ সাম্রাজ্য নিপাতে গেল। এক সময় তৈমুরলঙ্গের রাজধানী সমরকন্দের কাছে একটি গ্রামে লোকেরা এই কথা দিয়ে একটি গান বানাল: 'লেনিন বলেছেন, তোমরা যে কোন গান গাইতে পার। আর সব গাইয়েরা সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের গান গাইল।' যে লেনিন ও কমিউনিস্টরা তাদের চিরদিনের মত স্বাধীন হতে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে কথাটিতে। মেহনতী জনতা দেশ শাসন সুরু করল। তুরসুনকুলভ এদেরই একজন।

যৌথখামার অফিসে যে তালিকা টাঙানো আছে তার থেকে কয়েকটি তথ্য নিলে এই বিরাট যৌথখামারের জীবন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এগারটি জাতির লোকেরা পাশাপাশি এই খামারে কাজ করে। ৪৩ রকমের পেশার ২৫০ জন বিশেষজ্ঞ আছে এখানে। বহু যৌথখামারীর মোটর গাড়ি আছে। যৌথখামারের মোট আয় ২ কোটি রুবল ছাড়িয়ে যায়।

এই যৌথখামারকে অনুসরণ করে জেলার অন্যান্য যৌথখামারগুলিও ইয়াঙ্গি য়ুল বা নূতন পথ নেয়। 'স্তালিনচি', ভরশিলভ যৌথখামার কিংবা ইয়াঙ্গি য়ুল জেলার অন্য কোনো যৌথখামারে যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, ছোট বড় প্রত্যেকটি জিনিসে কমিউনিজমের চেহারা চোখে পড়বে।

১৬। শ্রমশিল্প গ্রামাঞ্চলের স্রষ্টা

উজবেক দেখানদের জীবনে ইয়াঙ্গি য়ুলের অংশ হিসেবে আছে এই জেলার আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান। সমগ্র সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় এদের খ্যাতি। এরা দেখানদের জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু এদের নামোল্লেখের আগে অন্য কিছু বলতে চাই।

১৯৩৯ সালে মস্কোতে নিখিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি প্রদর্শনীর উজবেক মন্ডপে একটি সাধারণ কেতমেন দেখান হয়। কী কারণে একটা সেকেলে নিড়ানির উপর এত লোকের চোখ পড়ল ? মস্কো ও জাপরজিয়ে, স্তাভ্রপল ও দূর প্রাচ্যের দর্শকরা কেন এর চারপাশে ভীড়

করে? কারণ এই কেতমেনের সাহায্যে উজবেকরা সম্প্রতি একটি চমকপ্রদ কান্ড করে: ছ'সপ্তাহে তারা বিরাট ফেরঘানা খালটি (১৬০ মাইল লম্বা) শেষ করেছে। যে লোকটি প্রদর্শনীতে কেতমেন ব্যবহারের প্রক্রিয়া দেখাচ্ছিলেন তিনি হলেন দুনান দুস্মাতভ, খাল তৈরীর কাজে একজন বিখ্যাত কেতমেন ওস্তাদ। চার হাজার বছর ধরে এই যন্ত্রটির অস্তিত্ব, এর ব্যবহার যখন লোপ পেতে বসেছে ঠিক সেই সময় এইভাবে এর চরম খ্যাতি রটল।

উজবেকিস্তান মরূদ্যানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেখানদের প্রধান সর্বগ্রাহ্য কৃষিযন্ত্র ছিল এই কেতমেন। বড় খাল ও ছোট ছোট সেচ নালী খুঁড়বার জন্য, আরিকে খাল কেটে জল নেওয়ার জন্য ও মাঠ ও বাগান চাষের কাজে এটিকে ওরা ব্যবহার করত। তুলো ক্ষেতের জন্য বিশেষ ধরনের কোন যন্ত্র ছিল না।

রুশ যৌথচাষী যারা শস্য, ফল ও তরিতরকারী বানায় এবং কোনদিনও তুলোর ক্ষেত চোখে দেখেনি তাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন উজবেক দেখানদের কতখানি পরিশ্রম করতে হত। সম্বৎসর দেখানদের কাটাতে হত তুলো ক্ষেতের দাস হিসেবে। কিছুদিন আগেও কর্ষিত ভূমির প্রতি একরে কৃষকরা কতটা খাটে এ ব্যাপারে পৃথিবীর মধ্যে ফেরঘানা উপত্যকা ও ইতালীর কোন কোন অঞ্চলের স্থান ছিল প্রথম। কেতমেনের হাতল যদিও খুবই লম্বা এবং উজবেকীয় উষ্ণ আবহাওয়ার পক্ষে খুবই সুবিধেজনক (কারণ পিঠ না বাঁকিয়ে এর সাহায্যে কাজ করা যায়, ফলে মাথায় রক্ত চড়ে না) তবু এই লম্বা হাতলের প্রতি বর্গ ইঞ্চি প্রচুর ঘামে ভিজেছে।

অবস্থা সত্যি অসহনীয় শক্তিক্ষয়ী দৈহিক শ্রমের হাত থেকে দেখানদের মুক্তি দেওয়া ও কার্য প্রক্রিয়াকে যন্ত্রচালিত করার প্রয়োজন ছিল।

সোভিয়েত জনগণ তুলো উৎপাদন যন্ত্রীকরণ সমস্যাকে ব্যাপক বল্শেভিক আকারে সমাধান করতে লাগল। সুরু হল আবিষ্কার ও গঠনের কাজ। ইয়াঙ্গি য়ুলে দেখা যাবে এই গঠনমূলক কাজের সৃজনশীল কেন্দ্রটিকে। এটি হল তুলো উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইন্স্টিটিউটের যন্ত্রীকরণের কেন্দ্রীয় স্টেশন। এখানে তৈরী করার আগে তুলো ক্ষেতের যন্ত্রগুলিকে পরীক্ষা ও সুসম্পূর্ণ করা হয়। বহু ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে এখানে। এদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলি উজবেক তুলো শ্রমিকদের জীবনে প্রকৃত বিপ্লব এনেছে। এই সব যন্ত্র ছাড়া কোন উজবেক কিশলাককে এখন কল্পনা করাও কঠিন।

উজবেকিস্তানের যে সব জায়গায় যন্ত্রকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগান হয়েছে সেখানে আজ তুলো অঞ্চলের প্রতি ২,৫০০ একর জমিতে পঁয়ত্রিশ ধরনের গড়পড়তা ২৪০ টি যন্ত্র চালু। প্রতি ২,৫০০ একর তুলো জমিতে কেবল মাত্র ট্র্যাক্টরের সংখ্যাই হল চৌদ্দটি।

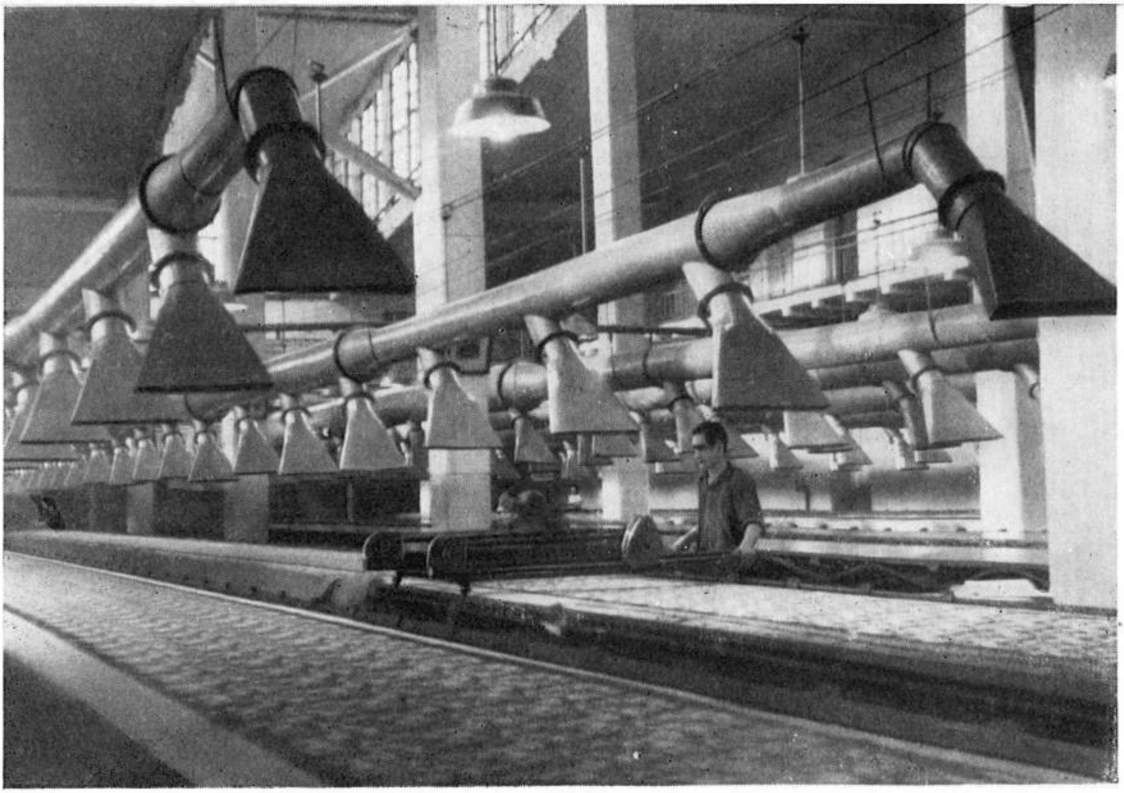
কিন্তু উজবেক জনগণের ভাগ্যে এই যন্ত্রগুলির প্রচণ্ড গুরুত্ব সম্যক বুঝতে হলে কেবল যন্ত্রীকরণের স্টেশন দেখাই যথেষ্ট নয়। ঐ সঙ্গে দেখতে হবে আরও একটি প্রতিষ্ঠান। এটি হল দ্বিতীয় ইয়াঙ্গি য়ুলের এম. টি. এস. (মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশন)। এটি একটি মূল কেন্দ্র এবং আদর্শ স্টেশন। অন্যান্য উজবেক মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশন এর পন্থা কাজে লাগায়।

দ্বিতীয় মেশিন ট্র্যাক্টর স্টেশনে পৌঁছে ডাইরেক্টরকে বলতে হবে দলপতি ইক্রাম ইব্রাগিমভকে কিংবা ওঁরই দলের বিখ্যাত ট্র্যাক্টর চালক রহমত নিশানবায়েভকে বেতারযোগে খবর দিতে। এটা করা খুবই সহজ, কারণ উজবেক প্রজাতন্ত্রের মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলিতে বেতারযন্ত্রের সাহায্যে শ্রমিকদের দলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখা হয়।

মাঠে দেখা যাবে যন্ত্র দিয়ে যৌথখামারের কাজ চলেছে। বাৎসরিক কাজের তালিকা দেখলে একটি ব্যাপারে অবাক হতে হবে (যদি আপনি দূর দেশ থেকে আসেন)।

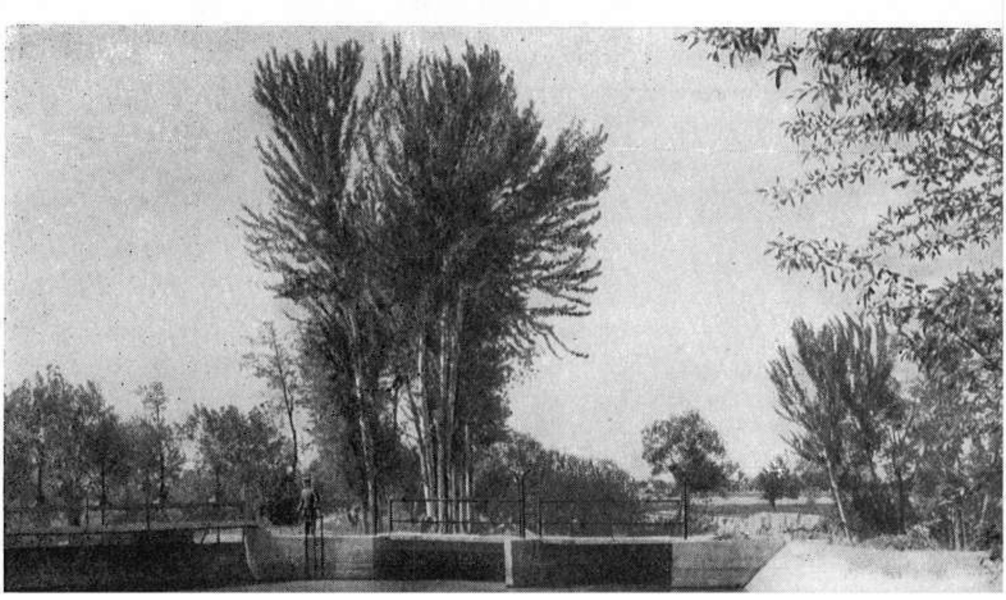
রুশ ফেডারেশনের যে কোন মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনের ট্র্যাক্টর ও কম্বাইন চালকদের ফসলের মাঠে পাঁচটি প্রধান কাজ করতে হয়। শরৎকালে এরা জমি চাষ করে, বসন্তে মই লাগায়, সার দেয়, বীজ বোনে ও ফসল কাটে। তুলোর ক্ষেতে, অবশ্য, এর তুলনায় অনেক বেশী কাজ করতে হয়। আমি এখানে শুধু প্রধান প্রধান কয়েকটি কাজের কথা বলব।

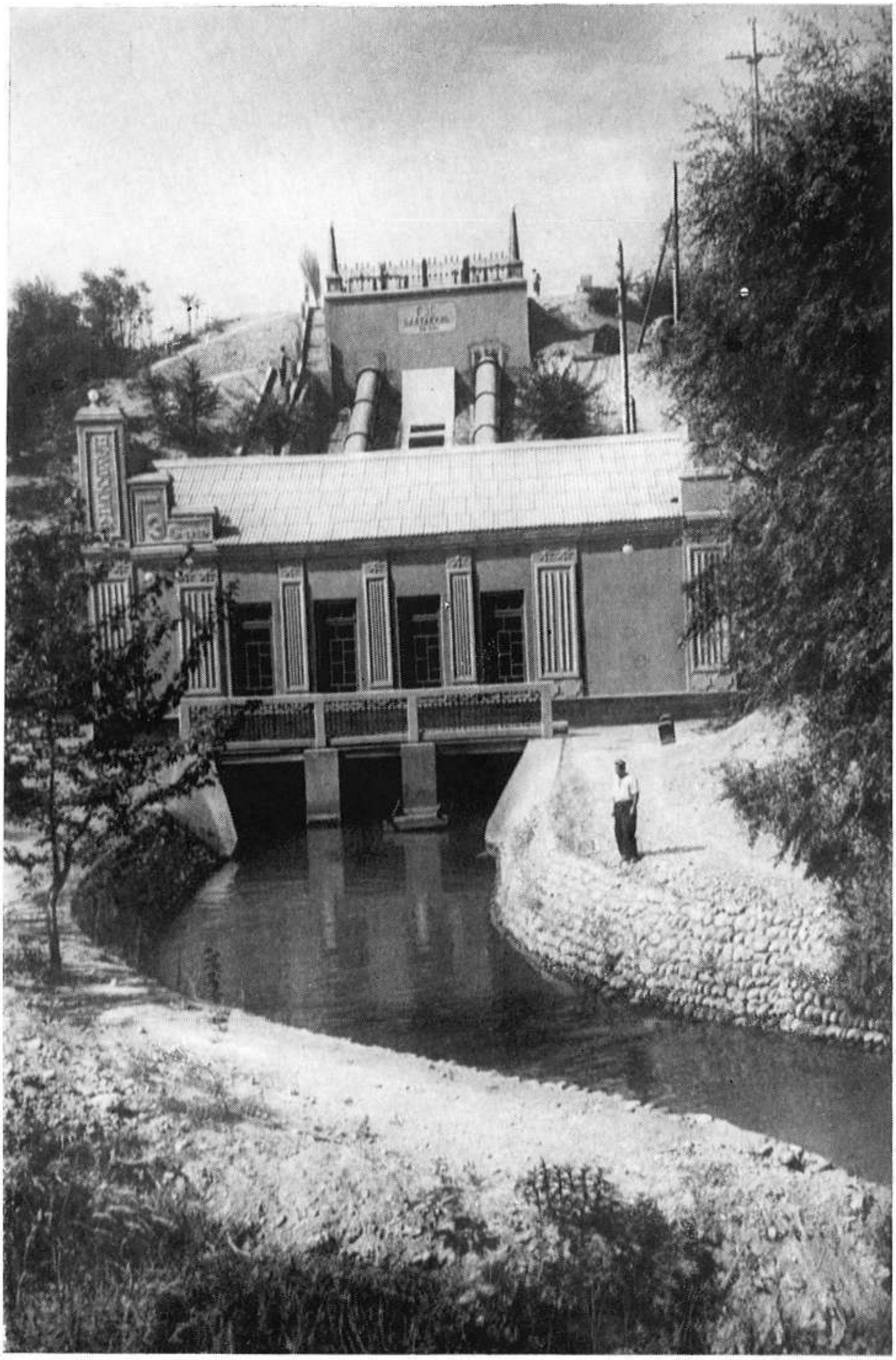
আরম্ভটা একই রকমের, অর্থাৎ শরৎকালে ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চষা। তারপর মাঠে এসে হাজির হয় এক্সকাভেটর সাকসন-ড্রেজ। বৃহৎ সেচ নালীর মেরামত ও পাঁক পরিষ্কার করে ওরা। জমি ধোবার জন্য যৌথখামারীরা এই কাজটিকে মাটিতে শীতকালীন জল দেওয়ার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে করে থাকে। ক্ষার মৃত্তিকা হলে চারবার পর্যন্ত এই কাজ করা হয়। এর পর যান্ত্রিক বিদে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাক্টর চালকরা সার যন্ত্রের সাহায্যে মাটির সঙ্গে কৃত্রিম সার মিশিয়ে দেয়। খোদাই যন্ত্র তারপর জল নালী কেটে দেয়। এর পরেই আসে তুলোর বীজ বোনার যন্ত্র। পরে যখন তুলোর চারা দেখা দেয় ট্র্যাক্টর চালিত যন্ত্রে বাড়তি চারাগুলোকে ছেঁটে দেওয়া হয়। এর পর ট্র্যাক্টর চালকরা বিদে যন্ত্র মাঠের মধ্যে টেনে আনে—প্রতিটি তুলো গাছের 'প্রতিপালন' সুরু হয়। তারপর 'শস্য পরিপুষ্টির কালে' বিশেষ যন্ত্র মাটির গোড়া আলগা করে দেয়। গরমের সময় প্রতিমাঠে ছ' থেকে আটবার করে এই কাজ করা হয় এবং একই যন্ত্রের সঙ্গে লাগান উপকলের সাহায্যে তুলোগাছগুলোকে অতিরিক্ত সার যোগান দেওয়া হয়। একই সময়ে যৌথখামারীরা তিন থেকে সাত বার করে সেচ জল দিয়ে থাকে। শীর্ষাঙ্কুর ও শাখাঙ্কুর কাটার কাজও করে ওরা। কিন্তু এ কাজও



মারগেলান রেশম কারখানায় ছাপ দেবার ডিপার্টমেণ্টের একটি দৃশ্য।

উজবেকিস্তান সেচ ব্যবস্থার একটি অংশ।





বালতাকুল আন্তর্যৌথখামারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

শীগ্‌গিরই যন্ত্রের সাহায্যে করা হবে কারণ গাছ ঢাকার যন্ত্র ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করা হয়েছে। বর্তমানে এটা পরীক্ষাধীন। শেষ পর্যন্ত ফসল পাকতে সুরু করে। যন্ত্র দিয়ে তুলো কাটা শুরু হওয়ার আগে ছিটাই-যন্ত্র গাছের পাতা ঝরিয়ে দেবার জন্য এক বিশেষ ধরনের তরল জিনিস ওদের উপর ছড়িয়ে দেয়। এর পরে শুরু হয় কাটাই যন্ত্রের কাজ। এগুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে তুলোগুলো ঢুকতে থাকে বিরাট জালার ভেতর। কাটাইয়ের কাজ শেষ হলেও মাঠে পড়ে থাকে কুরাক বা না খোলা তুলোর শুঁটি। কুরাক-কাটা যন্ত্র এদের কেটে ফেলে। শেষটায় গাছের গোড়া উপড়ানো যন্ত্র গুজাপায়া বা তুলো গাছের ডাঁটাগুলোকে মাঠ থেকে সরিয়ে নেয়।

ত্রিশ বছর আগে এ সমস্ত কাজ করা হত হাতে। এ ছাড়া উজবেক দেখানরা ধান আর রেশমগুটির চাষ, আঙুর, নানা রকমের ফল, তরিতরকারী ও তরমুজের আবাদ করত। পশু আর মুরগী পালত তারা। চাষ আবাদের এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ বিচিত্র যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা ব্যবহৃত হচ্ছে। এর পরিচালক সেই আগেকার দেখানরা, যারা আজ হয়েছে ট্র্যাক্‌টর চালক, ফিটার মিস্ত্রী, মেকানিক, এরা সবাই নূতন সমাজতন্ত্রী গ্রামাঞ্চলের মানুষ।

কৃষি কাজের এই সর্বাঙ্গীন যন্ত্রীকরণ উজবেকদের মুক্তি এনে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দিয়েছে অনেক বেশী অবসর, সম্ভব করেছে উজবেক প্রজাতন্ত্রকে এক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করতে। একদিকে ফসল বেড়েছে, আর একদিকে ২,৫০০,০০০ একরেরও বেশী নূতন জমিতে সেচ আর চাষের সুযোগ এসেছে। এর ফলে উজবেকরা অনেক বেশী অনুর্বর জমিকে শস্যশালী মরূদ্যানে পরিণত করতে পেরেছে।

১৭। জলের কথা আরো কিছু

ইয়াঙ্গি য়ুল থেকে ট্রেন চলে দক্ষিণে। সির দরিয়ার পুল পেরিয়ে ছাড়িয়ে যায় দ্রেভ্‌স্কায়া স্টেশন। সরকারী গোপ্রজননশালা ও দুধের কারখানার জন্য এর নাম। এরই এক গোশালায় পূর্ব ফ্রিজিয়ার গাভীর সঙ্গে ভারতীয় জাত ষাঁড়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নূতন ধরনের গরু সৃষ্টির চমকপ্রদ পরীক্ষা চলেছে।

পিছনে পড়ে থাকে দ্রেভ্‌স্কায়া। আর কয়েকটা স্টেশন আর ক্ষুদে মরূদ্যান পেরুলে গাছ-গাছড়া আর নজরে পড়ে না। ট্রেন ঢোকে ক্ষুধিত স্তেপ অঞ্চলে।

বসন্তের প্রথম দিকে, বরফ গলার কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষুধিত স্তেপের সবটা ভরে যায় প্রচুর ঘাসে, ছত্রপুষ্পী গাছে, টিউলিপ ও অন্যান্য ফুলে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসতে

থাকে। কচ্ছপরা বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে। কাজাখ রাখালরা গরু চরায়। প্রান্তর মুখরিত হয় তাদের গানে আর চাবুকের শব্দে। কিন্তু মে মাসের শেষাশেষি রঙ মিলিয়ে যেতে থাকে। ঘাস শুকোয়, পাখিরা উড়ে পালায়, কচ্ছপরা গর্তে ঢোকে আর রাখালরা তাদের গরু নিয়ে চলে যায়। তখন প্রাণহীন ও নিঃসঙ্গ ক্ষুধিত স্তেপের নাম সার্থক হয়। এর কাদা-ভর্তি, রোদে-ফাটা মাটিতে দেখতে পাওয়া যায় কেবল জানোয়ারের হাড় আর বাতাসে বিক্ষিপ্ত গাছের শুকনো ডাঁটা — দূর থেকে দেখায় হাড়ের মত।

সেই উর্বর, অথচ শুকনো স্তেপের দিকে চাইলে উজবেকিস্তানের পক্ষে জল যে কী জিনিস তা বিশেষভাবে মালুম হয়।

একমাত্র মধ্য এশিয়াতেই এ জাতীয় প্রবাদ সম্ভব, 'না কে'দে যদি থাকতে নাই পার, চোখের জলটা অন্তত ধরে রাখ।' প্রতিটি বিন্দু জলের এতই দাম সেখানে। মরূদ্যানের জল বুঝেশুনে খরচ করার জন্য সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আরিক আক্‌সাকাল ও মিরাব লাগান হত।

মনে পড়ে মিরাব মুহিদ্দীনভের কথা। আমার কৈশোরের একজন গুরু ছিলেন তিনি। সততার সঙ্গে জল বাঁটার জন্য এত সুনাম হয়েছিল তাঁর যে লোকে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েও ওর সঙ্গে পরামর্শ করত। তিনি অক্লান্তভাবে আমাদের ঔচিত্যবোধের প্রাচ্যনীতি শেখাতেন, যার মধ্যে জলের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের গুরুত্ব কম ছিল না। উজবেকিস্তানে ফুঁ দিয়ে চা ঠান্ডা করা কিংবা পেয়ালার কানা অবধি চা ভরা অভদ্রতা ও অতিথিকে অসৌজন্য দেখানো একথা আমি ভুলিনি। আমাদের কাছে সেই জল সম্পর্কে নীতিবাক্য বলে মুহিদ্দীনভ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেন: 'এক ফোঁটা জল একটি দামী হীরের সমান।' গভীর তাৎপর্য আছে কথাটায় তিনি মনে করতেন। তাঁর আর একটি উক্তি: 'এক হৃদয় আর এক হৃদয়কে জল দেয়,' বিশেষভাবে আমার মনে দাগ কেটে আছে। জীবনে যা সবচাইতে পবিত্র সেই বন্ধুত্ব ও প্রেমের সঙ্গে তিনি জলের তুলনা দিতেন। আমাদের মত ছেলেছোকরাদের কাছে তিনি ছিলেন সবচাইতে খাঁটি লোক।

কিন্তু এখন পার হয়ে গেছে বহু বছর। যৌবনের রোমান্টিক ধারণার বদলে এসেছে জীবনের বাস্তব জ্ঞান। মুহিদ্দীনভও মারা গেছেন বহুকাল। স্বীকার করছি আমার মনে এই সন্দেহ জাগে যে ওঁকে যতটা সৎ মনে হত সত্যিই উনি ততটা সৎ ছিলেন কি না। সম্ভবত তাঁর ন্যায় ভাবটি ঠেলায় পড়া, কারণ তাঁর জমি ছিল সেচ নালীর শেষ প্রান্তে। এ জন্য সব শেষে তাঁর জল পাওয়ার কথা। কাউকে একটু বেশী জল দিতে হলে তাঁর তরকারীর বাগান আর আঙুরক্ষেত যেত শুকিয়ে। যার জমি থাকত আরিকের শেষ প্রান্তে তাকে

মিরাবের পদ দেওয়া ছিল উজবেকিস্তানের রেওয়াজ। এই ভাবে জল দিয়েই লোকে জলের ভাগাভাগিতে দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা করত।

কখনো কখনো জলকে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে একবার যখন চীন সম্রাটের সৈন্যরা তাওয়ানের (ফেরঘানা) উপর চড়াও হয় তাদের সঙ্গে ছিল জলের মোড় ঘোরানোর বিশেষ এক দল। তাওয়ানের রাজধানী কুয়েইশান (প্রাচীন কোকন্দ) অবরোধের পর, চীনারা উক্ত সহরের জল অন্য দিকে চালাল, ফলে ওখানকার লোকদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না। এই ভাবে কেতমেন কখনো কখনো তরোয়াল বা বর্শার চাইতে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর অস্ত্র হয়ে দাঁড়াত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মধ্য এশিয়ার জল দখল, জল বিক্রি ও জল চুরি হয়েছে। এর জন্য লড়াইও হয়েছে যদিও শারিয়তের মতে এ হল ঈশ্বরের দান, কেউ যাকে দখল করতে পারে না। কিন্তু এরকম দেখা গেছে যে কালিম বা যৌতুক হিসেবে জল দেওয়া হচ্ছে, মিরাবরা অতিরিক্ত কুসীদ নিয়ে জল ধার দিচ্ছে। এই জলের জন্য লড়াই করে তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্র উজবেক মরূদ্যানের সমাজতন্ত্রী পুনর্গঠনের কাজ শুরু করল।

১৯২৯ সালের কথা। একদিন আমি তাসখন্দের একটি পুরোনো কবরখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। চোখ পড়ল একখানা সমাধিশিলার উপর। এটা দেখতে অন্যগুলোরই মত, প্রভেদের মধ্যে এই যে এটিকে বেশ নতুন মনে হল। যে পোড়া ইঁটে ওটা তৈরী রোদ জলে তার কোন ক্ষতি হয়নি। আর অন্য সমাধিপাথরের মত এর উপরও আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি দেখতে পেলাম। কিন্তু এই লিপিও অসাধারণ। রক্ত, মৃত্যু আর সাম্প্রতিক ঘটনার নিশ্বাসে এটি পরিশুদ্ধ, কিছুদিন কাটার পর আমরা তার মহা মহিমা সবেমাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করছি।

সমাধিশিলার উপর এই কথাগুলি লেখা আছে; ‘সূর্য শস্যের জনক আর জল তার মাতা। তুমি জনগণকে জলের মালিক করার জন্য সংগ্রাম করেছিলে, কমরেড ইউনুসভ। আমরা তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি, তোমার হত্যাকারীদের কাছ থেকে আমরা জল ও সূর্যালোক দুটোকেই ছিনিয়ে নেব।’

পরের দিন বৃথাই আমি স্থানীয় মিউজিয়ামের লোকদের কাছে কমরেড ইউনুসভ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ওরা কিছুই বলতে পারল না। তারপর সবপ্রথমেই যে বুড়ো উজবেকের সঙ্গে দেখা হল তাকে জিজ্ঞেস করলাম। বাড়ির খোদাই ফটকের কাছে বসে সে বিক্রি করছিল চেরি ফল। সঙ্গে সঙ্গে তার এই নাম মনে পড়ল, কারণ

তার আছে একটা ফলের বাগান। এর মানে জলসংক্রান্ত যে কোন ঘটনাই তার কাছে অপরিহার্য। এর কথা কোনদিনই সে ভুলতে পারে না।

ইউনুসভের মৃত্যু সম্পর্কে বৃদ্ধ যা বলল সংক্ষেপে তা এই। ১৯২৫ সালে বাইশ বছরের তরুণ ইউনুসভ ভূমি আর জল বিলি সংস্কারের কাজ পেল। বাইরা ছিল পাকাপোক্ত জলের মালিক। তারা ওকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু সে করল অস্বীকার। তখন তারা ওকে গুপ্ত জায়গা থেকে গুলি করে পালিয়ে গিয়ে বাসমাচদের দলে ভেড়ে।

ইউনুসভের জীবন সংক্ষিপ্ত, তার মৃত্যু মর্মন্তুদ, কিন্তু সে সময় এরকম ঘটনা বিরল নয়। আমার মনে আছে সে বছর ভূমি ও জল বিলি সংস্কারের সময় ফেরঘানা উপত্যকায় আর একজন কর্মচারীকে বাইরা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। ওরা তাকে প্রধান সেচ খালের ভিতর চারবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়, জল থেকে তুলে চাঙ্গা করে আবার অত্যাচার চালায়। পাঁচ বারের বার ওকে জলে ডুবিয়ে দেয়। ওই বাইরা হল প্রাচ্য রাজদরবারের ঘাতকদের চেলা। ওদের রক্ত-চড়া মাথায় আরও কত অন্য ধরনের নিষ্ঠুর ফন্দী জাগত। তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের সময় তখন: প্রধান খালগুলির রাষ্ট্রীয়করণ উজবেকদের ভাগ্য নির্ধারণে কোন মতেই জমির চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যাঁরা ছিল জেলার জলের মালিক মানুষের জীবনও ছিল তাদেরই হাতে। লড়াই না করে স্বেচ্ছায় অধিকার ছাড়তে তারা রাজী ছিল না। এ কারণে জলের জন্য বাইদের বিরুদ্ধে জনগণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও সার্থক সংগ্রাম চালাতে লাগল।

ইউনুসভের মৃত্যুর পর ত্রিশেরও বেশী বছর কেটে গেছে। বহু দিন আগে তাঁর বন্ধুরা ঘাতকদের হাত থেকে জল এবং নিঃসন্দেহে সূর্যালোকও ছিনিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া, সবচাইতে মহান যে স্মৃতিস্তম্ভের কথা মানুষ কল্পনা করতে পারে তাই গড়েছে ওর জন্য।

চেয়ে দেখুন নরম সবুজ গাছগুলোর দিকে। মরুভূমির বুক-কেটে যে নূতন খালগুলো বেরিয়ে গেছে তারই দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। একবার স্মরণ করা যাক তীক্ষ্ম বুক সমুদ্র চীলগুলোকে। ওরা চীৎকার করছে কত্ত-কুরগান সাগরের ফেনায়িত ঢেউয়ের উপর। রিক্ত স্তেপের বুকে বানানো হয়েছে এই জলাধার। মরুভূমি থেকে মাটি পাওয়ার জন্য উজবেকরা শত শত খাল কেটেছে, এমন কি একটি সমুদ্র পর্যন্ত তৈরী করেছে। সমুদ্রকে রোখার ব্যাপারে ওলন্দাজরা যা করেছে এই কীর্তি তারই মত মহান।

সমুদ্র থেকে যেমন, মরুভূমি থেকেও ভূমি ছিনিয়ে নেওয়া তেমনি কঠিন ব্যাপার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওলন্দাজরা সমুদ্রকে রুখেছে। সারা জগৎ তাদের অধ্যবসায় আর দৃঢ়-সঙ্কল্পের উচ্চ প্রশংসা করে। আমরাও উজবেকদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়-সঙ্কল্পের প্রশংসা করব। বহু শতাব্দী ধরে ওলন্দাজরা সাগর থেকে যে ভূমি আদায় করেছে মাত্র

পঁচিশ বছরের ভিতর উজবেকেরা মরুভূমি থেকে তার চাইতে বেশী জমি দখল করেছে। ইউনুসভের মৃত্যুর পর থেকে উজবেকেরা ২,৫০০,০০০ একরেরও বেশী জমিকে সেচাধীন করে। নূতন সেচযুক্ত জমির অঞ্চল হল্যান্ডের প্রায় এক তৃতীয়াংশের সমান।

এ কেবল সুরু মাত্র। বর্তমানে উজবেকেরা নূতন খাল কাটছে, বিশেষ করে কাজাখদের সঙ্গে একত্রে ক্ষুধিত স্তেপের এমন একটা শুকনো অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা করতে চলেছে যার পরিমাণ হল্যান্ডের দ্বিগুণ।

১৮। ক্ষুধিত স্তেপ

১৯৪৯। মিরজাচুল সহরের কাছে একটা আরামপ্রদ চাখানায় ক্ষুধিত স্তেপের নূতন গ্রামগুলিকে যুক্ত করা দু'টো রাস্তার মোড়ে এই দৃশ্যটি দেখতে পাই। কয়েকজন তরুণ একখানা পালাসের উপর ঘনভাবে গোল হয়ে বিশ্রাম নিতে বসেছে কাজের পর। চাখানার বুড়োর বলা গল্প গভীর আগ্রহে শুনছে ওরা। লোক গীতিকার পুলকান সাইরের জনপ্রিয় কবিতা 'ক্ষেত মজুর হাসান' আবৃত্তি করছিল বুড়ো।

. কবিতার কাহিনীর অনুসরণ করে গান সুরু হয়। তার 'সাজ' যন্ত্রটি বাজিয়ে গান গাইবার সময় উত্তেজনায় বৃদ্ধের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে। মুখটিকে অদ্ভুতভাবে পরিচিত মনে হল। মনে পড়ে গেল একে আমি কয়েক বছর আগে দেখেছি ফর্হাদ বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনার কাজের সময়।

উজবেকিস্তানের চাখানাগুলি বরাবরই সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। সম্ভবত এই কারণে একটার পর আর একটা টগবগ করা সামোভারের মত বেতার যন্ত্রও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় ঐ একই কারণে বিপ্লবের পর লাল চাখানা বসেছে প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র। লাল চাখানায় সভা বসে, বক্তৃতা আর আলোচনা হয়, শিল্পীদেরও অনুষ্ঠান হয় এখানে। যে লোক এ ধরনের চাখানা চালায় সে অনেকটা জনপ্রিয় ছোটো ক্লাবের ডাইরেক্টরের মত।

কিন্তু ক্ষুধিত স্তেপে এই চাখানার যে লোকটিকে দেখতে পেলাম সে খুবই বিশেষ ধরনের। লোকটি নিরিবিলি থাকতে ভালবাসে না। তার পছন্দ বড় ধরনের কাজ কর্মের হৈ চৈ, এক্সকাভেটরের প্রচণ্ড আওয়াজ। যে সমবায় প্রতিষ্ঠান তাকে কাজে বহাল করেছে তার অনুমতি নিয়ে সে একটার পর একটা প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তম নির্মাণের জায়গাগুলিতে তার চাখানা নিয়ে গেছে। এ ভাবে সে কিছুদিন কাটিয়েছে ল্যাগান ও বৃহৎ ফেরঘানা খাল তৈরীর জায়গাগুলোতে। তারপর কত্ত-কুরগান জলাধারে, ফর্হাদ বৈদ্যুতিক শক্তি

পরিকল্পনায়। এখন এসে হাজির হয়েছে ক্ষুধিত স্তেপে। কারণ ক্ষুধিত স্তেপ উজবেকিস্তানের কেন্দ্রগুলির মধ্যে এমন একটা জায়গা যেখানে জনগণ পুরোদমে গঠনের কাজ করছে। নিজেদের প্রজাতন্ত্রের চেহারা বদলে দেবার জন্য হাজার হাজার লোক কাজ করতে উৎসুক।

ক্ষুধিত স্তেপে সেচ কাজের একটা ইতিহাস আছে।

১৮৭২ সালে জারের শাসনকর্তাদের নির্দেশমত ক্ষুধিত স্তেপে প্রথম সেচ খালের কাজ সুরু হয়। আট মাইল লম্বা আরিক কাটতে সাত বছর সময় লাগে। তার পর 'পয়সার অভাবে' পরিকল্পনাটি বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৮৯১ সালে ১৭ মাইল লম্বা একটি খালের উদ্বোধন উৎসবে বড় ধরনের ধর্মানুষ্ঠান হয়। জল ছাড়া হল খালের মধ্যে। তিন দিন বাদে সির দরিয়া এর বাঁধ ভেঙ্গে খালটিকে সাবাড় করে দেয়। এর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পড়ে আছে বহু দূর বিস্তৃত মাটির স্তূপ। দূরে থেকে নজরে পড়ে এদের। খালের শেষ অস্তিত্ব হিসেবে প্রায় বোঝা যায় না এমনি একটি রেখা নজরে পড়ে।

এই শতাব্দীর সুরুতে জন হ্যামণ্ড নামে একজন আমেরিকান ক্রোরপতি জার সরকারের কাছ থেকে কারা কুম মরুভূমি ও ক্ষুধিত স্তেপে খাল কাটার অনুমতি চায়। উজবেকদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে জার সরকার তাকে অনুমতি দেয়নি। তবে জার সরকার মধ্য এশিয়ার লোকদের স্বার্থ বিবেচনা করে নয়, নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই নারাজ হয়। সে যাই হোক, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্য এশিয়ায় ঢোকেনি, অর্থনৈতিকভাবে জয় করেনি একে যেমন করেছে অন্যান্য দেশকে যার ফলে সে সব দেশ পড়েছে ধ্বংস, ক্লেশ আর দুঃখের কবলে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আর একটি খাল শেষ হয়। এটাও ছোট, ক্ষুধিত স্তেপে সবপ্রথম গড়ে ওঠে মিরজাচুল মরূদ্যান।

সোভিয়েত শাসন সুরু হওয়ার আগে ক্ষুধিত স্তেপে সত্যিকার বড় ধরনের সেচ কাজ শুরু হয়নি। ১৯১৮ সালের বসন্তে বিপ্লবের কিছুদিন বাদে লেনিন একটি নির্দেশনামায় সই করেন। এটি হল 'তুর্কিস্তান সেচ পরিকল্পনা ও উক্ত কাজ সংগঠনের জন্য ৫ কোটি রুবল বরাদ্দকরণ'। এই নির্দেশনামার মধ্যে বিশেষ করে ক্ষুধিত স্তেপে ১,৩৫০,০০০ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থার কথা ছিল। গৃহযুদ্ধের ফলে যে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয় তাতে এই কাজ কিছুটা পিছিয়ে যায়। পরে ক্ষুধিত স্তেপে ক্ষুদ্র খালকে মূল দৈর্ঘের চাইতে বহুগুণ বেশী বাড়ান হয়। বর্তমানে নাম সের্গেই কিরভ। ইনি কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা। মিরজাচুল মরূদ্যানের পরিধি বেড়ে যায়। এখানে গড়ে ওঠে ক্ষুধিত

স্তেপ স্টেশনের পণ্যাগার। কাছেই মিরজাচুল সহর। এই মরূদ্যান থেকেই সুরু হয় ক্ষুধিত স্তেপের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান।

লবণাক্ত জমিগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য মিরজাচুলে প্রতিষ্ঠিত হয় উজবেকিস্তান গবেষণাগার। নীচের জল যাতে কটু লবণকে ধুইয়ে জমির উপরে না আনতে পারে এজন্য বৈজ্ঞানিকরা বহু প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন এবং সেগুলিকে কাজে লাগাতে থাকেন। মহান রুশ বিজ্ঞানী ইভান মিচুরিনের দুজন উজবেক শিষ্য স. ইশানখানভ ও ফ. লাতিপভ এবং উজবেক সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান আকাদমীর ফল ও বেরি ইন্‌স্টিটিউটের মিরজাচুল কেন্দ্রের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্মী এমন সব হিম ও লবণ-সহনশীল ফলের গাছ বানান যাতে এই নতুন জমিতে আপেল, পীচফল ও খুবানী জন্মাতে পারে। তুলোর চারা উৎপাদনকারীরা মিরজাচুল তুলো-উৎপাদন-ক্ষেতে ক্ষুধিত স্তেপের উপযোগী একধরনের তুলোগাছ সৃষ্টির কাজে লাগেন। স্তেপভূমিতে যে সব সমাজতন্ত্রী সহর বসবে তার নক্সা করেন তাসখন্দের স্থপতিরা।

১৯৪৮ সালের শরৎকালে বহু এক্সকাভেটর দক্ষিণের ক্ষুধিত স্তেপে খাল কাটতে সুরু করে। সির দরিয়া থেকে যখন ক্ষুধিত স্তেপের মধ্যে জল ঢুকতে লাগল, সমগ্র উজবেকিস্তান শুনতে পেল আন্দিজানের কমসোমল সদস্যের কণ্ঠস্বর। আন্দিজান বিখ্যাত তুলো উৎপন্নকারী অঞ্চল। তারা উজবেকিস্তানের তরুণদের ডাক দিল ঐ নূতন-গড়া জমিতে এসে বাস করতে, ক্ষুধিত প্রান্তরকে ফুলেফলে ভরিয়ে চিরদিনের জন্য যাতে মানচিত্রের বুক থেকে ওর ক্ষুধিত নাম ঘুচে যায়। হাজার হাজার তরুণ যৌথখামারী সোৎসাহে এই ডাকে সাড়া দিল।

সারা উজবেকিস্তান থেকে ট্রেন ভর্তি তরুণ তরুণীদের আগমনে 'ক্ষুধিত স্তেপ' হয়ে উঠল প্রজাতন্ত্রের সবচাইতে হৈ চৈ স্টেশন। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন নূতন বসতকারীদের যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করল। আল্‌তাই ট্র্যাক্‌টর কারখানা থেকে রুশ শ্রমিকরা ট্র্যাক্‌টর পাঠাল, কাঠ এল ইরকুৎস্ক অঞ্চল থেকে, ভলগা থেকে এল গাড়ি ভর্তি জানলার কাঁচ, ইভানভো থেকে রঙীন রুমাল। রিগা ওদের দিল বোনা পোষাক আর লেনিনগ্রাদ পাঠাল সবচাইতে ভাল সিগারেট। তাসখন্দ জুতা কারখানার তরুণ শ্রমিকরা পরিকল্পনার উপরেও ৩,৫০০ জোড়া বুট তৈরি করে পাঠাল। আর তাসখন্দ এক্স্‌কাভেটর কারখানার কমসোমল সদস্যরা তাদের অবসর সময়ে একটি এক্স্‌কাভেটর তৈরী করে ওদের উপহার পাঠাল।

বসতকারীরা যখন স্তেপে পৌঁছল, সেখানে ছিল না কিছুই। সুরু থেকে তাদের

সবকিছুই তৈরী করে নিতে হয়। এমনকি বসতিতে, মাঠে ও রাস্তার ধারে ধারে ছাউনী দিতে হয় যাতে লোকেরা ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিতে পারে।

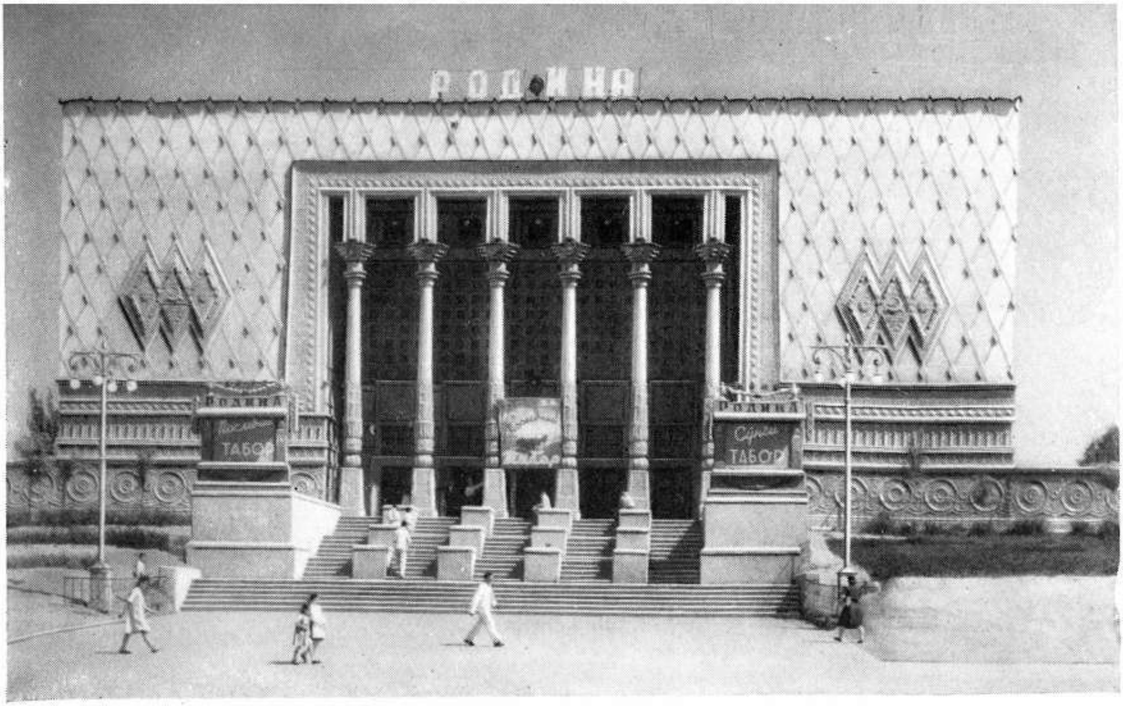
ক্ষুধিত স্তেপে গঠন কাজ শুরু হয়েছে। উজবেক তরুণ তরুণীরা ইতিমধ্যেই মরুভূমি থেকে হাজার হাজার একর জমি আদায় করেছে। উজবেক লেখক শরাফ রাশিদভ এই কথাটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, 'যন্ত্র থেকে সুখী যুগের স্বর ভেসে আসছে, ক্ষুধিত স্তেপ পরিণত হয়েছে প্রাচুর্যের প্রান্তরে।' আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তানের লোকেরা ক্ষুধিত স্তেপ থেকে আরও লক্ষ লক্ষ একর জমি ছিনিয়ে নেবে। অদূর ভবিষ্যতে কমপক্ষে ১,৫০০,০০০ একর নূতন জমিতে চাষ সুরু হবে।

মিরজাচুল পরিকল্পনা অবশ্য অপর এক বিরাট পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ মাত্র। সেই পরিকল্পনার প্রিয় নামটি কয়েক বছর ধরে নরনারীর হৃদয় উল্লসিত করছে।

১৯। ফর্হাদের পাহাড়

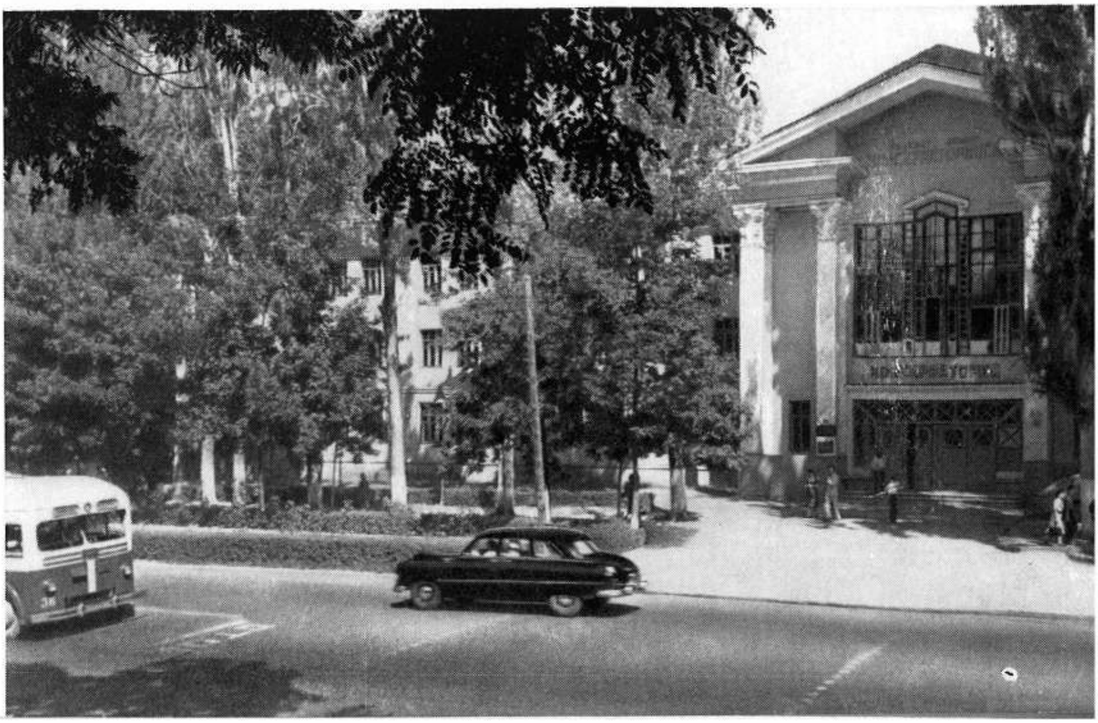
সির দরিয়া যেখানে কখনও বাদামী, কখনো কাদা হলুদ বা ছাই ধূসর রঙে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পথ কেটে ফেরঘানা উপত্যকা পেরিয়ে ছুটে গেছে ক্ষুধিত স্তেপের বুকে, যেখানে পুরোনো পথের মোড়ে উঠত শত শত বছর ধরে উটের ঘণ্টার বিষণ্ণ আওয়াজ সেখান থেকে শুরু হয় ঐ পরিকল্পনার কাজ। এক সময় এখানে মিশেছিল তিনটি উটবাহী দলের রাস্তা। একটি চলে গিয়েছিল উত্তরে, তাসখন্দ মরূদ্যানে, সেখান থেকে সরু সরু নানা পথ সোজা ঢুকেছিল সীমাহীন স্তেপের বুকে। অপরটি পূর্বদিকে। এটা গিয়েছিল ফেরঘানা উপত্যকার সমৃদ্ধ সহরগুলোতে। তৃতীয়টি পশ্চিমে, সৌভাগ্যশালী জরাফশানের উপত্যকায়। এখান থেকে আবার রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছিল প্রাচীন মার্ভে, 'মন-ভুলান' শাহরিসাব্জে এবং 'আলোকের দেশ' খরেজ্মে।

লোকেরা বলে যে সব ভ্রাম্যমাণ গীতিকার চলমান উটবাহী দলের জন্য গান আর গাথা তৈরী করবে বলে এই রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করত তারা তাদের দুতার (দোতারা) ব্যবহার করত না, কারণ স্তেপের উপর উটের ঘণ্টার সঙ্গে বাতাস বিরাট এক দোতারার মত আওয়াজ তুলত। এই প্রান্তরে বিক্ষুব্ধ ও ফেনিল দ্রুতগতি সির দরিয়ার তীরে, গাছপালাহীন উত্তুঙ্গ পাহাড়ের নীচে উজবেকদের সবচাইতে সুন্দর কাহিনীটি রচিত হয়। এ হল পাথর মিস্ত্রী ফর্হাদের কাহিনী। সে তার প্রিয়তমা শিরিনের হৃদয় জয় করার জন্য সির দরিয়ার জল দিয়ে ক্ষুধিত স্তেপকে সেচ করার চেষ্টা করেছিল।



তাসখন্দের 'রদিনা' সিনেমা।

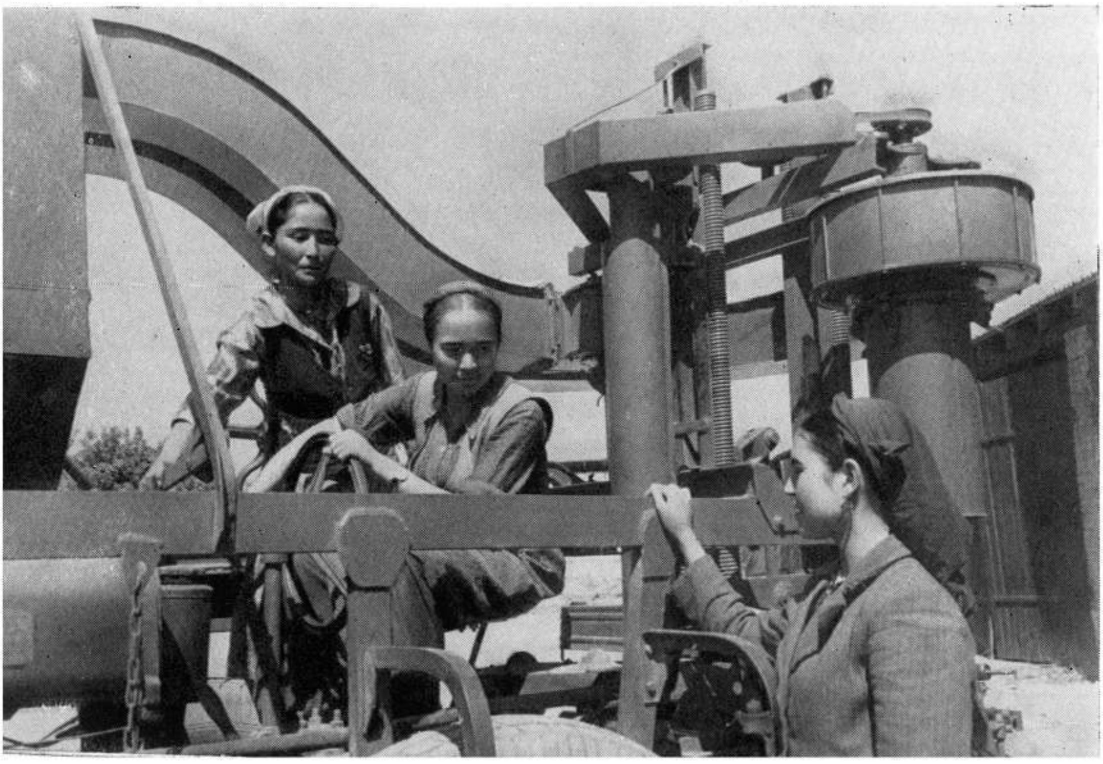
তাসখন্দের রাষ্ট্রীয় কনসারভেটরি।





তাসখন্দ অঞ্চলে তুলো রাখার জায়গার একটি বিশেষত্ব হল তুলোর পর্বতপ্রমাণ স্তূপ।

তাসখন্দের পেশাগত শিক্ষা যারা দেয় তাদের স্কুলে মেয়েরা তুলো-বাছাই যন্ত্র চালাতে শিখছেন।



উটবাহী দলের কাছ থেকে এই কাহিনী সমগ্র প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। উজবেকদের মহাকবি সুদূর হেরাতবাসী আলিশের নাভোই এই কাহিনীকে ভিত্তি করে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ফর্হাদ ও শিরিন' লেখেন। লিপিকুশল তথা অর্ধশিক্ষিত সখের নকলকারীদের অনুলিপি করা তাঁর এই কবিতার বহু সংস্করণ আমাদের হাতে এসেছে। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে এই কবিতা মরূদ্যানের পর মরূদ্যানে ছড়িয়ে গেছে। কখনো বা খরেজ্মে রাস্তার পাশে চওড়া পাতা এল্মে গাছের ছায়ায়, কখনো বা উনুনের ধিকিধিকি কাঠকয়লার আলোয় সমরকন্দের ছোট্ট উঠোনটুকুতে শ্রোতারা ভীড় করেছে কবিতা বলিয়ের চারপাশে। কঠোর উজবেক নির্মাণকারী ফর্হাদের মূর্তি তাদের চোখের সামনে ভেসে আসছে। কিন্তু তার জন্মস্থানেই ফর্হাদের মূর্তি পূর্ণ অবয়বে ও চঞ্চল আবেগে বিকশিত হয়ে উঠেছে। ফর্হাদ বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনার নির্মাতারা গায় উজবেক নাট্যকার উইগুনের গীতিনাটক 'যুগের পদক্ষেপে': 'আমরা ফর্হাদরা এসেছি এখানে অপেক্ষারতা শিরিনের কাছে।' ফর্হাদ — গঠনকর্মী উজবেক জনগণের প্রতিরূপ আর শিরিন হল তাদের সুখের প্রতিমূর্তি।

সোভিয়েত শিল্পীরা আজ কেবল কাহিনী কথিত নায়কের পোষাকে ফর্হাদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন না, এক্সকাভেটর চালক, ড্রিলচালক বা বৈদ্যুতিক জোড়কারীর সাধারণ পোষাকে তাকে দেখান। গায়ে তেরপলের কোট, মাথায় টুপি, তার নীচে গগল চকচক করে। এই বেশে আজ ফর্হাদের শক্তিশালী মূর্তি রাত্রিতে আলোকিত হয়ে ওঠে গলিত ইস্পাতের সরু ও রূপালী ধারায়। গভীর শব্দ করে এই ধারা মুখ খোলা ফারনেস থেকে বেরিয়ে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয় ভয়াবহ স্রোতে। এর থেকে ছুটতে থাকে কোটি কোটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। এই আলোতে স্তেপ ভূমি, সহরের গাছের মাথা, এমনকি দূরের ফর্হাদ পাহাড় পর্যন্ত গোলাপী হয়ে ওঠে, কারখানার বাড়িগুলো আরও অন্ধকার দেখতে। ক্ষুধিত স্তেপের প্রান্তরে তৈরী প্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানার দালান এগুলো।

জার্মান ফ্যাসিস্ট দস্যুরা যখন উক্রেনের ভেতরে ঢুকে দক্ষিণের লোহা ও ইস্পাত শিল্প দখল করে তখন নীপার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের বজ্রধ্বনি প্রতিটি সোভিয়েত মানুষের অন্তরে জ্বালাময় প্রতিধ্বনি জাগায়। তখন স্থির করা হল উজবেকিস্তানে ঐ রকম শক্তিশালী একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং প্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা বসাবে—ঐ একই সঙ্গে ক্ষুধিত স্তেপে জল এনে ফর্হাদের স্বপ্নকে বাস্তব করবে।

১৯৪২ সালের ১৮ই নভেম্বর স্তালিনগ্রাদের সোভিয়েত সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু হওয়ার মুখে ফর্হাদ গঠন কার্যের নির্দেশনামা জারি হয়। স্তালিনগ্রাদে মহান যুদ্ধ সুরু হয়। ঐ একই সময়ে ফর্হাদের পাহাড়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আরম্ভ। এতেই বোঝা

যায় দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সেই সব কঠিন দিনেও সোভিয়েত জনগণের মনে জয় সম্পর্কে কত গভীর আস্থা ছিল।

ফর্হাদ অভিযানে প্রথম দলে ছিল ষাট হাজার যৌথখামারী। দেশ-ব্যাপী রিলে দৌড়ের মত তাদের পেছনে যোগ দেয় আরও কত হাজার হাজার লোক... উজবেকিস্তানে এমন একজন যৌথখামারী নেই যে একবার ফর্হাদের নির্মাণ কাজের জায়গায় যায়নি।

আগেকার দিনে ঘর তৈরীর যে কৌশল ওদের জানা ছিল তা হল গুলুলাজ বা মাটির গোলাকার টুকরো বানানো। মাটির ঘরের দেয়াল বানাবার জন্য এগুলোকে লেই (খড়ের টুকরো মেশান ঐ মাটিরই লেই) মাখিয়ে ব্যবহার করত। লৌহ ও ইস্পাত কারখানার কাজ সুরু হয় মাত্র ঊনত্রিশ জন দক্ষ নির্মাণ-শ্রমিককে নিয়ে। পরে সেখানে হাজার হাজার লোককে এই কাজে তালিম দেওয়া হয়।

এদের শিক্ষা দেয় উক্রেনের বৈদ্যুতিক জোড়কারী ও কংক্রিট ঢালাই কর্মীরা, ভলগার ফিটার মিস্ত্রী ও এক্সকাভেটর চালক, উরালের যন্ত্র জোড়লাগানদার আর লৌহ ইস্পাত কর্মীরা। ...এক সময় রুটি কারিগর হাফিজ গানিয়েভ বিখ্যাত আলাপায়েভ্স্ক ইস্পাত শ্রমিকদের শিক্ষানবিশ হল। একদিন চুল্লিতে রুটি সেঁকত, আজ সে ফারনেসে সেরা জাতের ইস্পাত গলায়। উজবেকিস্তানে ত্বরিৎগতি ইস্পাত গলাইকারী হিসেবে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যৌথখামারী গুলাম আরজিকুলভকে রুশ শ্রমিকরা শিক্ষা দেয়। ফর্হাদ বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনার একজন সেরা ড্রিল মিস্ত্রী হিসেবে নাম করেছে সে। নতুন কাজ শেখা লোকের সংখ্যা বেগাবাদে অগুনতি।

ফর্হাদ পাহাড়ের মাথায় উঠুন। চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখবেন তাতে চমৎকৃত হবেন। মধ্য এশিয়ার আকাশের নীল সোনালী রঙ নদীর বুকে প্রতিফলিত আর তারই আভা ছড়িয়ে পড়ে প্রকান্ড অর্ধবৃত্তাকার কাঠামো, লরি, ডেরিক ক্রেন, মোটরবাহী গাড়ি, কন্‌ভেয়ার আর রেল ইঞ্জিনের ওপরে।

ফর্হাদ পাহাড় থেকে দেখা যায় নতুন সহর বেগাবাদকে। সহরটি ছড়িয়ে আছে রেললাইন আর গ্র্যাভেলের রাস্তার ভেতর। অসংখ্য কলকারখানার ধোঁয়ায় ঈষৎ অস্পষ্ট। এখনো শ্রমিকদের সাময়িক গোছের ঘর যে নেই তা নয়। এর পরেই দেখা যায় নতুন সাদা বাড়ির সারি। উপরে বিশিষ্ট উজবেক গম্বুজ। সহরে এ ধরনের নতুন নতুন বাড়ি নিয়ে অনেক পাড়া তৈরী হয়েছে। এরা ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত অঞ্চলে। নরম পপলার গাছগুলো কমনীয় দৃশ্যপটে এনে দিয়েছে জল-রঙা চিত্রের সজীবতা।

বেগাবাদের চারপাশে তরুণ পপলার, কারাগাছ ও ম্যাপেল কুঞ্জের প্রকান্ড বৃত্ত।

এখানে গাছের গ্রুত্ব সমধিক কারণ বেগাবাদ গড়ে উঠেছে এমন একটি জায়গায় উজবেকিস্তানে যার নাম হল 'চির বায়ুর উপত্যকা'। ঝড়ো হাওয়ার অভাব নেই। নির্মাণ কাজের সময় ফর্হাদের শ্রমিকরা রসিকতা করে বলে, 'এত বাতাস নয়, এ হল ষাট হাজার নির্মাণ-শ্রমিকের নিঃশ্বাস!' বাতাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য বেগাবাদের লোকরা তাদের সহরকে নতুন ঝোপঝাড় আর ফলের বাগান দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে।

ফর্হাদ পাহাড়ের ওপর থেকে বাগ মানানো সির দরিয়াকে দেখা যায়। শক্তিশালী নদীটি অর্ধবৃত্তের আকারে ক্ষুধিত স্তেপের বুকে ঢুকেছে। এর আকৃতি বিরাট ধনুকের মতো। তার ছিলা হল ন' মাইল লম্বা জল আনার খাল। সম্ভবত এই কারণে লোক কাহিনীর কথকরা বেগাবাদের তারিফ করে ওর নাম রেখেছে 'ফর্হাদের ধনুক'। বিশাল ধনুক থেকে তীরের মত অনেক খাল ছুটে যাবে ঐ ক্ষুধিত স্তেপের বুকে। আর এই যাদু তীরগুলো যেমনি ছুটবে অমনি অতীতের মরুভূমিতে রূপ নেবে হাজার হাজার তুলোর ক্ষেত, জন্মাবে গাছ, মাথা তুলবে বাড়ি আর শোনা যাবে হাজার হাজার মানুষের গলার আওয়াজ।

দূরে নজরে পড়ে ফর্হাদ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তার দিয়ে ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিক শক্তি চলে। এমনকি স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সরকারী বিবরণে ফর্হাদের হাই টেন্শন লাইনগুলোকে উল্লেখ করা হয় 'শিরিনের বেণী' বলে।

ফর্হাদ পাহাড় থেকে দেখা যায় প্রথম উজবেক লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটিকে। থেকে থেকে কারখানা থেকে বার হয় তুষার সাদা মেঘের মতো বাষ্প। এর খোলা-চুল্লি বিভাগে ইস্পাত তৈরী হচ্ছে, রোলিং মিলটিও চালু। এই কারখানার পত্তন সমগ্র প্রজাতন্ত্রে একটা উৎসবের মতো।

সমস্ত সোভিয়েত শ্রমিকদের মত বেগাবাদ লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরাও জানে যে তাদের এই উৎপাদন প্রচেষ্টা শান্তি রক্ষার সহায়ক হবে।

উজবেক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা দেখলে বা ফর্হাদ বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে এই কথাই মনে হয়। ফেনায় সাদা বাঁধের জল অল্প তোলা লকগেটের উপর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। নদীর উপর বাঁকান রামধনু গড়ে উঠেছে অপূর্ব জলকণার সূর্যালোকিত বাষ্পে। ফর্হাদ ও শিরিনের প্রাচীন লোক কাহিনী, প্রকাণ্ড বাঁধ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নূতন সহর, আকাশে মাথা তোলা কারখানার চিমনি আর নদীর উপর রামধনু—এই সবকিছু একসঙ্গে এমন একটি অখণ্ড পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যাতে বলা মুশকিল কোথায় প্রকৃতির কাজ শেষ আর মানুষের কাজ সুরু, কিংবা মানুষের সৃষ্টির শেষ আর প্রাচীন কাহিনীর শুরু।

ফেরঘানা

১। ফেরঘানার প্রবেশদ্বার

ক্ষুধিত স্তেপ থেকে সোমরাজ ও ঘাসের উগ্র গন্ধ ভেসে আসে ফর্হাদ পাহাড়ে আর তা মিশে যায় কংক্রীট, কালো তেল, চুল আর ধোঁয়ার সঙ্গে। কিন্তু বসন্তে ফেরঘানা উপত্যকা থেকে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে বাতাস ফুলন্ত ফলের বাগানের সৌরভ বয়ে আনে। কাদা-ভর্তি সির দরিয়ার জল ফর্হাদ বাঁধের স্পিলওয়েতে বাদাম আর খুবানীর সাদা আর গোলাপী পাপড়ি ভাসিয়ে নিয়ে আসে। ঘূর্ণিজলে পাক খায় ওরা। এরা হল উজবেকিস্তানের সবচাইতে ফলন্ত অঞ্চল ফেরঘানা উপত্যকার অগ্রদূত। উপত্যকাকে ঘিরে আছে তুষার-ঢাকা পাহাড় চূড়া।

ট্রেন চলে পূবে। জানলা দিয়ে চোখে পড়ে দূরে অস্পষ্ট কালো ফর্হাদ পাহাড় আর কারখানার চিমনি। কাছে এগিয়ে আসতে দেখা যায় বাঁয়ে ও ডাইনে, এদের মাথা ছাড়িয়ে পিছন দিকে বিশাল পাহাড় ক্রমশ উঁচু ও চওড়া হয়ে গেছে। এদের চূড়ার উপর প্রায়ই একটা স্বচ্ছ কুয়াসা জমাট বাঁধে, দূরের উত্তুঙ্গ পাহাড় যেন আকাশের বুকে ঝুলে আছে। যে পাহাড়ের সারি বা গিরিসঙ্কটের পাশ দিয়ে বহু ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলে তা কিন্তু উজবেক ভূমি নয়। ট্রেনে করে তাসখন্দ থেকে ফেরঘানা উপত্যকায় যেতে হলে তাজিকিস্তান পেরুতে হয়। রাস্তা চলে শিলাময়, রোদে পোড়া, বিষণ্ন মোগল তাউ পাহাড় শ্রেণীর পাশ দিয়ে। নীচে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে সির দরিয়া। তুর্কিস্তান পাহাড়ের নীচে লেনিনাবাদ সহর পেরিয়ে ট্রেন আবার ঢোকে উজবেক অঞ্চলে। প্রবেশ মুখে প্রথম সহর কোকন্দ।

কোকন্দে ঢুকতেই যে জিনিস সবপ্রথম নজরে পড়ে তা হল রেলের গুদামঘরের চালার নীচে অথবা বাইরে খোলা জায়গায় তেরপল দিয়ে ঢাকা তুলোর স্তূপ। শরৎকাল হলে, ফেরঘানার অন্যান্য সহরের মত কোকন্দের রাস্তায় দেখা যাবে লরিভর্তি তুলো চলেছে তুলো

কারখানায়। কিন্তু বসন্তকালেও এখানে দেখা যাবে তুলো চলেছে চোখের সামনে দিয়ে। হাজার হাজার তুবেতেইকার উপর সেই তুলোর চিহ্ন, কারণ ফেরঘানার কালো তুবেতেইকার উপর যে সাদা কাজ করা তা প্রায় তুলোর শুঁটির মতই দেখতে।

বিপ্লবের আগে কোকন্দ ছিল তুর্কিস্তানের প্রধান তুলো বাজার। এর ছাদ-ছাওয়া বাজারে নলখাগড়ার মাদুর পাতা আবছা দোকানঘরের ভিতরে ঢুকত সরু ধুলো বোঝাই সূর্যরশ্মি। ভীড়ের উপর ফেনার মত ভেসে থাকে ফেরঘানা, বুখারা আর খিবার পাগড়ীগুলো আর ঐ সঙ্গে লজ, মস্কো বা কোকন্দের ব্যবসা কোম্পানীর লোকদের খড়ের টুপি আর গ্রীষ্ম অঞ্চলের সাদা শিরাবরণ।

এ সময়ে কোকন্দে বিশেষ ধরনের এক পেশার লোক দেখা যেত। এই সব উজবেকদের সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি কোকন্দবাসী গুলখানি বলেছেন, 'যার পাবার কথা বিশ তাকে এরা দিত পাঁচ আর বাকি পনেরো করত পকেটস্থ।' রুশ তুলো ব্যবসায়ীরা এমনকি পাইকাররাও নিজের বাড়ি দরজার কাছে সালাম জানাত এবং নিজেদের বৈঠকখানায় এনে চা খাওয়াত। কয়েকদিন বাদেই দেখা যেত উক্ত উজবেক ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করেছে ফেরঘানা উপত্যকায়, তার জিনের থলি টাকায় ভর্তি।

এ ধরনের উজবেক ক্রেতাদের নিজেদের পছন্দসই গ্রাম থাকত। সে জানত সেখানে কে খাতক, কার বিয়ে, শ্রাদ্ধ বা সুন্নতের জন্য কার টাকা দরকার, কার ভেড়াশালার অবস্থা শোচনীয় ইত্যাদি। এক কথায় সে সকলের হাঁড়ির খবর রাখত। যখন দরিদ্র দেখানের খুব বেশী টাকার দরকার তখনই হাজির হত তার কুটিরের কাছে। তার ভাবী তুলো ফসলের উপর তাকে টাকা দাদন দিত। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় দেখানের তুলো জলের দরে বিক্রি হত।

ঋণের দায়ে ডুবে শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে দেখান বাধ্য হত তার জোতজমিটুকুকে স্থানীয় বাইয়ের কাছে বিক্রি করতে। হাজার হাজার দেখান এভাবে পরিণত হত চাইরিকারে। এক চতুর্থাংশ ফসলের বদলে বাইয়ের হয়ে তুলোর ক্ষেতে কাজ করত বা পরিণত হত মারদেকারে (ক্ষেতমজুর)। মারদেকারদের সম্পর্কে এক প্রবাদটি সমগ্র মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত। মনে হয় এটা কোন দুঃখের গানের এক পঙক্তি: 'হায়রে, বাজরা বা নুন জুটলে ফ্যান করে নিতাম, কিন্তু মাখন যে নেই।'

আজ কোকন্দের চারপাশে একবার ঘুরে বেড়ালে স্পষ্টই বোঝা যাবে ও সব দিন অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

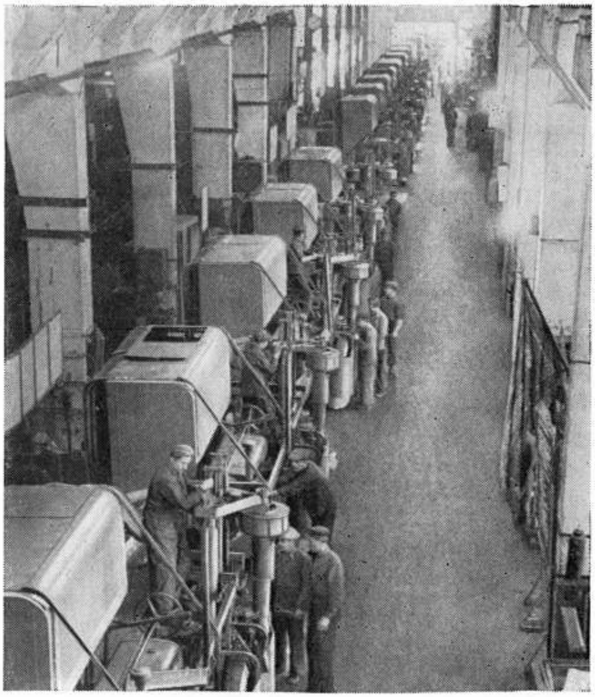
কোকন্দ অবশ্য তাসখন্দের চেয়ে ছোট, রাজধানীর প্রচণ্ড অগ্রগতির সঙ্গে এর তাল রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু এর পরিবর্তনও কম বিস্ময়কর নয়। আগের মত বাজারের নোংরা দোকান,



তাসখন্দের আলিশের নাভোই রাষ্ট্রীয় অপেরা থিয়েটার।

চির্চিকে কৃষিযন্ত্র কারখানায় প্রস্তুত ইউনিভার্সাল যন্ত্রের সাহায্যে সেচ খাত কাটা হচ্ছে।





তাসখন্দ কৃষিযন্ত্র কারখানায় তুলো-বাছাই যন্ত্র জোড় লাগান হচ্ছে।

তাসখন্দে টেকস্টাইল মিলের ডিপার্টের একটি অংশ।



ময়দার গুদাম বা বণিকদের ঘর এখন সহরের চেহারা নির্ধারণ করে না। বর্তমানে এর বৈশিষ্ট্য হল আধুনিক কলকারখানার বৃহৎ সমবায়। এগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন কারখানার মতো চমকপ্রদ কায়দায় তৈরী। এতে সুন্দর আলোর ব্যবস্থা, প্রশস্ত এরা, সেরা স্বয়ংচালিত লেদ ও অন্যান্য যন্ত্রে ভরা এবং বাগান দিয়ে ঘেরা। এসব কারখানার চেহারা দেখলেই মনে হয় এগুলি যাদের জন্য তৈরী তাদের মর্যাদাকে খুবই মূল্য দেওয়া হয়।

কোকন্দের যে কোন•বড় রাস্তার উপর দেখা যাবে বড় বাড়ি তৈরী হচ্ছে। শ্রমিকদের আধুনিক ও মনোরম সহর এই কোকন্দ ক্রমশ উপড়ে ফেলছে মাটির ঘর আর বণিকদের পুরোনো সহরকে। সহরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলে বস্ত্র শ্রমিকদের লাল আরামপ্রদ ছোট ছোট ঘরগুলি বা যেখানে সুপারফসফেট কারখানার শ্রমিকরা বাস করে সেই মহল্লার ধূসর পাথরে তৈরী বাসগৃহ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। কার্ল মার্ক্স স্ট্রীটে তেল শ্রমিকদের জন্য উজবেক জাতীয় স্থাপত্যের মানানসই যে নূতন দোতলা বাড়ি তৈরী হয়েছে তাও কম সুন্দর নয়। এগুলিতে ছায়াময় কুলঙ্গির মতো বারান্দা, প্ল্যাস্টারের কাজ করা। বাড়িগুলিও তৈরী হয়েছে সেই সব মানুষদের জন্য যাদের মর্যাদাকে মূল্যবান মনে করা হয়।

গরীব রুটি কারিগরের সন্তান কোকন্দের কবি মুকিমি বলেন সারা জীবন তিনি নিজেকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' বলে মনে করতেন, জীবন তাঁর ছিল এতই কঠোর। বর্তমানে তিনি তাঁর নিজের সহরের গৌরব। কোকন্দের প্রায় প্রতিটি ঘরে আছে তাঁর কবিতার বই আর তারই সঙ্গে আছে গুলখানির নীতিবাচক রূপকথা ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা সংগ্রহ। ইনি কোকন্দের আর একজন বিখ্যাত কবি। অর্ধশতাব্দী আগে তিনি এখানে বাস করতেন। স্নানাগারের সাহায্যকারী হিসেব অন্নসংস্থান করতে হয়েছে তাঁকে। গুলখানির সমসাময়িকদের মতে তিনি এত দরিদ্র ছিলেন যে 'তাঁর সারা জীবনে আস্ত একখানা রুটিও তিনি খেতে পাননি কিংবা খাবার বোঝাই দাস্তারখান টেবিলে বসার সুযোগ পাননি।'

বিপ্লবের আগে এই বলিষ্ঠ কবিদের কবিতা দুর্লভ হাতে লেখা পুঁথিতে উজবেকদের মধ্যে প্রচারিত হত। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে উজবেক কবিদের রচনা ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের বই রুশ, উক্রেনীয়, জর্জীয়, তাজিক ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে, মূল উজবেক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এদের বহু সংস্করণ।

বর্তমানে উজবেকদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে উজবেক ও বিশ্ব সাহিত্যের চিরায়ত সংগ্রহ রয়েছে: আছে আইবেকের অনূদিত পুশকিন ও গ্যেটে; গফুর গোলাম অনূদিত দান্তে, শেকসপীয়র ও রুস্তাভেলি; উইগুনের অনূদিত লেরমন্তভ, তাছাড়া ইনি 'কির্ক কিজ' কারা-

কল্পক মহাকাব্যের উজবেক সংস্করণও প্রস্তুত করেছেন; মিরতেমিরের অনূদিত হোমার, ইউরিপিডিস ও শেভচেংকো; একজন প্রসিদ্ধ আধুনিক গ্রন্থকার আবদুল্লা কাহ্হার অনূদিত লেভ তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে প্রায়ই দেখা যাবে আবদুল্লা কাহ্হারের ছোটগল্প সংগ্রহ এবং 'কোসচিনারের আলোক'। এই উপন্যাসে তিনি ফেরঘানা উপত্যকায় কৃষি যৌথকরণের প্রথম অবস্থায় একটি গ্রামের জীবনের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

কোকন্দের যে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, থিয়েটার, গ্রন্থাগার বা এর যে কোন সমাজতন্ত্রী কারখানা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে লেনিনের বিজ্ঞানী পূর্বকথন কী ভাবে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু গঠনকাজ ও সৃজনশীল সাফল্যের বৈচিত্র্যে আজকের সমাজতন্ত্রের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে সারা ফেরঘানা উপত্যকার ভূতপূর্ব অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং বর্তমানে তার পাঁচটি বৃহৎ সহরের একটি কেবল কোকন্দকে দেখলেই চলবে না, ঘুরতে হবে সমগ্র ফেরঘানায়, এর অন্যান্য সহর, বাগবাগিচা, মাঠঘাট ও গ্রামাঞ্চলগুলিতে।

২। রেশমের সহর

কোকন্দের কাছে তুলো ক্ষেতের কিনারে তুঁত-গাছের সার আছে কিন্তু এদের মাঝে মাঝে আছে লম্বার্ডি পপলার। সোখ মরূদ্যান পেরিয়ে এবং একটার পর একটা সীমাহীন বাগান ও মাঠ পার হলে নজরে পড়বে পপলার গাছের বেশীর ভাগ আছে কিশলাকের রাস্তায় আর মাঠে তুঁত গাছের আধিপত্য। এই প্রাচীন মরূদ্যানটি বেঁচে আছে শাহিমর্দন নদীর শাখা মারগেলান সাইয়ের জন্য।

স্বাভাবিক অবস্থায় তুঁত-গাছ বড় আর ডালওয়ালা, কিন্তু ফেরঘানা উপত্যকায় এরকম গাছ নেই বললেই চলে। মারগেলান মরূদ্যানে এর একটিকেও দেখা যায় না। এখানকার তুঁত-গাছ খাটো ও খাড়া আর মাথাটা ছোট ছোট শাখায় ঢাকা জটপাকানো থোপার মত। প্রতি গ্রীষ্মে যৌথখামারীরা গুটিপোকাকে খাওয়াবার জন্য এই শাখাগুলো কেটে ফেলে কিন্তু তাতে গাছের প্রাণ নষ্ট হয় না, কারণ আসল জীবনী শক্তি রয়েছে গুঁড়ি আর শিকড়ের মধ্যে। বৃক্ষকাণ্ডে আবার নূতন শাখা গজায়, সেগুলো পাতায় ছেয়ে যায়, লোকে আবার তাদের খেতে দেয় গুটিপোকাদের।

বিপ্লবের আগে রাশিয়া থেকে রেশমের গুটি যেত ইতালি ও ফ্রান্সে। সেখানে গুটি থেকে রেশম বার করা হত। এখন নিজের দেশেই রেশম গুটানোর কাজ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ধেকেরও বেশী রেশম উৎপন্ন হয় উজবেকিস্তানে। প্রজাতন্ত্রের বহু সহরে রেশম গুটানো

কারখানা বসেছে এবং সমরকন্দেও একটি বড় রেশম কারখানা আছে কিন্তু প্রাচীন রেশম উৎপাদন কেন্দ্র মারগেলানেই বসেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চাইতে বড় রেশম কারখানা।

সোভিয়েত ব্যবস্থায় উজবেক জনগণের কী প্রচন্ড উন্নতি ঘটেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল মারগেলান কলে যে মেয়েরা কাজ করে তাদের জীবন।

এদের বেশীর ভাগই একেবারে ছোটবেলা থেকে রেশমের ডিম ফুটনের কাজে লাগত। ফেরঘানার নারীদের এই, কাজের কথা মারগেলানের কার না মনে আছে? গুটিপোকার ডিম ভর্তি ছোট থলে ওরা রাখত বুকের মধ্যে। মানুষের দেহের উত্তাপে ওরা বার দিন বা ঐরকম সময়ে ফুটত। আর বগল বা শিশু দোলনার উত্তাপে আরও আগে, অর্থাৎ আট দিনে। সহজেই বোঝা যায় বসন্ত বাচ্চা মেয়েদের জীবনে ছিল কতই না নিরানন্দ। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদের উপায় নেই, বসে বসে ডিমে তা দাও।

প্রায় সব মেয়েদেরই দশ থেকে তের বছরের মধ্যে বিয়ের কনে হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হত। যে সব বাচ্চা বউদের নিজস্ব রেশম গুটাবার লাটাই থাকত না, তারা বাধ্য হত স্থানীয় বাইদের জন্য কাজ করতে। কাজের জন্য যা পেত তা না পাওয়ারই সামিল। বহু বছর ধরে তাদের দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়েছে গুটি কোষের দুর্গন্ধ গামলার উপর, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। রেশম আঁশের আলগা প্রান্তভাগ লাঠি দিয়ে আঁচ করে বার করতে হয়েছে আর সেগুলোকে জড়াতে হয়েছে একটা মন্থর ঘোরা চাকাতে।

চাচভান, অর্থাৎ ঘোড়ার কালো লোমে তৈরী যে ওড়না দিয়ে ওরা মুখ ঢেকে রাখত তাতে দুনিয়ার সবকিছু মনে হত ধূসর কুয়াশায় ঢাকা। নিজের দেশের উজ্জ্বল ও বর্ণময় প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করা তাদের ভাগ্যে ছিল না। এ জন্যই উজবেকিস্তানের লোকেরা বলত, 'পারানজার ভিতর এমন যে সূর্য সেও কালো।'

যে সব মেয়েরা প্রথম পারানজা ফেলে দেয় বাই, প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা তাদের পাথর ছুঁড়ে মেরেছে, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, হত্যা করেছে, জ্যান্ত কবর দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই হুজুম — অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তা বন্ধ করতে পারেনি। 'আমরা চাই না, যাতে তের বছরের মেয়ে ন্যাকড়ার পুতুলের পাশাপাশি নিজের সন্তানকে লালন পালন করে!' ১৯২৫ সালে নারীদের এক সভায় বলে জনৈকা উজবেক মহিলা। 'আমরা চাই না, জোর করে মেয়েদের দশ বছরে বিয়ে দেওয়া হোক আর পঁচিশ বছরে তাদের কবর দেওয়া হোক!'

এই মারগেলানেরই হুজুমের দিনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় নুরখনকে, বোরখা ফেলে তিনি অভিনেত্রী হয়েছিলেন বলে। সমগ্র উজবেকিস্তান তার শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনতে

পায়। বিখ্যাত উজবেক নাট্যকার কামিল ইয়াশেনের 'নুরখন' নাটক বহু বৎসর ধরে প্রজাতন্ত্রের রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। দাসত্ব ও অবরোধ থেকে উজবেক স্ত্রীলোকদের মুক্তিসংগ্রামে এই নাটক যথেষ্ট সাহায্য করে। সুরকার র. গ্লিয়েরের সহযোগিতায় কামিল ইয়াশেন 'গুলসারা' নামে যে সঙ্গীত-প্রধান নাটক তৈরী করেন তাতেও এই সংগ্রামের কথা আছে। সর্বাধিক জনপ্রিয় মঞ্চানুষ্ঠানের অন্যতম এটি আজ। আজও পর্যন্ত এর অভিনয় চলেছে তাসখন্দে রাষ্ট্রীয় অপেরা থিয়েটারে।

ইচকারি (মেয়েদের অন্দর মহল) থেকে কারখানা পর্যন্ত গুলসারার যে পথ সে পথ মারগেলানের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেই গ্রহণ করে। যৌথকরণের সময় পশ্চাদ্‌গামীতা ও প্রাচীন পাশবিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। গ্রাম শেষ হলেই দুনিয়ার শেষ শুধু এ কথা আর মনে করত না উজবেক স্ত্রীলোক। সে সময় মারগেলানের রেশম কারখানার জাগানিয়া বাঁশীর সুর শুনে আশেপাশের গ্রাম ও মারগেলানের অন্দর মহল থেকে শত শত নারী বেরিয়ে আসে। স্বামীদের কাছ থেকে লুকিয়ে একে একে আসতে থাকে, কারও কারও সঙ্গে কোলের বাচ্চাও ছিল।

প্রথমটায় প্রতি পদেই এরা কিছু না কিছু নূতন জিনিস দেখে অবাক হত। কিন্তু কারখানার সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ভাপ দেওয়া ও রেশম গুটাবার যন্ত্র, ছিদ্রায়তন স্থির করা বা ঝাড়াই যন্ত্র তাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করল না। বাড়িতে বসে ইঞ্জিনিয়ারিং'এর অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পর্কে এত কিছু শুনেছে যে এখন যে নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা তারা তারই শাশ্বত প্রতীক হিসেবে এগুলিকে গ্রহণ করল।

যাতে তারা অবাক হল তা এই যে এখন তারা স্বচ্ছন্দে স্বামীর আত্মীয়স্বজনকে নাম ধরে ডাকতে পারে, একই আরাবায় তাদের সঙ্গে চাপতে পারে, সভায় সম্মানিত আসনে বসতে, এমনকি বক্তার মঞ্চেও স্থান পায়। যারা এই নূতন জগতে বিয়ে করল তাদের আনন্দ এই কারণে যে প্রথম সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তাদের আর স্বামীর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে হয় না। সন্তান হবার পরেও এই সব 'মারাত্মক' শব্দ যথা চাবি, তালা, অঙ্গুষ্ঠানা বা পিঠা সশব্দে উচ্চারণ করতে পারে। এতে শিশুর স্বাস্থ্য বা জীবনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। তাদের যে নূতন বান্ধবীটি কাজে লেগেছে প্রথম মঙ্গলবার আসতে যখন সে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল তারা ওকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করল, কারণ ওর ধারণা নিষিদ্ধ দিনে কাজ করার জন্য লাটাইকারিণীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিবি-সে-সাম্বে (শ্রীমতী মঙ্গলবার) টেকো দিয়ে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়বে। এক কথায়, যে সব কুসংস্কার ও বাধানিষেধে তাদের জীবন ব্যাহত তাদের উপড়ে ফেলতে লাগল তারা।

ক্রমশ ওরা কারখানার কাজে দক্ষ হল, লেখাপড়া শিখল। এক নূতন, সমাজতন্ত্রী জগৎ উদঘাটিত হল তাদের সামনে। এ আশ্চর্য জগতে রয়েছে প্রসূতি ছুটি, শিশু হাসপাতাল, শিশু খাদ্যের কেন্দ্র, নার্সারী, কিন্ডারগার্টেন, খেলাধূলোর মাঠ, গণ ভোজনাগার ও ক্লাব প্রভৃতি। অনেক ছেলেমেয়ে যে সব মায়েদের তাদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য আছে, তারা ছুটি কাটায় স্বাস্থ্যকর জায়গায়। যে তাঁতে বসে তারা কাজ করে সেখানেও দীপ্ত হয়ে উঠল নূতন পৃথিবীর মহান দৃশ্য, তার ইতিহাস ও সাম্যবাদের জন্য তার সংগ্রাম। হাত যাঁতার দাস ছিল কিছু দিন আগে, আজ তারা সোভিয়েত দেশের সব মেহনতী মানুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেয়েছে। কাজ আর ঘানি টানা বলে মনে হল না—কাজ হল জীবনের আনন্দের অংশ বিশেষ।

মস্কোর 'ক্রাস্‌নায়া রোজা' মিলের বিখ্যাত বয়নকারিণীরা হলেন তাদের শিক্ষয়িত্রী। এঁদের দৃষ্টান্ত মত উজবেক বয়নকারিণীরা দুটির বদলে চার থেকে পাঁচটি পর্যন্ত বহু টেকোযুক্ত রেশমের তাঁতে কাজ করতে লাগল। সোৎসাহে নূতন পেশা আয়ও করতে লাগল তারা। রেশম গুটানো, রেশম বোনা কারখানা ছাড়াও রেশম পাকানো ও শণ গুটানো কল ও রঙ-করার কারখানাগুলো বসল মারগেলানে। সহরে দেখা দিল এক বিরাট রেশমের কারখানা।

এক পুরুষের মধ্যে উজবেক নারী কর্মীদের ভাগ্যে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল সে সম্পর্কে বিখ্যাত বয়নকারিণী শারাপাত কাদিরভা উক্ত রেশমের কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বলেন: 'সূর্যের আলো গায়ে পড়ে বলেই একটা পোকাকে সূর্যের আত্মীয় বলা চলে না।' যে সমস্ত পিছিয়ে-থাকা কর্মীরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে চলেছে, আবেগময় সন্ধানী কাজ, সংগ্রাম ও জয়লাভ ছাড়া যারা বাস করছে তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি এই কথা বলেন।

৩। একটি নূতন গ্রাম

রেশম কারখানার যে নূতন সহর তার রৌদ্রালোকিত রাস্তাঘাট মারগেলান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সহরের সঙ্গে এই রাস্তাগুলির যোগ ঘটেছে একটি প্রধান রাজপথের দ্বারা। এই পথ গমগম করছে লরি, উটের দল, বাস, বাইসাইকেল আর আরাবায়। রাজপথের কাছে সারা ফেরঘানা উপত্যকায় সুপরিচিত ফ্রুন্‌জের নামে যৌথখামারের সাদা বাড়িগুলো।

বিপ্লবের আগে এ জায়গার নাম ছিল তুয়া গুম বা হারানো উট। উট কেন, মানুষের পথেও এই গ্রামের আঁকাবাঁকা গলি আর বদ্ধ রাস্তার মাঝখানে হারিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক

ছিল না। এখানে মেয়ে জন্মালে পরিবারের লোক হতাশ হত। তখনকার দিনে উজবেকরা বলত, 'এর চাইতে পাথর জন্মালে ছিল ভালো, ওটাকে দেয়ালের কাজে লাগাতে পারতাম।' আজ সারা গ্রাম তার মেয়েদের জন্য গৌরব বোধ করে। এরা কাজ করছে রেশম উৎপাদন দলের নেত্রী হিসেবে। নতুন নানা প্রয়োগরীতি চালু করে এরা গুটিপোকা বৃদ্ধির কাজে এত ভালো রোজগার করেছে যে তাদের যৌথখামার অনেক দিন আগেই লক্ষপতি হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি গ্রামবাসীর ঘর বানাবার মত প্রচুর 'পাথর' — অর্থাৎ বাড়ি তৈরীর মালমশলা যোগাড় হয়েছে।

উজবেকিস্তানে এখন এমন বহু কিশলাক আছে যেগুলিকে গড়া হয়েছে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায়। এর প্রত্যেকটিতেই নজরে পড়বে গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক স্থাপত্যে জাতীয় গৃহনির্মাণ পদ্ধতি ও কারুকার্য নূতন পন্থায় কী ভাবে জাহির হয়। ফ্রুনজের নামে যৌথখামার গ্রামটি সোভিয়েত সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় বৈশিষ্ট্যময় শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সংমিশ্রণের চমৎকার উদাহরণ।

প্রথমেই বলা চলে, উট কেন একটা শিশুও আজ আর এই গ্রামের রাস্তায় হারিয়ে যাবে না, কারণ এগুলো সোজা, চওড়া আর রাতে বিজলী আলোকে ঝলমল করছে। নূতন চাখানাটিও সুন্দর। চারপাশে চওড়া বারান্দা, সামনে চোখ জুড়োনো খাল, চাখানাটি হল কিশলাকের মাঝখানে। এরই পর পাঁচমিশালী সরকারী দোকান, প্রদর্শনী জানালা প্লেট-কাঁচ দিয়ে ঢাকা। লোক শিল্পীরা সুকৌশলে চাখানার অঙ্গসজ্জা করেছে। উজ্জ্বল নীল, লাল, সবুজ, হলুদ, বাদামী ও কালো রঙ দিয়ে সাদা দেয়ালের পটভূমিতে এমন ভাবে কাজ তারা করেছে যাতে উজবেকিস্তানের প্রিয় ও চমৎকার গাছের নক্সাটি ফুটে উঠেছে। লোক শিল্পীরা যৌথখামারের দোতলা ক্লাবভবনটিকেও সাজিয়েছে। এর ছাদের ভিতরের দিকে সূক্ষ্ম প্ল্যাস্টারের কাজ আর কার্নিশগুলিতে বিভিন্ন রঙের কারুকার্য। ক্লাবঘরের অদূরে, পাথরের তৈরী সাত-সালা স্কুল বাড়ি। তারই একটু পরে কিন্ডারগার্টেন ও শিশু আগার। যৌথখামারের একটি হোটেলও আছে। এতে পাঁচখানা আরামপ্রদ কামরা, একটি পড়ার ঘর।

প্রধান রাস্তার কাছেই বত্রিশ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে সাধারণের জন্য একটি পার্ক। পার্কের মধ্যে একটি মণ্ডপ। এটিরও চিত্রসজ্জা করেছেন ওস্তাদ লোক শিল্পীরা। লোহার তৈরী ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে খোদাই-করা কাঠের থামের উপর। দুশ লোকের বসার জায়গা আছে এতে। এখানে সভা বসে আর গরমের সময় ভ্রাম্যমাণ অভিনেতৃদল গানবাজনা করে।

রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণ সমিতির কোন সদস্য মাঝেমধ্যে আসেন বক্তৃতা দিতে, যেমন সোভিয়েত স্পুৎনিক সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

যৌথখামারের একটি নিজস্ব বৈদ্যুতিক কেন্দ্র আছে। শুধু বাড়ি আর রাস্তাতেই নয়, গ্যারেজ, আস্তাবল, গোলা ও কারখানাতেও বিজলী ব্যবহৃত হয়। যৌথখামারের রেশমপোকাগারে সাদা আলখাল্লা পরা মেয়েরা বৈদ্যুতিক অণ্ডস্ফুটন যন্ত্রের দেখাশোনা করে, উৎপাদনক্ষম গুটিপোকা জন্মাবার জন্য উপযোগী একই তাপমাত্রা রক্ষা করে।

এখানে যে রেশমপোকা পালা হয় তারা নূতন নাম পেয়েছে। উজবেক রেশমগুটি উৎপন্নকারীরা এই নূতন জাতের উদ্ভাবন করেছেন। 'বাগ্‌দাদ' জাতের চাইতে 'সোভিয়েত' জাত অনেক বেশী রেশম দেয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'বাগদাদের' চাষ হত এখানে। মধ্য এশীয় রেশমচাষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট নূতন ধরনের তুঁত-গাছেরও সৃষ্টি করেছে। 'পবেদা' নামে এক ধরনের গাছের কালো মাথা আজকাল দেখা যায় ফ্রুন্‌জে যৌথখামারে গ্রামের মাটির দেয়ালের পাশে পাশে। পাতা বহুল গাছ হিসেবে 'পবেদা'র প্রসিদ্ধি।

গ্রামের রাস্তা বরাবর চলেছে এ্যাস্‌ফল্ট বাঁধানো ফুটপাথ। যৌথখামারের সমস্ত বাড়িগুলি নূতন তৈরী হয়েছে। সংখ্যায় প্রায় দু'শ। বাড়িগুলি পরিচ্ছন্ন আর গরম কালে ঠাণ্ডা। সামনের দরজা সাজানো। রাস্তার দিকে মুখ-করা বড় বড় জানালা। যে কোন বাড়িতে ঘরের ভিতর না ঢুকে শুধু রাস্তা বরাবর ছোট্ট উঠোনটুকুর মধ্যে গেলেও দেখা যাবে যেসব জিনিস উজবেকদের নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্যময় তা কি ভাবে তাদের নূতন জীবনে মূর্তি নিয়েছে।

উঠোনের চারপাশে খুবানী ও পীচফলের গাছ। তাদের কৃশ চুণ মাখানো দেহ, দু'একটি ফুলের কেয়ারি এবং সদা পরিষ্কার সাফ করা রাস্তা উঠোনের ভিতর একটি আরামপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। গাছের তলায় একটা কাঠের সুপা। এটি একটি বড় ধরনের, প্রায় চার-কোণা, নীচু খাট বিশেষ। হাতের কাজ-করা পালাস বা কম্বল দিয়ে ঢাকা। গ্রীষ্মকালে এর উপর ঘুমোনো চলে, আরাম করা যায়, বন্ধুদের বসানো চলে, বসতে হয় বুট খুলে পা মুড়ে।

চিত্র করা কুমগান, অর্থাৎ সরু গলা ধাতু পাত্রগুলো একটা ছোট জলাধারের কাছে ঝকমক করছে। এর ভিতর দিয়ে আরিক বয়ে যাচ্ছে। উঠোনের এক কোণায় একটি কালো উনুন। গৃহের চওড়া বারান্দাটিকে বলা হয় আইভান। আইভানের ছাদের ভিতর দিকে আঁকা রঙীন নক্সা। ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে কাঠের থামের উপর।

রাস্তা থেকে উঠোনে বিজলী তার এসেছে। রাতের বেলা সুপার উপর দোল খাওয়া বিজলী ল্যাম্পের চারপাশে গাছের পাতাগুলোকে বিশেষ ঘন মনে হয়। বিদ্যুৎচালিত ইস্তিরি ও সসপেনও আজকাল খুবই চালু।

বাড়িতে ঢুকে বারান্দা হয়ে মেহমানখানায় যাওয়া যাক। এটি হল শীতকালের বৈঠকখানা। আগে এর দরজা ছিল এত ছোট যে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকতে হত। উজবেকদের আসবাবপত্র ছিল না বললেই চলে। ভারি জিনিষের প্রয়োজন না থাকায় উঁচু দরজার দরকার হত না। নূতন বাড়িতে যে কোন আসবাবপত্র ভিতরে নেবার উপযোগী করে দরজাগুলোকে উঁচু করা হয়েছে।

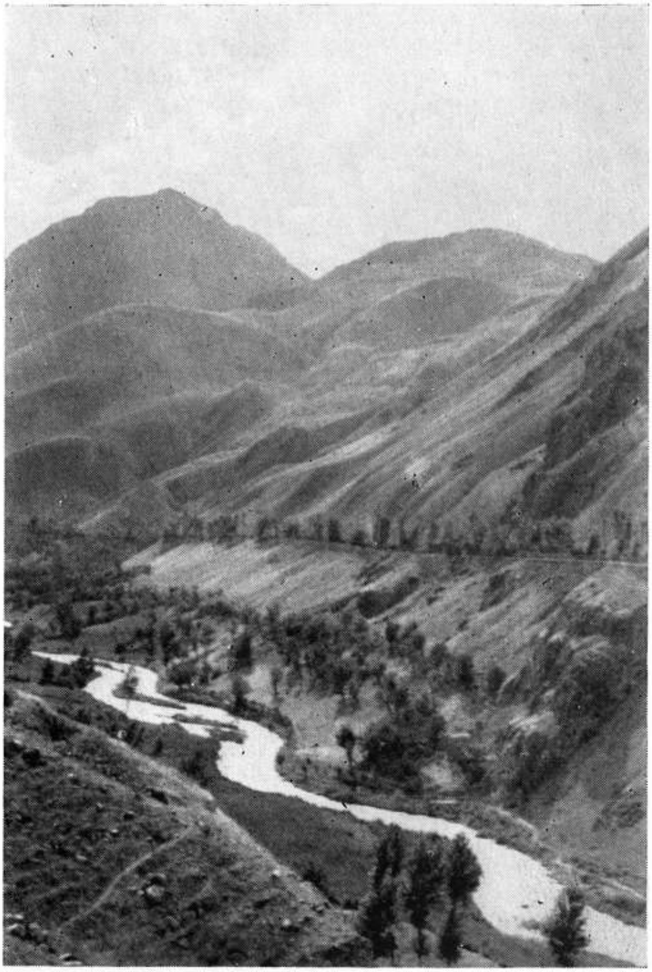
দেখানদের ঘরগুলোর জানলাও ছিল নীচু। আলো পড়ত কেবল মেঝে আর সুপার উপর। সেখানে পরিবারের সারা জীবন কাটত। এখন সুপা, চটা ও সিন্দুক ছাড়া টেবিল, চেয়ার, পোষাকের তাক, নিকেল করা খাট, বইয়ের আলমারী হাজির হয়েছে। ঘরে যাতে প্রচুর আলো ঢুকতে পারে সেজন্য বড় জানলা করা হয়েছে।

মেহমানখানায় দেখা যাবে সেই প্রথাগত দেয়াল কুলুঙ্গি, তাতে প্ল্যাস্টারের কাজ করা ঝাঁঝরি, ওর সঙ্গে টাঙানো জগ ও অন্যান্য পাত্র। এ ছাড়া আছে বই, পেয়ালা, ঝাঁপি, গ্রামোফোন, উজবেক বাদ্য যন্ত্র, সেলাইয়ের কল, একটা চিলিম (লম্বা কুমড়োর তৈরী মধ্য এশিয়ার হুঁকো) আর একটি নূতন বহু ভাল্‌ভের বেতার যন্ত্র।

হাজার হাজার ছোটখাট জিনিস দেখলে নজরে পড়বে কি ভাবে উজবেক গ্রামগুলো পুরোনো ঐতিহ্যের রূপান্তর ঘটিয়েছে। বেশী দিনের কথা নয়, উজবেক গৃহের ছিল দুটি ভাগ: তাসকারি, অর্থাৎ পুরুষের অংশ আর ইচকারী, অর্থাৎ মেয়েদের অংশ। এখানে পরিবারের বাইরে কোন পুরুষ ঢুকতে পেত না। আধুনিক যৌথখামার-গৃহে ইচকারী পরিণত হয়েছে শোবার ও বাচ্চাদের ঘরে। (কখনো কখনো এসব ঘরে উজ্জ্বল রঙে আঁকা কাঠের শিশু দোলনা দেখা যায়, সেটি বাচ্চার ঘরে একটি নিজস্ব চেহারা আনে।) আর মেহমানখানা এখন বৈঠকখানা — সেখানে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সমান মর্যাদায় তার পরিবারের বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা জানায়।

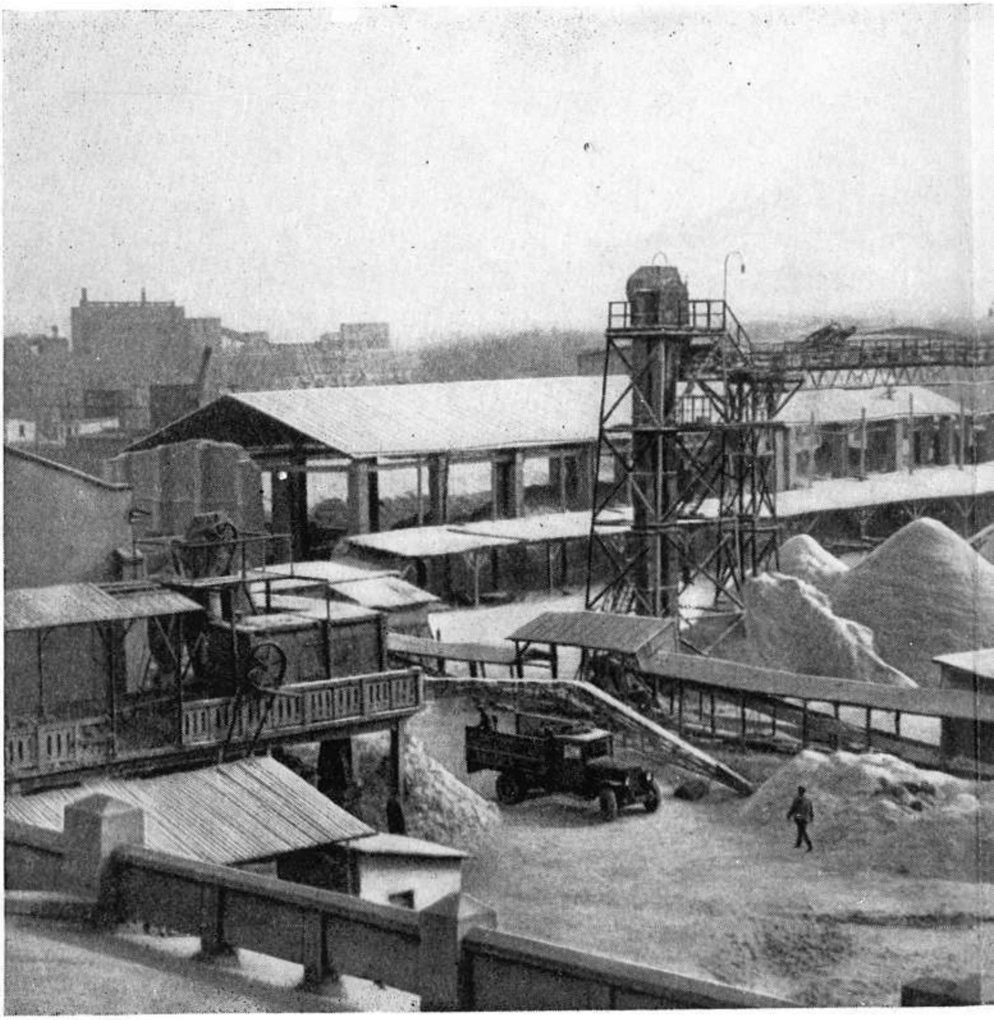
প্রথম দর্শনে মনে হবে জীবনে আরাম, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি আনার জন্য যা কিছু দরকার করা হয়েছে ফ্রুন্‌জে যৌথখামারে। কিন্তু যৌথখামারের সভাপতি ও ফেরঘানা উপত্যকায় সুপরিচিত আবদুল্লা রহিমভকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হেসে বলবেন আরও অনেক কিছু করার আছে। প্রথম কথা, সমস্ত দলগুলির খামার কেন্দ্রে এখনও শিশু আগার, আরাম-ঘর বা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি। দ্বিতীয় কথা, কারও বলার সাধ্য নেই

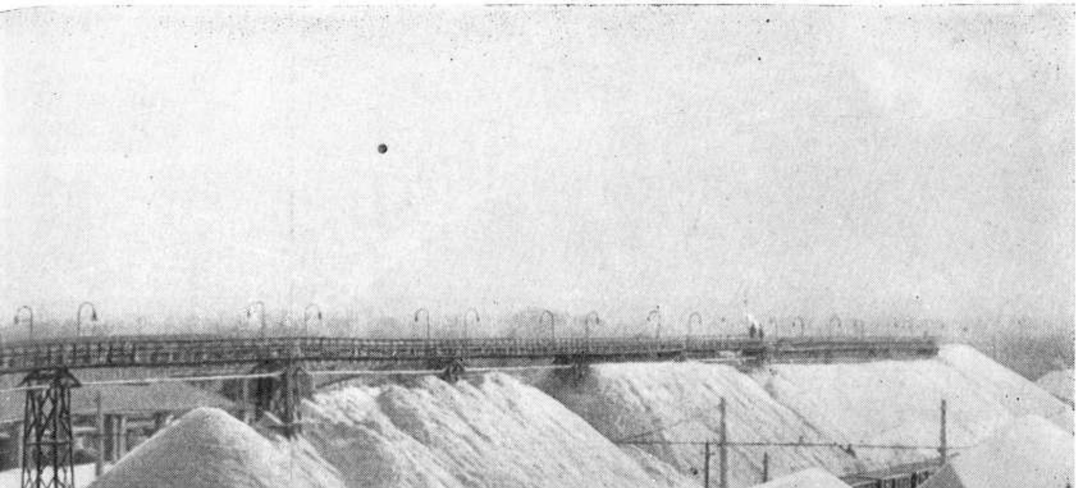
শাহিমর্দন নদী।



আক কপাচিগাই রাষ্ট্রীয় খামারের একটি চারণভূমি।







ফেরঘানা তেল ও চর্বির কারখানায় কাঁচা মাল নামানো হচ্ছে।



একটি ভ্রাম্যমাণ বই-এর দোকান; ফেরঘানা অঞ্চলে যৌথখামারগুলিকে বই জোগায় এটি।

যে 'সবকিছু' হয়ে গেছে, কারণ সমাজতান্ত্রিক জীবনধারায় নিত্য নতুন প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়। যৌথখামারীরা এখন স্থির করেছে একটি প্রসবাগার, জনসেবা কেন্দ্র, লণ্ড্রি, বস্ত্র ও জুতা মেরামতের দোকান এবং দর্জির দোকান খোলার। ওরা আরও চায় যে একটি মোটর গাড়ির মেরামতের কারখানা, ব্যায়ামশালা, পড়ার ঘর সুদ্ধ ভাল গ্রন্থাগার এবং একটি থিয়েটার তৈরী হোক। সে সময়ও আর বেশী দূরে নয়, যখন লেনিনস্ক্ থেকে গ্যাসপাইপ আসবে মারগেলানে। তার অর্থ হল আগে থেকেই যৌথখামারকে একটি গ্যাস উপকেন্দ্র গঠন করতে হবে। এর পর একে একে আরও নূতন জিনিস আসতে থাকবে, কারণ সাম্যবাদ জাতি তথা প্রতিটি ব্যক্তিকে যে সুযোগ সুবিধা দেয় তার সংখ্যার কোন কূলকিনারা নেই।

৪। 'জীয়ন্ত সুন্দরী'

ওদের উপত্যকা যে কী আশ্চর্য আগন্তুকের কাছে একথা বলার চাইতে ফেরঘানাবাসীদের প্রিয় আর কিছুই নেই। বিশেষ করে যখন তারা তাদের দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় একত্র হয়। তাসখন্দে তুলো উৎপাদনকারীদের সভায় বা মস্কোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে ইণ্টেরভালের সময় যদি ডিনার টেবিলে সাক্ষাৎ ঘটে কোন মস্কো বা গোর্কিবাসীর সঙ্গে তারা সাবেগে ফেরঘানা উপত্যকার এক জীবন্ত বিবরণ দেয়। ওদের কথা থেকে মনে হয় ওদের প্রতিটি সহর ও গ্রাম কোন না কোন জিনিসের জন্য বিখ্যাত।

হয়ত একজন ফেরঘানাবাসী তার সুন্দর নক্সা গাঁথা কালো তুবেতেইকা তুলে দেখাল একজন রুশিকে। এর থেকে কথা উঠবে চুস্তের, সহরটি তুবেতেইকা বানিয়েদের জন্য বিখ্যাত। আর একজনের হয়ত রিস্তানের কথা মনে পড়বে, নব পরিচিতকে হোটেলে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একখানা চিত্রবিচিত্র চাকচিক্যময় থালা বা একটি জগ দেখাল। এগুলি তৈরী রিস্তানের বিখ্যাত কুমোরদের। রিস্তান একটি বড় কিশলাক, কোকন্দ থেকে বেশী দূরে নয়। কুভা ও নমানগানবাসীর মধ্যে হয়ত তর্ক তুলবে কোন জায়গাকার ডালিম সবচাইতে বড়, মিষ্টি আর বেশী স্বাদু।

কিন্তু ফেরঘানা উপত্যকার সব চাইতে মনোরম সহর কোনটি একথা জিজ্ঞেস করলে সবাই একমত হবে যে ওটি হল ফেরঘানা। তাদের নিজ উপত্যকাতেই যে এর সমকক্ষ আর একটিও নেই তা নয়, সমগ্র উজবেকিস্তানের মধ্যে এটি অদ্বিতীয়। মধ্য এশিয়ার অন্য কোন সহরে এত বেশী বা এত রকমারি গাছ দেখা যায় না। চার থেকে আট এবং কোন কোন

জায়গায় বার সারি করে বিশাল গাছ রাস্তায় ছায়া দেয়। ওস্তাদ মালীরা গাছগুলিকে এমন কায়দায় সাজায় যে বসন্ত, গ্রীষ্ম আর শরতে তাদের পাতাগুলি নিজেদের বিভিন্ন রঙে আর নিজস্ব আলো ছায়া মিশিয়ে রাস্তা আলো করে রাখে। ফেরঘানায় বহু নূতন নূতন সুন্দর বাড়িও আছে। এখানে সেখানে গাছের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে নূতন বাড়ির দেয়ালের নীল ও হলুদ পটভূমিকায় সরু সাদা স্তম্ভশ্রেণী। কলকারখানার চারপাশে শ্রমিক সহরটি গড়ে উঠেছে। রাস্তায় মাটির দেয়ালও দেখা যায়। বসন্তে দেওয়ালের মাথায় সাদা মাটির উপর ডগডগে লাল পপিরা অবাধে ফুটে ওঠে। বেড়া আর বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে তুষার ছাওয়া গিরি চূড়ার শীতল নিঃশ্বাসে সহরের বাতাসকে সতেজ করে অনেক ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিম আলাই পর্বতমালা। মনে হয় কত কাছে, কিন্তু কত দূরে।

প্রাক-বিপ্লব যুগের রুশ ভ্রমণকারীরা ফেরঘানাকে বলত 'ঘুমন্ত সুন্দরী'।

ভোরের বেলা ফেরঘানার রাস্তায় বেরিয়ে সামনে যে সবচাইতে সুন্দর ছোট্ট বাড়িটি দেখছেন তার সামনে দাঁড়ান। শুনতে পাবেন সহরতলী থেকে কারখানা প্রচণ্ড স্বরে ভোঁ বাজিয়ে ডাক দিচ্ছে। দরজাটা ঝপ করে খুলে যাবে, বেরিয়ে আসবে সাদা রুমাল জড়ান হয় কোন রুশ বা উজবেক মেয়ে। দ্রুত গতিতে সে এগিয়ে যাবে গাছের সারি দেওয়া রাস্তা ধরে, মিশে যাবে সজীব জনতার সঙ্গে, এরা ফেরঘানার নূতন কলকারখানার শ্রমিক। চলেছে তাদের তাঁত বা লেদ চালাতে।

একটু বাদেই এ একই দরজা দিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসবে একটি ছেলে। তখন ও স্যান্ডুইচ চিবোচ্ছে, ছুটে যাবে তার স্কুলে যাওয়া সঙ্গীদের ধরতে। পিঠের উপর দুলছে বইয়ের থলি। এর পর রাস্তা গমগম করতে থাকবে অফিসযাত্রী আর টেকনিকাল বিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটের ছাত্রে। আর শেষটায় সেই সকালবেলায় আকাশের পাৎলা মেঘটুকু যখন মিলিয়ে যাবে আর জেগে উঠবে স্বচ্ছ, সীমাহীন রোদে ভরা আকাশ, সেই ছোট্ট ঘরের দরজা খুলে যাবে আর একবার, এক বৃদ্ধা ঝুড়ি হাতে ধীরে ধীরে যাবে বাজারের দিকে।

'ঘুমন্ত' ফেরঘানা? না, সে আজ 'জীয়ন্ত সুন্দরী', প্রতিটি নতুন কারখানা হল হাজার হাজার লোকের সৃজনীমূলক প্রচেষ্টার ফল। যান একবার রেশম গুটানো কলে, ঢুকুন কারখানার ভিতরে।

হাজার হাজার সুতো চলেছে চোখের সামনে রেশম পাকান যন্ত্রাবলীর পটভূমিকায়। জলভর্তি কাঠের চৌবাচ্চায় রেশগুটি ঝাপাঝাপি করছে। দ্রুত আঙুলে মেয়েরা সুতোর কোনা ধরে লাগিয়ে দিচ্ছে বিশেষ ধারক যন্ত্রে। এটি একটি আধুনিক যন্ত্রবিভাগ (এখানকার

চাইতে বেশী যন্ত্র পৃথিবীর রেশম শিল্পে আর কোথাও নেই), তবু এটা ফেরঘানার মধ্যে সবচাইতে পিছিয়ে-থাকা কারখানা, কারণ এখনও এখানে হাতের কাজের দরকার হয়।

কিছু দিনের মধ্যেই বিভাগটি চেনা যাবে না এমনি রূপান্তর ঘটবে এই কারখানায়। রেশম শিল্প সংক্রান্ত উজবেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মীরা একটি চমৎকার গুটির সুতো গুটাবার যন্ত্রের নক্সা করেছেন। তা ছাড়া রেশমগুটিতে কেন্দ্রীভূত বাষ্প দেওয়া ও সুতোর কোনা ধরার যন্ত্রও এঁরা উদ্ভব করেছেন। তাসখন্দে উভয় যন্ত্রই তৈরী হচ্ছে। রেশম গুটনোর শিল্প থেকে শীঘ্রই চিরদিনের মত হাতের শ্রম দূর হবে যেমনটি হয়েছে অন্যান্য কলকারখানায়। উজবেকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক কলকারখানায় যন্ত্রীকরণ, স্বয়ংচালিত যন্ত্রের ব্যবহার, রসায়নের প্রয়োগ ও বিজলীকরণ একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

ফেরঘানা উপত্যকার তুলো শোধন-কারখানার কথা ধরা যাক। যন্ত্রের দিক থেকে তারা এমন কি আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। পাইপের ভিতর দিয়ে বাতাসের সাহায্যে গুদাম ঘর ও উঠোনের গাঁইট থেকে তুলো যায় কারখানায়। পাতা সরানো ও পরিষ্কার করার যন্ত্র তুলো সাফ করে। এই বিশেষ যন্ত্রও উজবেকিস্তানে উদ্ভাবিত। তাসখন্দ ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরী পয়লানম্বরের বুরুশহীন তন্তু বিভাজন যন্ত্র ঘনীভূত বায়ুর সাহায্যে তন্তুগুলোকে আলাদা করে। শক্তিশালী হাইড্রলিক প্রেস, যন্ত্রচালিত স্ক্রু কনভেয়র ও অন্যান্য যন্ত্র প্রমাণ করছে যে শ্রমকে প্রকৃতপক্ষে মানবিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও অতীব ফলপ্রদ করার জন্য সোভিয়েত মানুষ সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করছে।

কঠোর কায়িক শ্রম এখন অতীতের ব্যাপার। হাতের কাজকেও পদে পদে কমিয়ে আনা হচ্ছে। ফেরঘানার কাপড়ের কল আর তেল ও চর্বি কারখানার যাবতীয় কাজ করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। ইঁট-খোলায় ছাঁচকারীদের কঠোর কাজ যন্ত্র দিয়ে করা হচ্ছে। পোষাকের কারখানায় যন্ত্র চলে বিদ্যুতের সাহায্যে, ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক কাঁচি।

ফেরঘানা অঞ্চলে একটি বিরাট কারখানা আছে। এখানে ফেরঘানা সহরের স্কুল-ছাত্ররা প্রায়ই বেড়াতে আসে। এই কারখানায় বিশেষভাবে দেখান হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিল্পে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ও যন্ত্রীকরণের প্রথা কতদূর পর্যন্ত প্রয়োগ কার যায়। এটা একটা সিমেন্ট তৈরীর কারখানা। বলা চলে এটা শ্রমশিল্পের সেই শাখার কারখানা যাতে বেশী দিনের কথা নয় বেশীর ভাগ লোকই ছিল ভারবাহী। চুনা পাথরের খনিতে, কারখানা প্রাঙ্গণে, কারখানার বিভাগসমূহে এরা একসারিতে থিতিয়ে চলত, ভারি থলের ভারে পড়ত নুয়ে; ঠেলে নিয়ে যেত সরু তক্তার উপর দিয়ে চুনা পাথর আর সিমেন্ট বোঝাই হাত গাড়ি।

যে কারখানাটির কথা বলছি এটি হল কুভাসাইয়ে। পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলির সময় এই নূতন সহরটি গড়ে উঠেছে। সহরপ্রান্তে যেখানে পাহাড়গুলি খাড়া হয়ে উঠেছে তার ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে লম্বা ও সরু পপলার গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এর সাদা বাড়ির সারি আর লাল ও সবুজ ছাদওয়ালা কটেজগুলি চমৎকার দেখা যায়।

কাছাকাছি পাহাড়ের খনিতে শক্তিশালী এক্সকাভেটর ব্যবহৃত হচ্ছে। যন্ত্রগুলো বাহ্যতঃ বিশ্রীভাবে, কিন্তু আসলে সুসমঞ্জসভাবে ঘোরার সময় প্রচুর চুনা পাথর তুলে আনে। এ হল সিমেণ্ট কারখানার কাঁচা মাল। কুভাসাই সিমেণ্ট কারখানায় এই এক্সকাভেটরগুলিই যান্ত্রিক উৎপাদনের কাজ সুরু করে।

টিপ-আপ ট্রাক ও কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে কাঁচা মাল যায় যন্ত্রচালিত চুনা পাথরের ঘাঁটিতে এবং সেখান থেকে সিমেণ্ট কারখানায়। সেখানে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং'এর বিস্ময় একটি ৬০ মিটার উঁচু রোটারি ভাটিতে এগুলোকে বোঝাই করা হয়। শ্রমিকরা শ্রেফ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, শোনে মৃদু, ছন্দোময়, অনেকটা সমুদ্রে জোয়ারের মত শব্দ। তৈরী সিমেণ্ট ঠাণ্ডা করা আর ট্রাকে ভর্তি করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। তার পর চালান হতে থাকে সুদূর ফেরঘানায়, সমরকন্দে অথবা তাসখন্দে, পরিণত হয় নূতন বৈদ্যুতিক কেন্দ্রে, কারখানায়, সংস্কৃতি ভবনে, স্কুলগৃহে।

প্রজাতন্ত্রের গৃহ নির্মাণ মালমশলা ঘটিত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হল কুভাসাই। চুনা পাথর ও সিমেণ্টের কারখানা ছাড়াও এখানে আছে ইঁট-খোলা ও স্লেট কারখানা। কুভাসাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফেরঘানা উপত্যকার মধ্যে সর্ববৃহৎ। তা ছাড়া আছে যৌথখামারী ও বৈমানিকদের সুপরিচিত কেমিক্যাল তৈরীর কারখানা। এর উৎপন্ন দ্রব্যাদি দিয়ে বাগান ও ক্ষেতের পোকা নষ্ট করা হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় কেন এটি খামারীদের কাছে পরিচিত। আর বৈমানিকরা, তাঁরা ত পোকা মারার কাজ করে থাকে।

উজবেক যৌথখামারী তুলো গাছের অঙ্কুরে ছোট্ট মাকড়সার জাল দেখে যখন বুঝতে পারে তুলোর মারাত্মক শত্রু লাল মাকড়সা আস্তানা গেড়েছে (এত ছোট যে বিবর্ধক যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না), কিংবা ফেরঘানার বিখ্যাত খুবানী বাগানে যখন আঁশ পোকা দেখা দেয় (ফল উৎপাদনকারীরা এদের যমের মত ভয় করে) অমনি ওরা টেলিফোনে জেলা কেন্দ্রে খবর পাঠায়। দু'এক ঘণ্টার ভেতরেই যে একখানা বিমান এসে হাজির হবে এটা তাদের জানা ব্যাপার। কুভাসাইয়ের কেমিক্যাল দিয়ে বৈমানিকরা যৌথখামারের শস্যকে লাল মাকড়সা, গাছ উকুণ ও অন্যান্য অসংখ্য পোকার হাত থেকে রক্ষা করে। আক্রান্ত মাঠের

উপর দাঁড়িয়ে লোকেরা নিশান উড়িয়ে সংকেত দেয়। বিমান আগু পিছু উড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ মেঘের মতো রাশি রাশি কেমিক্যাল ছড়িয়ে পড়ে মাঠের বুকে। উজবেকিস্তানে যে ঘূর্ণি কায়দার উদ্ভব হয়েছে তাতে পাতার উপরে ও নীচু অংশে কেমিক্যাল লেগে থাকে। পাতার ঐ সব অংশে শুঁয়োপোকা লাগে।

ফেরঘানার শ্রমজীবীদের জীবনে বাস্তবিকই প্রকাণ্ড পরিবর্তন এসেছে। কিছুদিন আগে যেখানে দেখান রুটির খোঁজে সহরে যাত্রা করার আগে হতাশায় চেয়ে থাকত লাল মাকড়সা বিধ্বস্ত তার মাঠের দিকে, আজ সেখানে কৃষি বিমানবহর যৌথখামারের মাঠে কেমিক্যাল ছড়াচ্ছে। যেখানে মাত্র সেদিন পর্যন্ত ভারবাহীর (সম্ভবত ঐ সর্বস্বান্ত দেখানটি) পিঠ ভাঙত ভারি তুলোর গাঁইটে আজ সেখানে নূতন যন্ত্রটি সেই কাজই করছে একজন সুদক্ষ উজবেকের তত্ত্বাবধানে।

৫। আলাই পর্বতমালায়

উপত্যকার অন্যান্য সহরের মত ফেরঘানার চারদিকে আঙুর ক্ষেত আর ফলের বাগান। এর পরেই হল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গ্রাম আর তুলোর বাগান। এদের সেচজল যোগাচ্ছে শাহিমর্দন সাই ও ইসফাইরাম নদী। শাহিমর্দন সাইয়ের তীর ঘেঁষে যে সড়কটি চলে গেছে তারই কাছে কিছু দিন আগে বসানো সবুজ গাছের বন রক্ষা লাইন। ঐ পথ ধরে মোটরে করে এগিয়ে গেলে আলাই পর্বতমালার তুষারাবৃত পাদদেশের জন্য প্রথমে দেখা যায় না, আবার বৃহৎ ভুয়াদিল কিশলাকে ঢুকলে ঐ পাহাড়গুলি অনেক বেশী উদাত্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। চিমিওনে বস্ত্র কলের শ্রমিকদের জন্য একটি নূতন স্বাস্থ্য নিবাস খোলা হয়েছে। এটি একটু দূরে। উজবেকিস্তানের শ্রেষ্ঠ শিশুস্বাস্থ্য নিকেতন হিসেবেও ভুয়াদিলের গৌরব। ভুয়াদিল থেকে পথ গেছে শাহিমর্দনে। মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত পার্বত্য স্বাস্থ্য নিবাস এখানে।

ভুয়াদিলে তুলোর বাগান যেমন শেষ, তেমন উজবেক প্রজাতন্ত্রের সীমানারও। এর পরেই কিরগিজিয়ার পর্বতমালার শুরু। যদিও শাহিমর্দন উজবেকিস্তানের সীমানা ছাড়িয়ে পনের মাইল দূরে, তবু সেটি উজবেকদেরই অঞ্চল। পৃথিবীর অন্য কোথাও রাষ্ট্রের সীমানা এ ভাবে নির্ধারিত হয়নি। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই এটা সম্ভব। কোন বাগান বা মাঠ হয়ত রয়েছে এক প্রজাতন্ত্রে, অথচ তা বিবেচিত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্রের অঞ্চল হিসেবে। মানচিত্রেও তাকে সেইভাবেই দেখান হচ্ছে। সমাজতন্ত্রে পড়শী প্রজাতন্ত্রের মধ্যে

বিরোধের অস্তিত্ব নেই। সে জন্য বহুকাল উজবেক অধ্যুষিত শাহিমর্দন মধ্য এশিয়ার জাতীয় সীমারেখা ঠিক করার সময় উজবেক অঞ্চলের মধ্যে এসে গেছে। এই ভাবে ভৌগোলিক মানচিত্রে শাহিমর্দন স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে সোভিয়েত জাতীয় নীতি কি জিনিস।

আগে শাহিমর্দন (মানুষের রাজা) বিখ্যাত ছিল মহম্মদের ভাগ্নে আলি খলিফার কবরের জন্য। কিন্তু বর্তমানে শাহিমর্দনের খ্যাতি কবর ছেড়ে গেছে নূতন স্বাস্থ্য নিবাসে। এখানে বিশবছর আগে একটি লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। তার থেকে এটি বেশী দূরে নয়। ইনি হলেন 'কবি সম্রাট' হম্‌জ, বিপ্লবের অগ্নিপ্রাণ অগ্রদূত। ইনি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বদেশকে বিদ্যালয়ে ছেয়ে দেবার। উজবেকিস্তানে এঁর স্মৃতি পবিত্র।

হম্‌জ হাকিমজাদে নিয়াজি ছিলেন কবি, গদ্য লেখক, সুরকার ও নাট্যকার। ১৯১১ সালে দরিদ্র উজবেক সন্তানদের জন্য কোকন্দে তিনি একটি অবৈতনিক স্কুল খোলেন। প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা তাঁর বিরুদ্ধে নিরীশ্বরবাদ ও স্বাধীন চিন্তার অভিযোগ আনে। স্কুল বন্ধ করে দেয়, তাঁকে নির্বাসিত করে কোকন্দ থেকে। হম্‌জ ন্যায়ের সন্ধানে তুরস্ক, আরব, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু সব জায়গাতেই তিনি দেখতে পান কোটি কোটি লোকের ঐ একই সাঙ্ঘাতিক দুর্দশা। তারা বানায় অপূর্ব রাজপ্রাসাদ আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র আর সাটিন তবু নিজেরা থাকে মাটির খোঁদলে, জরাজীর্ণ নলখাগড়ার কুটিরে আর পরে ছেঁড়া নেকড়া।

কোকন্দে ফিরে অনাথদের জন্য হম্‌জ আবার স্কুল খোলেন, কিন্তু আবার সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে মারগেলানে তিনি একটি স্কুল করেন কিন্তু সেটিও বন্ধ হয়। এমন একটি লোক তিনি যাকে যথার্থই বলা চলে, 'মানুষের রাজা'। শিক্ষাদানের বিভ্রান্তি দূর হল তাঁর, তিনি উপলব্ধি করলেন উজবেক মেহনতী জনতা ও রুশ শ্রমিকদের একই পথ অনুসরণ করতে হবে—অর্থাৎ জারের শাসন ও স্থানীয় মধ্যযুগীয় জমিদার ও বাইদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। রুশ বল্‌শেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মহান অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য তিনি শ্রমজীবী মুসলমানদের সোভিয়েত গড়তে লাগলেন। বিপ্লব সুরু হলে তিনি আবেগময়ী কবিতায় তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বিপ্লবের পর হম্‌জ'র বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ এল। তিনি প্রথম নাট্য দল গঠন করলেন, এর জন্য নাটক লিখলেন এবং গৃহযুদ্ধের সময় মধ্য এশিয়ার রণাঙ্গনে নিজেও উক্ত দলের সদস্য হিসেবে অভিনয় করতে লাগলেন। তিনি সাংস্কৃতিক ক্লাব খোলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুলের প্রবর্তন করেন এবং প্রথম পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করেন। তাঁরই

নেতৃত্বে নূতন খাল নির্মাণ শুরু হয়। জনপ্রিয় নেতা ও সংগঠক হিসেবে সম্ভবত অন্য কোন কবির চাইতে মায়াকভ্‌স্কির সাথেই তাঁর মিল ছিল। তিনি ছিলেন বিপ্লবী এবং যা কিছু করতেন তাতেই পাওয়া যেত নূতন কিছুর আভাস।

কেবল কবিতাতেই নয়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তিনি উজবেক শিল্পের ঐতিহ্যকে সাহসের সঙ্গে বদলালেন। যখন তিনি রুশ সঙ্গীত স্কুলে ঢোকেন তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। তিনিই প্রথম উজবেক সুরকার যিনি ব্যবহার করেন পিয়ানো এবং চাপা গলায় গান করার প্রাচ্য রীতির ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনিই প্রথম উজবেকদের শেখান দাঁড়িয়ে গান গাইতে এবং সবপ্রথম চাঙ ও গিজাককে সুনিপুণ করার কাজে লাগেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনিই প্রথম রচনা করেন উজবেকদের বিপ্লবী গানগুলো। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উজবেক জনতা সে গানগুলোকে গ্রহণ করে।

হম্‌জ'র প্রতিটি পদ ছিল পুরাতন জীবন ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। নূতন সাম্যবাদী সত্যকে জয়যুক্ত করার জন্য বাই এবং অন্যান্য যা কিছু উৎখাত করা দরকার তার জন্য লড়াই তিনি করেছেন। এবং যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল, যা কিছু পুরাতন, ক্ষয়ে যাওয়া ও অচল তাঁর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হল। ১৯২৯ সালের ৮ই মার্চ হম্‌জ মেয়েদের এক সভা ডাকেন। এটা শাহিমর্দানে মেয়েদের প্রথম সভা। এ সভায় কিশলাকের তেইশজন মেয়ে তাদের পারানজা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দশদিন বাদে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের প্ররোচনায় একদল ক্রুদ্ধ মোল্লা নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করে।

পুরোনো আমলের লোকেরা এ সব কথা জানে। কিন্তু যারা হম্‌জকে জানত এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করেছে তারা যখন এ সব কাহিনী বলে তখন তরুণদের মনে হয় এ সব কাহিনী চেঙ্গিস খাঁর সময়ের কাছাকাছি, তাদের যুগের নয়। এই সব তরুণ তরুণীর জীবনে প্রতিটি বছর এক এক দশকের মত, এত দ্রুত এগিয়ে গেছে সমাজতন্ত্রী উজবেকিস্তান। দেখা যাক শাহিমর্দানের নূতন দশসালা স্কুলটিকে। এর শিক্ষকরা বহু বছর আগে হম্‌জ'র খোলা প্রথম স্কুলে পড়াশুনো করেছেন। ক্লাসঘরে সজীব ছেলেমেয়ের দিকে তাকালে, তাদের গলায় পাইওনিয়ারের টাইগুলি দেখলে, তাদের আনন্দময় মুখের দিকে চাইলে উপলব্ধি করা যায় সোভিয়েত রাষ্ট্র উজবেক শিশুদের জন্য কতখানি করেছেন।

যখন কাজের পর ক্লাব ও স্কুলের অপেশাদারী দল ও খেয়ালী চক্রেরা মিলিত হয়, প্রজাতন্ত্রের যে কোন জায়গার মতো এই শাহিমর্দানেও দেখা যায় সেই একই দৃশ্য। এই দলে আছে চঞ্চল উজ্জ্বল চোখ ছোট্ট বিমান নির্মাতা কিংবা চল্লিশটি বিনুনী বাঁধা ছোট্ট উজবেক

মেয়ে। সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে মাছের কাঁচের পাত্রে। দেখা যাবে ক্ষুদে শিল্পীদের যারা ছবি আঁকা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নাকেই রঙ লেপ্টে ফেলে। তাদের আঁকা ছবি দেখা যাবে দেয়ালে। কারও রেখা অতিরিক্ত বলিষ্ঠ, কারও বা দুর্বল, কিন্তু সবগুলিই বর্ণোজ্জ্বল — অদ্ভুত সব প্রাসাদ, স্টীমার, লাল তারা খচিত বিমান। দেখা যাবে তরুণ নক্সাকারী, ফটোগ্রাফার, বেহালাবাদক, দাবা খেলোয়াড় ব্যায়ামকারীদের। উজবেকিস্তানের প্রতিটি স্কুলই হম্‌জ'র স্মৃতিস্তম্ভ।

শাহিমর্দন নিজেই উজবেক বিপ্লবী কবির স্মৃতিস্তম্ভে পরিণত। এর বর্তমান নাম হম্‌জাবাদ। উজবেকিস্তানের শ্রেষ্ঠ স্থপতিরা কবির সমাধিমন্দির গড়েছেন। যেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল সেই গ্রামের মাঝখানে এটি দাঁড়িয়ে। হম্‌জ'র নামে স্বাস্থ্য নিবাসের যে সুন্দর ভবনটি তৈরী হয়েছে তারই কাছে মিশেছে দুটি খরস্রোতা ছোট্ট নদীর স্বচ্ছ জল। যে সামগ্রিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে আগামী কয়েক বছরে হম্‌জাবাদে নতুন স্বাস্থ্য নিবাসের বাড়িগুলো, একটি হোটেল, পাঠাগার নিয়ে বিরাট গ্রন্থালয় তৈরী হবে। এখানে রাখা হবে হম্‌জ'র পাণ্ডুলিপি, তৈরী হবে ফোয়ারাসহ একটি পাথরের সিঁড়ি, বিশ্রামের জন্য মণ্ডপ ও কুঞ্জবন।

হম্‌জাবাদ উজবেকদের অবসর যাপনের প্রিয় কেন্দ্র। ছুটি উপভোগকারীরা আসে তাসখন্দ, সমরকন্দ বা উরগঞ্জ থেকে, তারা চায় শাহিমর্দনের রোদ আর পাহাড়ী বাতাস আর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার সুফল লাভ করতে, স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে হম্‌জ'র একখানা বই নিয়ে কাছেপিঠে কোথাও ঘুরে বেড়ানো এদের পছন্দ। কখনও তারা যায় করাতের মত দাঁতওয়ালা পাহাড়ের সানুদেশে একটি সবুজ-কালো আরচা কুঞ্জবনে কিংবা কাছাকাছি হ্রদ কুলি কুব্বানে। মসৃণ পাহাড়ের বুকে এর নীল জল চক্‌ চক্‌ করছে।

৬। উপত্যকার উপর ধোঁয়া

রেলপথে পরের বড় সহর হল আন্দিজান।

আন্দিজান ফেরঘানা উপত্যকার সবচাইতে বড় সহর এবং সবচেয়ে বড় শ্রমশিল্প কেন্দ্র। মোটামুটি দেখতে হলে উঠতে হবে মহম্মদ আলির মিনার চূড়ায় পাথরে-গড়া একটি খাড়া ও চক্রাকার সিঁড়ি বেয়ে। উপরে, গম্বুজের নীচে লোহার বেড়া দেওয়া একটি গোল প্লাটফর্ম।



'লাল উজবেকিস্তান' যৌথখামারের গবেষণাগারে।



বড় ফেরঘানা খাল।

জালাই তাউ পর্বতমালায় সুউচ্চ চারণভূমিতে একটি স্থানীয় উন্নত জাতের মেষশাবকদের এই ছবি তোলা হয়।



ঘনসন্নিবিষ্ট সমতল ছাদ, মৌচাকের মত ছোট্ট উঠোনের কালো চত্বর, তাতে ছায়া ফেলেছে গাছের ঝাড়। কাছে ডগবগ পুকুরের মত বর্ণ বিচিত্র জনতা যৌথখামার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবসর বিনোদনের পার্কটি বহুদূর ছড়ানো, সবুজ পাতার ভিতর দিয়ে নজরে পড়ে সাদা মূর্তিগুলি। সুবেশ লোকেরা চলেছে পার্কের পথে। ভলিবলের জালের উপর দিয়ে একটা বল লাফিয়ে উঠছে। দূরে চক চক করছে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাড়ির ছাদগুলো। ওখানকার রাস্তায় লম্বার্ডি পপলারের সারি, দূর থেকে তাদের মাথাগুলো দেখে মনে হয় ছাদের ভিতর দিয়ে ওরা যেন গাছের সারিওয়ালা রাস্তা বানিয়েছে। সহরের নির্মাণ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক জোড়-লাগানো যন্ত্রের কম্পমান ঝলক। উজ্জ্বল রোদে থাকলেও সে আলো পরিষ্কার দেখা যায়। আর যে দিকেই তাকান যায় নজরে পড়ে মিল আর কারখানা।

বিরাট এক শিবিরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত আন্দিজানের উপরে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধোঁয়া উঠছে কারখানার ইঁট-গাঁথা চিমনী থেকে, ধাবমান রেলগাড়ির পিছনে সে ধোঁয়া ছড়িয়ে যাচ্ছে; কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া আসছে বাড়ির স্টোভ আর উঠোনের উনুন থেকে। বাতাসের ঝাপটায় ধোঁয়ার মেঘ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেলেও সহরের আকাশে সৃষ্টি করছে হাল্কা বেগুনী রঙের কুয়াসা।

উপর থেকে সহরের পরিদৃশ্য দেখলে আধুনিক এক উজবেক সঙ্গীতের কথা মনে পড়ে যায়: 'এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এমন যে বাতাস সেও এর উপর দিয়ে উড়ে যেতে ভুলে যায়।' বিশেষ করে দৃশ্যটি মনোমুগ্ধকর ভোরের বেলায়, যখন তুলো-বোঝাই লরিগুলো সহরে এসে মিশে-যাওয়া রাস্তা বেয়ে ছুটে চলে। এরা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় অন্যান্য জিনিসের চাইতে তুলোর জন্যে সহর এত কর্মচঞ্চল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য যে কোন জায়গার চাইতে আন্দিজান অঞ্চলে বেশী 'সাদা সোনা' উৎপন্ন হয়। ফেরঘানা তুলো অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্র এই আন্দিজান সহর। আন্দিজানের বৃহৎ ও আধুনিক কারখানাগুলিতে তৈরী হয় ডিজেল ইঞ্জিন ও সেচের জন্য পাম্প, বিদে যন্ত্রের তীক্ষ্ণধার চাকা, খামার যন্ত্রপাতি, যান্ত্রিক ট্যাম্পার তথা এক্সকাভেটরের খুচরো অংশ। মোটর মেরামত কারখানায় খারাপ হয়ে যাওয়া ট্র্যাক্টর ও তুলো কাটাই যন্ত্র ঠিক করা হয়।

নীচে রাস্তা দিয়ে থেকে থেকে চলে যায় তরিতরকারী ও ফল বোঝাই লরি। ফলের এত সৌরভ যে লরি চলে যাবার মিনিটখানেক বাদে সে সুগন্ধ মিনার চূড়ায় ভেসে আসে। লরি হয়ত ভিড়বে সহরের নূতন শ্রমিক বসতির অথবা কোন ফলতরকারীর দোকানে বা আন্দিজান টিনে ভর্তি তরকারী ও ফলের কলের চওড়া উঠোনে। সহরে অন্যান্য বড় বড়

কারখানা আছে। নতুন কল, পলিক্লিনিক, সিনেমা, ক্লাব ও 'শত জানালার' বাসভবনের পাড়া ছাড়াও আরও বাড়ি ঘর তৈরী হচ্ছে।

মহম্মদ আলি মিনার থেকে দেখা সহরের পরিদৃশ্য পেরিয়ে চোখ পড়ে ফেরঘানা উপত্যকার মহান দৃশ্যপটে। একদিকে উপত্যকা মিলিয়ে গেছে দূরান্তরে। মাঝে মাঝে ফলন্ত মাঠ আর গ্রামের চাদর। আর এক দিকে উপত্যকা উঠেছে খাড়া হয়ে, যেন ওকে নজরে পড়ছে পাক-খাওয়া বিমানের কেবিন থেকে। দিগন্তের ধূকে দূরবর্তী পাহাড়ের চূড়াগুলো মনে হয় চিনির তালের মত।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবী যখন বেড়ে উঠে আকার নিতে সুরু করে আর মধ্য এশিয়াকে ছেয়ে থাকা প্যালেওজোয়েক সমুদ্র সরে যায় তখন সাগর ফেরঘানা অঞ্চলে থেকে যায়। সেই সাগরতীরের গরম স্যাঁতস্যাঁতে বাতাসে যুরাসিক যুগে জন্ম নেয় বিশাল ফার্ণ ও অশ্বপুচ্ছ গাছের দল। যে কারণে ভূমিকম্প হয় সেই মাটির স্তরগঠনের ফলে ফেরঘানা সহরের চারদিকে পাহাড়গুলি ক্রমশ উঁচু থেকে আরও উঁচু হতে থাকে। ভূগর্ভ থেকে ক্রমশ প্রকাশ পায় এরই তলায় চাপা-পড়া মাটির সঙ্গে মেশান মহার্ঘ ধাতু সম্পদ। একদিন যেখানে সমুদ্র ছিল আজ সেখানে ফেরঘানা গহ্বরের চারপাশে পাহাড়। এরই সানুদেশে ধাতু ও কয়লা স্তর তথা চুনা পাথর আর যেখানে ছিল সাগর — তেল, গন্ধক ও ওজোসেরাইট (পাহাড়ী মোম) দেখে পৃথিবীর সেই সব পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

ফেরঘানার ধাতুগুলিকে কাজে লাগাবার জন্য গত দু'হাজার বছরে যে শ্রমশিল্প গড়ে ওঠে তাতে দেখা যায় কয়েকটি পরিত্যক্ত লোহার খনি। এখানে লোহার কারবারীরা তাদের প্রাচীন ব্যবসা চালাত। এ ছাড়া ছিল দুটো ক্ষুদে তেল ক্ষেত্র আর সেকেলে দুটো কয়লাখনি। বিপ্লবের সামান্য আগে রুশ ব্যবসায়ীরা এদের চালাত লুঠেরা মনোভাব নিয়ে, কেবল গত পঁচিশ বছরে ... কিন্তু আগে আমার অন্য কিছু বলা উচিত।

ফেরঘানা উপত্যকার চারদিকের পাহাড়ে যে সব কিরগিজ রাখালরা গরু চরায় তারা মাথায় পরে কিনার চওড়া লোমের টুপি। সাধারণত উজবেক তুবেতেইকার উপর ওরা এগুলি ব্যবহার করে। টুপি খুললে তুবেতেইকাও ওরা খুলে ফেলে। কিরগিজিয়ার পাহাড়গুলি মাথা তুলেছে মাটির উপর উল্টনো কিরগিজ টুপির লোমের মতো আর এই পাহাড়ের বুকে ফেরঘানা গহ্বর যেন টুপির নীচে তুবেতেইকার মতো। পাহাড় যে সম্পদ ফেরঘানাকে উজাড় করে দিয়েছে তার অবস্থান কিরগিজিয়ায় আর সমুদ্রের যে উত্তরাধিকার তা হল উজবেকিস্তানে। কিন্তু দুটি রাষ্ট্রের ভেতর অর্থনৈতিক বিরোধের কোন হেতু নেই। উপত্যকার অর্থসম্পদকে একত্রে পরিচালনা করা বেশী সুবিধেজনক ও লাভকর। এ

কারণে একটি অর্থনৈতিক সংস্থার মতো কিরগিজিয়া ও উজবেকিস্তানের খনিশিল্প একই সঙ্গে নির্বিবাদে পরিচালিত হচ্ছে, কিরগিজিয়া টুপি ও উজবেক তুবেতেইকা যেমন একই মাথায় শান্তিতে থাকে।

ফেরঘানা রেলের ছোট ও বড় লাইনগুলো পাহাড়ের ঢালু জায়গার দিকে চলেছে। ওখানে আছে কিরগিজিয়ার বৃহৎ কয়লাখনি অঞ্চল: তাসকুমির, কাকিয়ানগাক ও কিজিল্‌কিয়া আর শুরাব তাজিকিস্তানের কয়লা অঞ্চল। এই শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য অংশে কিরগিজ প্রজাতন্ত্রে উচিমচাক আরসেনিক খনি, হাইদারখান ও কাদামজান এণ্টিমনি, ফ্লুয়রস্পার ও পারদ খনি। কিজিল্‌কিয়া কারখানায় তৈরী হয় পাথর ও মাটির জিনিস, দেয়াল ও মেঝের টাইল এবং ঢালাই কাজের ঝামা ইঁট। উজবেক অঞ্চলে আছে কুভাসাই ছাড়াও শোরসু সহর। এখানে গন্ধক ও ওজোসেরাইটের বড় এক খনি পাওয়া গেছে। এগুলি হল বহুবিচিত্র খনি ও মিলের ক্রমিক শ্রেণীর প্রথম অংশ। ফেরঘানায় ভূতত্ত্ববিদ্‌দের আবিষ্কৃত ধাতুর স্তর যখন কাজে লাগানো হবে তখন খনি আর কারখানায় উপত্যকা ছেয়ে যাবে।

এরই মাঝখানে উজবেকিস্তানে সাদা-চূড়া ঢেউয়ের বিস্তৃত সবুজ সমুদ্রের মতো তুলোর ক্ষেত। এরই মাঝখানে দ্বীপের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিল্প সহর ছাড়াও আছে ফেরঘানা উপত্যকার তেল খনি। প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য অঞ্চলেও তেল আছে, কিন্তু ফেরঘানাই হল উজবেকিস্তানের প্রধান তেল উৎপাদক। উপত্যকার এখানে ওখানে তেল খনির পাশে পাশে বহু শ্রমিকের বসতি গড়ে উঠেছে। আন্দিজানের কাছাকাছি এমনকি তেল খনিকদের সহর লেনিন্‌স্ক।

লেনিন্‌স্কের সঙ্গে ইয়াঙ্গি য়ুলের কথা মনে পড়ে যায়, কারণ একসময় এটাও ছিল লোকালয়ের বাইরে এক কিশলাক। এখানেও চোখে পড়ে নূতন দোতলা বাড়ির সারির মাঝখানে দেখানের পুরোনো মাটির ঘর; এখানেও কয়েকটি নূতন কারখানা আছে। ফেরঘানা উপত্যকার সম্ভবত সব চাইতে সুন্দর পার্কটি ছড়িয়ে আছে শারিখানের উঁচু পাড়ে। এর পর একটি খেলাধুলোর স্ট্যাডিয়াম। রাতের বেলা সহরের তিনটি সিনেমায় লোকেরা ভীড় জমায়।

লেনিন্‌স্কের কাছে আছে ফেরঘানার দুটি বৃহত্তম তেল খনি 'পালভানতাশ' ও 'আন্দিজান'। লেনিনস্ক থেকে পালভানতাশের দিকে এগুলে চোখের সামনে ক্রমশ ভেসে ওঠে ধূসর পাহাড়ের মধ্যে একটি সাদা সহর। সহরের উপর মাথা তুলেছে তেলোত্তলক

যন্ত্রের চূড়া। আজকের উজবেকিস্তানে সুপরিচিত ড্রিলিং মিস্ত্রী প্রিমকুল তাশপুলাতভ এখানকার অন্যতম প্রথম বাসিন্দা।

এক গ্রীষ্মের রাতে ড্রিলগর্তের কাছে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। অশরীরী উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় তেলোত্তলক যন্ত্রগুলি প্লাবিত। বাতাস কোমল ও পরিস্কার। দিনের বেলা তেল থেকে পোড়া গন্ধ বার হয়, কিন্তু রাতে গন্ধটা মনে হচ্ছিল মশলার মত প্রীতিকর। আমাদের চারদিকে ঝিঁঝির তীব্র আওয়াজ মিশে যাচ্ছে সামান্য শুনতে পাওয়া পাম্পের শব্দের সঙ্গে, তাদের পটভূমিকায় রটারের মৃদু গুঞ্জন বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

লেনিনস্কে জেলা পার্টি কমিটির ডাকা এক সভার কথা তাশপুলাতভ আমাকে উৎসাহের সঙ্গে বলতে সুরু করল। ফোরম্যান ও সমাজতন্ত্রী শ্রম বীর উপাধিধারী পাভেল স্ত্রিমভ ও প্রজাতন্ত্রে সুপরিচিত ড্রিলিং মিস্ত্রী আর্তিক খালিলভের সঙ্গে সে এ সভায় যোগ দিয়েছিল। তেল কূপের দ্রুত খননের জন্য কী কী ব্যবস্থা করা চলে তারই আলোচনা করেন এঁরা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল।

'বিশ বছর আগে আমি যখন তেল খনিতে আসি,' একটু থেমে মৃদু হেসে শুরু করল, 'ওরা আমাকে একটা ড্রিলের গর্ত দেখিয়ে বলে ওর ভেতর থেকে তেল উঠে আসবে। ভেবেছিলাম ওরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। মনে মনে বললাম মাটির ভিতর কী আছে লোকে তা কী করে বলবে? কিন্তু এখন...'

হেসে সে হাত বাড়াল। পালভানতাশের যে কোন তেল কর্মী তাশপুলাতভের না বলা কথা বলে দিতে পারে: তরুণ হলেও ড্রিলিং বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং মাটির তলার মেরামত কাজে সে বিশেষজ্ঞ অন্যান্য শত শত উজবেকের মত, আজ সে জানে কী ভাবে 'মাটির নীচ পর্যন্ত দেখতে হয়'। যেমনি রটারের শব্দ শোনে অমনি তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলে দেয় অতল গভীরে কোন জিনিস কী অবস্থায় আছে। উজবেকরা সমস্ত আধুনিক শিল্প কৌশল আয়ত্ত করেছে।

পালভানতাশে যাবার দু'বছর বাদে বেতারযন্ত্র মারফৎ জানতে পারি ফেরঘানা উপত্যকার তেল খনিতে রটারি ড্রিলিংয়ের বদলে টারবাইন ড্রিলিং সুরু হয়েছে। এটা আরও ফলপ্রদ। উজবেকরা এই নূতন ইঞ্জিনিয়ারিংও আয়ত্ত করেছে।

লেনিনস্কের কাছে আসাকে রেল স্টেশনে একটি পাম্প কল বসেছে। পাইপের ভিতর দিয়ে ফেরঘানার বাদামী রঙের তেল তেল-খনি থেকে আসাকে চালান যায় আর আসাকেতে আবার পাম্প করে এগুলিকে তেলবাহী গাড়িতে ভর্তি করা হয়। আর একটি পাইপ

লাইনে লেনিনস্কের তেল যায় ভান্নভস্কি শোধনাগারে। এটি উজবেকিস্তানের সব চাইতে পুরোনো শোধনাগার।

কিন্তু লেনিনস্কবাসীদের সব চাইতে বড় গর্ব হল তাদের গ্যাসবাহী নল। লেনিনস্ক তেল খনি গ্যাসও বানায়। গ্যাস তেলের সহোদর। বহুদিন ধরে আন্দিজান ও লেনিনস্কের শ্রমিকগৃহে গ্যাস চুল্লি একটা সাধারণ জিনিস। তা ছাড়া আশেপাশের বহু যৌথখামারে গ্যাস এখন নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার হয়। রান্নাঘরে, যৌথখামারের কামার-শালায়, স্নানাগারে, তুলো শুকাবার কাজে ও ইঁটের ভাটিতে গ্যাস চালু হয়েছে।

৭। একটি যৌথখামারের বাজার

তেরটি চাখানার কার্পেট-মোড়া প্লাটফর্ম একটি মাত্র নলখাগড়ার ছাদ দিয়ে ঢাকা। বহু বিচিত্র পোষাকে চাখানা রংদার হয়ে উঠেছে — ডোরাকাটা আলখাল্লা আর তুবেতেইকা থেকে সুরু করে শ্রমিকদের জামা পর্যন্ত। ফুলের নক্সা-আঁকা ট্রে, চাপাত্র আর চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে, শোনা যাচ্ছে গমগমে জনতার গুঞ্জন। এই একই ছাদের নীচে শীতল অন্ধকারে চাখানাগুলির মাঝখানে আঙুর, পীচফল, আপেল, পিয়ার, প্লাম, ডালিম, তরমুজ ও ফুটির সুগন্ধী উঁচু স্তূপ। এ ছাড়া আছে টমেটো, লঙ্কা, বেগুনগাছ, শশা, বাঁধাকপি, মিষ্টি সাদা ও তিক্ত হলুদ পেঁয়াজ ও পোলাওয়ের উপযুক্ত কুচি করা হলদে গাজরের রঙীন পাহাড়। রয়েছে চুপড়ি বোঝাই শুকনো খুবানী, বীচি সুদ্ধ ও বীচি ছাড়া কিশমিশ, শুকনো পীচ ও ফুটি, আখরোট, আমন্ড ও পেস্তা। জগগুলো দুধ, কৌমিস, আইরান, সুজমা ও কাতিকে ভর্তি। আর আছে যমানিকা ও তিল বীজের সঙ্গে তৈরী বিভিন্ন আকৃতি ও নক্সার বার রকমের মিষ্টি গন্ধযুক্ত চ্যাপ্টা রুটি। এই হল আন্দিজানের উজুম-বাজারের (আঙুর বাজার) চেহারা।

কাছাকাছি আন্দিজানের প্রধান যৌথখামার বাজার, এখানে মাটির দেয়াল ঘেরা বিভিন্ন চত্বরে উঠেছে যৌথখামারের দোকানঘর, চালা ও ভোজনাগার। এগুলি উজবেকিস্তানের অন্যান্য সহরে বাজারেরই মত। লরি ভর্তি রঙীন ফল ও তরিতরকারী ছাড়াও আছে দুধ বোঝাই জালা, চওড়া ঝুড়ি-ভর্তি চ্যাপ্টা রুটি, থলে বোঝাই চাউল (সাদা ও গোলাপী) গম, বার্লি, জোয়ার, আলু, কলাই, মটর এবং মসুরের মত স্বাদ একধরনের মটর, এর নাম মাস।

'মিষ্টির দোকানের' গৌরব শুধু বিভিন্ন ধরনের কারখানায় তৈরী মিষ্টি কেক ও মোরগের মতো লজেন্সে নয়। উজবেক কারিগরদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের গড়া সব রকমের মিঠাই এখানে সাজানো। এখানে পাওয়া যাবে আঙুরের রস, মধু, ভেড়ার চর্বি ও বাদামের তৈরী বহু রকমের হালুয়া, ময়দার তৈরী মিষ্টি দেখতে না-মাজা সুতোর ফেটির মত আর বিখ্যাত চিনির নিসালদা। একটা কালো পাত্রের ভিতর বিশেষ ধরনের একটা কাঠ দিয়ে বিক্রেতারা এগুলিকে ফেনিয়ে তোলে। দেখা যায় স্বচ্ছ মিছরির তৈরী মিঠাই, দেখতে পার্বত্য স্ফটিকের তালের মত। কাছে পিঠেই এগুলোকে বানাতে দেখা যায়: উনুনের উপর বসানো গোল পাত্রের ভিতর আড়াআড়িভাবে সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তার পর তরল চিনির সার তাদের উপর যেমন ঢালা হতে থাকে, ঠান্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি দড়ির সঙ্গে জমাট বেঁধে যায়।

মাংসের দোকানে গরু ও ভেড়ার চমৎকার টাটকা মাংস ঝোলানো। শিকারী বিক্রি করতে আনে পাহাড়ী কেকলিক, ফেজ্যান্ট কিংবা মধ্য এশিয়ায় ছোট্ট খরগোশ। পুরোনো বই বিক্রেতা একখানা কম্বলের উপর বইগুলোকে ছড়িয়ে বসেছে। পাঠ্যপুস্তক ও আধুনিক গল্পের বই ছাড়াও এর ভিতর হয়ত পাওয়া যাবে কোন পুরাতন প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি। গ্রামোফোন রেকর্ড বিক্রেতার চারপাশে সর্বদা ফুর্তিবাজ মানুষের জটলা। একপাশে লাল লংকার ছোট ছোট স্তূপ আর সেই সঙ্গে নীল, গাঢ় সবুজ তামাকের তাল এবং গিরিমাটি, সুর্মা, মেদী গাছ, বাসমা ও অন্যান্য রঙের পিরামিড রঙের জেল্লায় এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। হস্তশিল্পী সমবায় প্রতিষ্ঠানের দোকানগুলিতে সরু গলা জগ ও চকচকে প্রলেপ লাগান মাটির থালা, রেশমী বেল্ট ও বিখ্যাত আইওম স্যাটিন, উজবেক বাজনা ও ঘোড়ার সাজ সাজানো। রাষ্ট্রের নিজস্ব দোকানগুলিতে কলে তৈরী যাবতীয় জিনিসের ভীড়, কাপড় থেকে সুরু করে এলুমিনিয়াম পাত্র ও বেতারযন্ত্র সবকিছুই আছে। যৌথখামারীদের কাছে এ সব বেতার যন্ত্রের খুবই চাহিদা। যৌথখামারের অসংখ্য লরির মাঝখানে শুয়ে একটা নিরালা উট কান্না জুড়েছে। ভেড়াগুলো জটলা পাকিয়ে আছে, পাছে হারিয়ে যায় এ জন্য মাথায় বাঁধা জোড়ায় জোড়ায়। যৌথখামারী ও সহুরে লোকের এই রঙীন ভীড়ে এখানে ওখানে নজরে পড়বে পিঠের উপর থলি নিয়ে মন্থরগতিতে চলেছে গাধা। ক্লভার বা লুসার্ণের আঁটি কিংবা শুষ্ক ডালের বোঝা এত বড় যে জন্তুগুলোর নাকমুখ আর ছোট্ট পা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

খাবার ঘরের কাছে লোকের গিসগিস ভীড়, বাতাসে তিলতৈল আর ভেড়ার চর্বির উগ্রগন্ধ নেশা ধরিয়ে দেয়। খাবার ঘরের সামনে ছোট টেবিলে উজবেক বাচ্চাদের প্রিয়

খাদ্য, লাল লঙ্কার গ‍ুঁড়ো ও পেঁয়াজের সাদা গোল চাকতি ছড়ানো পেয়ালা ভর্তি সেদ্ধ করা মটর থেকে ধোঁয়া উঠছে। কাছেই ছোট ছোট সামসা প‍ুরে — ভেড়ার মাংস ও পেঁয়াজ ভর্তি কোপ্তা ভাজা হচ্ছে তন্দ‍ুরায় (মাটি ও পশম মিশিয়ে বানানো এক ধরনের উন‍ুন)। কোপ্তাগ‍ুলোকে উন‍ুনের ভিতরের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। চাখানার মতো খাবার ঘরের প্লাটফর্মও পালাস বা কার্পেট দিয়ে মোড়া। প্লাটফর্মের এক ধারে, ছাদ ঠেকো-দেওয়া কাঠের থামগ‍ুলির মধ্যে এক বাব‍ুর্চি সর‍ু পাত্রের উপর জ্বলন্ত কয়লায় বাতাস দেওয়ার জন্য ছোট্ট বেলচেখানাকে নাড়ছে। মাংস ঢোকানো ছোট ছোট লোহার শলা আগ‍ুনের উপর একবার এ পাশে একবার ও পাশে ঘ‍ুরিয়ে শিক-কাবাব বানাচ্ছে। এখানে আরও মিলবে স‍ুরপা — ভেড়ার মাংস, মটরশ‍ুঁটি ও অন্যান্য তরিতরকারী মেশানো সোনালী রঙের স‍ুপ, স‍ুগন্ধী পত্রম‍ূল দিয়ে রান্না করা এছাড়া আছে বিভিন্ন খাবার ও বিখ্যাত পোলাও। পোলাও তৈরীর ওস্তাদিকে উজবেকিস্তানে এত তারিফ করা হয় যে এই সব ওস্তাদদের নাম তাদের সহরে শ‍ুধ‍ু নয়, বহ‍ু দ‍ূরে ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দিজান বাজারে চীনা তুর্কিস্তানের সিনকিয়াঙের প‍ুরান অধিবাসী উইঘ‍ুরদের পরিচালিত ভোজনালয়ও আছে। এদের রান্না খেলে চীনা পাক প্রণালীর কথা মনে পড়ে। ময়দার তৈরী খাবারে এদের অসাধারণ বৈচিত্র্য। মসলাহীন ও মসলাদার রান্নার স্পষ্ট পার্থক্য, এর বিশেষ স্বাদ ও গন্ধ টের পাওয়া যায়।

যৌথখামারের বাজার বর্ণবহ‍ুল, বিশিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক। এর সঙ্গে পঁচিশ বছর আগেকার বাজারের কোন মিল নেই। তখন বাজার ছিল প‍ৃথিবীর কেন্দ্রস্থল, মধ্য এশিয়ার সামন্ত সহরগ‍ুলির প্রধান স্নায়‍ু-কেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে উজবেকিস্তানের সহরগ‍ুলি ঠিক সহরের মত বেড়ে গড়ে ওঠেনি। গড়ে ওঠে বড় বড় বাজারের মতো, তার চারপাশে ধীরে ধীরে ঘেরে মাটির ডেরা, উঠোন আর সর‍ু গলি।

সব প্রথমেই যা বিদায় নেয় তা হল আগ‍ুন বেচার দল। এরা জ্বলন্ত কয়লার ভাড় নিয়ে ঘ‍ুরে বেড়াত। এটা ঘটে বিপ্লবের আগেই। দেশলাই বাজারে আসতে এদের ব্যবসা বন্ধ হয়। বিপ্লবের পর প্রথম যা অদ‍ৃশ্য হয় তা হল টোটকা বিক্রেতা। এর বদলে দেখা দেয় আধ‍ুনিক ওষ‍ুধের দোকান, তাদের জানালার ভিতর শোভা পেতে থাকে রঙীন কাচের গোলক। বড় বড় সাঁড়াশি নিয়ে ঘ‍ুরে বেড়ানো দাঁত তোলার লোকও বিদায় নিতে বাধ্য হল। ঐ একই দশা হল বাজারে নাপিতদের, যারা যে কোন অস‍ুখে লোকদের রক্ত বার করে ছাড়ত। হাড় জোড়া দেবার লোক ও হাতুড়ে বদ্যিরও ঐ দশা। এদের বদলে এল চিকিৎসক। অবৈতনিক জেলা হাসপাতালে রোগীদের এরা দেখত। ঘাড়ে আটকানো ফিতের সঙ্গে দোয়াত ঝুলিয়ে

যে সব চিঠি লিখিয়ের দল বাজারের মোড়ে বসে থাকত তাদেরও বিদায় নিতে হল, কারণ লোকেরা নিজেই তাদের চিঠি লিখতে ও পড়তে শিখল। বাজার ঘোষণাকারীর কাজ ছিল রাজ্য ও সহরের সংবাদ বলা। সংবাদপত্র ও রেডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে তারাও অদৃশ্য হল।

এখনও শোনা যায় বাজারের চাখানায় বসে লোক সঙ্গীত গাইয়ে তার দোতারা বা খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইছে। কিন্তু আজকাল সব চাইতে নামজাদা গাইয়েরা কনসার্ট, থিয়েটার বা ক্লাবে গান করে থাকে। প্রত্যেকটি সহরেই এখন আছে অন্তত একটি করে থিয়েটার। বাজারের খাবার ঘরের সঙ্গে এখন দেখা দিয়েছে রেস্তোরাঁ ও গণ ভোজনাগার। আগেকার দিনের বাজার ছোট হতে হতে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে, অর্থাৎ ওখানে এখন উজবেক যৌথখামারী ও কারিগররা তাদের তৈরী জিনিস বিক্রি করে এবং রাষ্ট্রের চাকরিতে উজবেক রাধুনি তার তৈরী খাবার লোকদের পরিবেশন করে।

নূতন সমাজতন্ত্রী সহরে যৌথখামার বাজারের একটা নিজস্ব স্থান আছে। সামান্য হলেও তা সুদৃঢ়। তাদের যা কিছু বন্দোবস্ত তার দিকে সযত্নে লক্ষ্য রাখা হয়, সর্বদাই উন্নতির চেষ্টা চলে এবং পরিচ্ছন্নতার উচ্চ মান বজায় রাখা হয়। বৃহৎ শিল্পসহরের আন্দিজান উজুম বাজারটি নূতন করে গড়া হয়েছে। ফেরঘানার উজাড়-করে-দেওয়া প্রকৃতির ফলগুলির যে উৎকর্ষ ও রঙ, দৃশ্যমান উজবেক পোষাক ও চাখানার লোক অলঙ্কারের যে বর্ণ বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে মিশেছে প্রকান্ড নলখাগড়ার নূতন ছাদের শীতল ছায়া।

৮। তুলো চাষীর জন্মভূমি

শরৎকালে আন্দিজান থেকে মোটরে করে গ্রামের দিকে রওনা হলে নজরে পড়বে শত শত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাস্তায় আরিক-জল দিচ্ছে। এর মানে কী? বছর দশেক আগেও কেউ এ কাজ করত না। কেউ যদি মনে করে পাছে আপনার ফুসফুসে উড়ন্ত ধুলো ঢোকে এ জন্য তারা এ কাজ করছে, তা হলে ভুল হবে। ওদের মৎলব আলাদা: লরি আর আরাবা থেকে যে ধুলো উঠছে তা যেন মাঠে গিয়ে বাসা না বাধে, কারণ তাহলে সদ্য-ফোটা তুলো শুঁটি থেকে ঝোলা তুষার সাদা তুলো-তন্তু ময়লা হয়ে যাবে। ফেরঘানা উপত্যকার তুলো চাষীদের কাজে কতখানি যত্ন এ থেকেই তা মালুম হয়।

আন্দিজান থেকে বেরোনো যে কোন রাস্তা ধরে যাওয়া যাক। গাড়ি পেরিয়ে যাবে সহরতলীর ফেনায়িত পার্বত্য নদীর পুল, কারখানার বাড়িঘর, তারপর পথের দু'পাশে

মাঠ। ওলিয়েসটার গাছগর্লি রর্পোলী ধোঁয়ার থামের মত গাড়ির পাশ দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। নজরে পড়বে আঙ্বর ক্ষেত আর পথের পাশে গ্রামের রাস্তা। মাটির ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে আপনাকে দেখে হাত নাড়ল। তার পরই আবার দেখতে পাবেন রাস্তার পাশের আরিক আর মাঠ, বেশীর ভাগই গাঢ় সবর্জ পাতায় ছাওয়া তর্লোর ক্ষেত।

কোন বিখ্যাত তর্লো চাষীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাকে গ্রামে না খর্ঁজে এই মাঠেই আসা ভালো। আন্দিজানের কৃষকরা সত্যিই বলে থাকে: 'মাঠের যদি যত্ন নিতে চাও ত লার্কপাখির ডাকের আগেই সেখানে হাজির হবে আর ফিরে আসবে বাদর্ড় যখন মাথার উপর চক্কর মারছে।' যে কোন খামারীর সঙ্গে মাঠে পায়চারি করলে কৌতর্হল যাবে বেড়ে।

গাছ দেখার জন্য তর্লোর ক্ষেতে দাঁড়ালে দেখবেন গাছটির ডাল, পাতা, ফুল আর তন্তুযর্ক্ত শর্ঁটি। বাহ্যত এর মধ্যে অসাধারণ কিছর্ই নেই, কিন্তু বাক শক্তি থাকলে এরা এক আশ্চর্য কাহিনী শোনাত।

১৯২৩ সালে আন্দিজানের কাছে গ্রামের এক চাখানায় রাত কাটিয়েছিলাম। চাখানার গভীরে একটা কেরসিন-বাতির পাশে গোল হয়ে বসেছিল দেখানরা। পচা কাঠের টুকরোর প্রাণহীন আভার মত প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে একটি লোক, সম্ভবত স্থানীয় মোল্লা, একটানা সর্রে শারিয়ার একখানা বই পড়ছিল। আরবী ভাষায় 'শরিয়ৎ' মানে হল 'যথার্থ পথ', অর্থাৎ 'স্বর্গ সর্খের যথার্থ পথ'। বইটির নাম 'তন্তুবায়ের রিসোলা'। তর্লোর উৎপত্তি নিয়ে লেখা। কি ভাবে সর্বপ্রধান দেবদর্ত গেব্রিয়েল আদমকে তর্লোচাষ, সর্তো কাটা ও কাপড় বোনা শেখাল এতে আছে সেই কাহিনী। সরল বিশ্বাসে দেখানরা কাহিনীটি শর্নেছিল। সে সময় ওরা লেখাপড়া জানত না। 'আদমের সময় থেকে' পর্রর্ষানর্ক্রমে ব্যবহৃত ওমাচ, অর্থাৎ কাঠের লাঙল দিয়ে ওরা জমি চষত, তর্লোর ক্ষেত থেকে পেত ছোট ও স্থর্ল আঁশযর্ক্ত সামান্য তর্লো। ওরা শরিয়ৎকে মনে করত 'যথার্থ পথ'।

তারপর গড়ে উঠল যৌথখামার। দামাল হাওয়া নর্তন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে নিয়ে এল গ্রামাঞ্চলে। উজবেক তর্লো চাষীরা লেখাপড়া শিখল। মাঠে দেখা দিল ট্র্যাক্টর। শেষ ওমাচটি স্থান পেল আন্দিজানের যাদর্ঘরে। উজবেক কিশলাকের লোকেরা দ্রর্ত এগিয়ে চলল। যথার্থ পার্থিব সর্খের নর্তন পথ, প্রকৃত পথ খর্লে গেল তাদের সামনে। একটি চটি বই-এ সেই পথের নির্দেশ দেওয়া হল। দেখা গেল বইটি 'হাজার হাজার গ্রন্থের চাইতে ভারী'।

গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে যৌথখামার জীবনের নিয়মাবলী যে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সোভিয়েত নাগরিকের মত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো স্পষ্টভাবে উজবেক যৌথখামারীরা উপলব্ধি করল তারা কেবল তাদের যৌথখামারেরই মালিক নয় সমগ্র সোভিয়েত দেশের মালিক। এর ফলে কাজ সম্পর্কে তাদের মনোবৃত্তিতে আকস্মিক পরিবর্তন এল। সেটা ঘটে যখন উজবেকিস্তান তুলো চাষীদের যথার্থ পথ, 'দশ-টনি' আন্দোলন শুরু হয় ফেরগানা যৌথখামারগুলিতে। শ্রমের প্রতি নূতন কমিউনিস্ট মনোভাব শিকড় গাড়ে উজবেক গ্রামাঞ্চলে।

নীরস খবর হিসেবে নতুন ভাবধারার কথা বলব না। উজবেক দেখানদের পুরো এক পুরুষের জীবনে হঠাৎ যে পরিবর্তনের ফলে তারা যৌথ স্বার্থের তুলনায় নিজস্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে তুচ্ছ বলে মনে করতে শুরু করে, সে পরিবর্তনের ইতিহাসের গুরুত্ব এবং নব ভাবধারার প্রাণের স্পন্দন আপনারা যাতে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন সে জন্য আমি বলব জনগণের যৌথ স্বার্থ নিয়ে দুচার কথা। সোভিয়েত শক্তির প্রথম বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তুলো আর কয়েকটি কাঁচা মালকে বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশর, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ থেকে তুলো আমদানি করত। ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'তুলোর ব্যাপারে স্বাধীনতা পাবার জন্য সংগ্রামের' সিদ্ধান্ত করেন। সেই সংগ্রামের প্রধান ভার স্বভাবত গিয়ে পড়ে সেই উজবেকদের উপর যারা জাতি হিসেবে তুলোচাষী।

উজবেকদের একটি পুরোনো প্রবাদ আছে: 'যার অনেক আছে সে অক্লান্ত।' বিপ্লবের ফলে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে উজবেক তুলো চাষীরা অনেক কিছুর মালিক হয়। এতে তাদের মধ্যে কি প্রচণ্ড শক্তি এল, তারা কত কর্মঠ হয়ে উঠল তার পরিচয় পাওয়া যায় নীচের ঘটনা থেকে: কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার মাত্র দু'বছরের মধ্যে উজবেক দেখানরা তুর্কমেন, তাজিক ও অন্যান্য তুলো উৎপাদনকারীদের সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তুলোর ব্যাপারে স্বাধীন করে ফেলে। পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে যৌথখামারী তুলো উৎপাদনকারীরা তুলো উৎপাদনের পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে ফেলে, ফলে প্রাচ্যের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি এখন, একত্রে ভারতবর্ষ, মিশর, ইরান, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সমান তুলো উৎপন্ন করছে।

'ক্লান্ত হয়ো না!' সেই প্রাচীন কাল থেকে মাঠের চাষী দেখানদের উজবেকিস্তানে এই বলে সম্বর্ধনা জানান হত। আজ যখন তারা এই কথা বলে তখন 'সফল হও!' কথার দ্বারা যে সুন্দর ভাবটি প্রকাশ পায় লোকের মনে শুধু তাই জাগে না, এ ছাড়াও নূতন ও

উদ্দীপক কিছু তাদের মনে আসে: ক্লান্ত হয়ো না, সবসময় ফুর্তিতে থাক, কারণ সমগ্র মানব সমাজের সুখ নির্ভর করে তোমাদের খোশমেজাজ ও কর্মক্ষমতার উপর। 'ক্লান্ত হয়ো না!' যেন কাজে এই সাফল্যের জন্য সদিচ্ছার প্রত্যুত্তরে উজবেকিস্তানের তুলোর ক্ষেতে 'দশ-টনি' আন্দোলন সুরু হয়। এর উদ্দেশ্য হল প্রতি হেক্টার জমিতে দশ টন করে তুলো উৎপন্ন করা।

'ক্লান্ত হয়ো না! যেন'এই অভ্যর্থনাসূচক বাক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেরা উজবেক যৌথখামারী তাদের মাঠে এমন অনেক পরীক্ষা সুরু করে যে, সমগ্র তুলোবিজ্ঞান বিশাল পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। আজ তুলো উৎপাদন সংক্রান্ত বই-এর প্রতি পৃষ্ঠায় এই সব পরীক্ষাকারীদের নাম পাওয়া যাবে, কারণ তাদের কাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন পথ রচনা করেছে। বিজ্ঞানীদের তুলো সম্পর্কিত বই এবং তুলো উৎপাদনকারী যৌথখামারে যে সব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে সে সম্পর্কে লেখা বিশেষজ্ঞদের কাছে গভীর কৌতূহলের বিষয়। সাধারণ পাঠকের কাছে সম্ভবত তা একঘেয়ে। কিন্তু উজবেক যৌথখামারে মাত্র কয়েকদিন থাকলেও টের পাওয়া যায় তুলোর জন্য সংগ্রাম উজবেকদের কাছে কী ধরনের জিনিস। এটা নজরে পড়বে যে এই বিষয়টি তাদের দৈনন্দিন জীবনকে ছেয়ে আছে। প্রতিটি ছোটখাট ও সাধারণ জিনিসের সঙ্গে এটা জড়িত, কাজের প্রতি তাদের একান্ত সচেতন ভাব ও অনুরাগ আপনাকে নাড়া দেবে, চিরকালের মত আপনার মনে দাগ কাটবে।

তুলো উৎপাদন উজবেকিস্তানের জাতীয় গৌরব। উদীয়মান সূর্যের উদার আলোকে উদ্ভাসিত তুলোর গাছ উজবেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীকে আঁকা। লোকগীতি ও সিমফনি রচিত হয় তুলোর শুঁটি নিয়ে, সে শুঁটি পৃথিবীর মানুষকে দেয় তাদের আচ্ছাদন।

উজবেকিস্তানের নূতন বইয়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় বা নূতন গৃহের অঙ্গসজ্জায় এই তুলোর শুঁটি চোখে পড়ে। শরতে দেখা যায় যৌথখামারীরা এটিকে গোলাপের মত তাদের তুবেতেইকার নীচে কানের উপরে ব্যবহার করছে। উৎসব ও শোভাযাত্রার সময় স্কুলের ছেলেরা বড় বড় লাঠির ডগায় রঙীন কাগজে তৈরী তুলোর শুঁটি মাথার উপরে ধরে রাস্তা চলে। লোকেরা তুলোর ক্ষেতে নিজেদের ফটো তুলতে ভালবাসে, কারণ তুলোই ওদের গৌরব। এ কারণে বাজারের ফটোগ্রাফাররা একখানা এমন দৃশ্যপট বানিয়ে রেখেছে যাতে বসন্তকালেও পাকা তুলোর ক্ষেতে ছবি তোলা যায়।

উজবেকিস্তানের তুলো উৎপাদনকারীদের সম্পর্কে যা কিছু বলা যায় তার সবটাই বিশেষ করে আন্দিজানের লোকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। এখানেই 'দশ টনি' আন্দোলন সব

চাইতে ব্যাপক হয়। আন্দিজানের লোকেরাই সবপ্রথম ফেরঘানা উপত্যকার নূতন জমিতে চাষ সুরু করে। ১৯৪৯ সালে আন্দিজানের কমসোমল সদস্যদের আবেদনের জবাবে উজবেকরা ক্ষুধিত স্তেপে অভিযান সুরু করে। ১৯৩৯—৪০ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি প্রদর্শনীতে অগ্রগামী কৃষি কৌশলের হলঘরে, 'তুলো' মন্ডপে স্থান পায় রাষ্ট্রের সব সেরা তুলো উৎপন্নকারী খামারগুলি। এর শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী জায়গা দখল করে আন্দিজান অঞ্চলের তুলোর যৌথখামার। এমনকি আন্দিজান অঞ্চলের মানচিত্রেও 'তুলো' শব্দটি দেখা যায়: জেলা রাজধানী পাখতাবাদ মানেই হল 'তুলোর সহর'।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সব তুলো অঞ্চল থেকেই যৌথখামারীরা আসে আন্দিজানের তুলো ক্ষেতে। এর মধ্যে আছে মলদাভিয়া ও উক্রেনের লোক। উদ্দেশ্য তুলো উৎপাদনের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থা জেনে নেওয়া। চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারীর চাষীরাও আসে, সমাজতন্ত্র কৃষি ক্ষেত্রে যে উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা এনেছে তা নিজের চোখে দেখার জন্য। আলাতিন কুলের যৌথখামারী হাদিচি আখরারভা, সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষি আকাদমীর সদস্য ও পাখতাবাদ জেলার পরীক্ষাকারী আলিম কুরবানভ, আর আন্দিজানের অন্যান্য বিখ্যাত সেরা যৌথখামারীদের ক্ষেত সমরকন্দের উলুগ বেগ মানমন্দির বা হমজাবাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতোই উজবেকিস্তানে বহুদিন যাবৎ প্রসিদ্ধ। আন্দিজান অঞ্চলের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ তুলোর ক্ষেত অবশ্য কোন যৌথখামারের নয়, সেটি হল লেনিন্‌স্কের উপকণ্ঠে তুলো উৎপাদন সংক্রান্ত সোভিয়েত গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফেরঘানা আঞ্চলিক কেন্দ্রটি। এখানে ফেরঘানার সুপ্রসিদ্ধ চারা উৎপাদক ল. রুমশেভিচ '১০৮-ফ' জাতের তুলো উদ্ভাবন করেন। বেশীর ভাগ উজবেক যৌথখামারী বর্তমানে এই জাতের তুলো বানাচ্ছে।

১৯৪৯ সালে উজবেক বিজ্ঞান আকাদমী ফেরঘানা সহরে একটি সম্মেলন ডাকেন। এতে ফেরঘানা উপত্যকার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই অধিবেশনে ফেরঘানা তুলো ক্ষেতের বিখ্যাত যৌথখামারীদের সঙ্গে উজবেক বিজ্ঞানীরা এক টেবিলে বসে কাজ করেন। সেরা উজবেক তুলো উৎপাদকরা '১০৮-ফ' জাতের তুলো সম্পর্কে বিবৃতি পড়েন এবং যৌথখামারের মাঠ থেকে আনা তুলোর নমুনা ও চার্ট দেখিয়ে তথ্য ও সংখ্যা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেন উক্ত তুলোর জন্য জল প্রয়োগের পরিমাণে ও সময়কালে কী কী পরিবর্তন দরকার।

রুমশেভিচ যৌথখামারীদের তাঁর উদ্ভাবিত নূতন '১৩৭-ফ' জাতের তুলো দেখান। (১৯৫২ সালে তিনি '১৪৭-ফ' জাতের তুলো উদ্ভাবন করেন যার ফসল ও তন্তুর পরিমাণ আগের চাইতে অনেক বেশী)। তিনি জানতেন যে আন্দিজানের যৌথখামারগুলিই সবপ্রথম

ঐ জাতের তুলো ব্যাপক অঞ্চলে বুনবে, কারণ তাদের নেতৃত্ব করেন নূতন পন্থা প্রবর্তনকারীরা। এদের সঙ্গে কৃষিবিদের মতো তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন। বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সদাসর্বদা যোগাযোগ রেখে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পন্থার সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে আন্দিজানের যৌথখামারীরা তাদের উর্বরা জমিতে হাতে কলমে বিশেষজ্ঞ ও কৃষি বিজ্ঞানের প্রবর্তক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকানরা তুলোকে বলে 'সূর্যের সন্তান'। কিছুদিন আগে পর্যন্ত লোকে ভাবত যত রোদ হবে ফসলের পরিমাণও তত বাড়বে, কারণ কেবল শীতের সময় তুলোর গাছ মরে যায়। শরৎকালে আমেরিকার দক্ষিণী তুলো অঞ্চলের তুলনায় উজবেকিস্তানে অনেক আগে রোদ চলে যায়, তবুও উজবেক যৌথখামারীরা আমেরিকানদের তুলনায় প্রতি একর জমি থেকে গড়পড়তা আড়াই গুণ বেশী তুলো উৎপন্ন করে। উজবেকিস্তানের সেরা যৌথখামারগুলির মত আন্দিজান অঞ্চলের সেরা যৌথখামারগুলি আমেরিকার চাষীদের তুলনায় গড়পড়তা ছয় গুণ বেশী তুলো বানায়। আর যারা সব চাইতে সেরা, সেই শ্রমবীরের দল তুলো উৎপাদনে আমেরিকানদের ১০ থেকে ১১ গুণ বেশী ছাড়িয়ে গেছে।

ঠিক পরিমাণ সূর্যের আলো না পেলেও বহুদিন আগেই তারা আমেরিকাকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছে। এর কারণ সমাজতন্ত্রী বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রী জীবনের সত্য সাহায্য করেছে তাদের। তার ফলে প্রতিটি যৌথখামারী নিজ নিজ ক্ষেতের কৃষিবিদ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ভাবে ফেরঘানার প্রবাদ 'সত্য সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল' তুলো চাষের ক্ষেত্রে একটি নূতন তাৎপর্য লাভ করেছে।

৯। নমানগান

ফেরঘানা উপত্যকার পঞ্চম বৃহৎ সহর এবং সির দরিয়ার উত্তরে একমাত্র সহর হল নমানগান।

প্রকাণ্ড প্রাচীরের মত চাৎকাল পর্বতমালার নীল পাদদেশ নমানগানের উপরে উদ্যত। গ্রীষ্মে কখনো সখনো কালো ঝড়ো মেঘ সহরের উপর আকাশকে কালো করে দেয়। তাদের ঝুলে-পড়া 'ধোঁয়ার ঝালর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিদ্যুতের ঝলকে, আকাশ কাঁপে বজ্রের ডাকে। নমানগানের ঘর-পোষা মোরগগুলো কিন্তু ডাক ছেড়ে আবহাওয়া বদলের কথা জানায় না। বিদ্যুৎ চমক থেমে যায়, এক ফোঁটা জল না দিয়ে মেঘেরা যায় মিলিয়ে। খাতের ভিতর থেকে ওঠা গরম হাওয়া আর্দ্রতাকে শুষে নেয় একেবারে।

সহরটি সমতল, কিন্তু স্থানে স্থানে বাড়িগুলি একটার পর আর একটা মাথা তুলেছে। ওগুলোকে মাঝে মাঝে সোপানের মত মনে হয়। নমানগান সাই নদীর উঁচু পারে বাড়িগুলির জটলা। সেখান থেকে খাড়া সরু পথ নীচে নেবে গেছে। জলের কলসী ঘাড়ে করে সে পথে কোন মেয়েকে যেতে দেখলে ককেশাসবাসিনীর কথা মনে পড়ে যায়।

নমানগানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পুরোপুরি গাছের রাজত্ব। সহরের পার্কে, স্কোয়ারে ও পথের পাশে এদের আকার, সৌন্দর্য ও জাকজমক দেখলে একমাত্র ফেরঘানার সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়। কিন্তু যে পটভূমিকায় গাছ, বাড়িঘর, কারখানা, নূতন স্কুলঘর, থিয়েটার ও দোকানগুলি দাঁড়িয়ে আছে তা সম্পূর্ণ আলাদা। মস্কোতে নিখিল ইউনিয়ন ব্যায়ামকারীদের শোভাযাত্রায় অনেকে এই জাতীয় পরিবেশ লক্ষ্য করেছেন। উজবেক ব্যায়ামকারীদের খেলা যতই বিচিত্র ধরনের হোক না কেন, এদের প্রতিটি শোভাযাত্রায় এমন একটি সময় এসে হাজির হয় যখন রেড স্কোয়ার বা স্ট্যাডিয়াম শত শত প্রকাণ্ড আকারের তুলোর শুঁটিতে হঠাৎ সাদা হয়ে ওঠে। কোত্থেকে এদের আবির্ভাব কেউ জানে না।

নমানগানের তুলো-কারখানায় ও তুলোবীজ তেলের কলের প্রবেশ মুখে লরি-বোঝাই তুলো ও তন্তুযুক্ত তুলোর বীজ অবিরাম ধারায় আসতে থাকে। কারখানার প্রকাণ্ড চত্বরের দেয়াল ছাড়িয়ে সাদা পাহাড় মাথা তোলে। গাছের জালি-কাটা সবুজের ভিতর দিয়ে নজরে পড়ে এদের। বাড়ির জানালায় আর ছোট জলাধারে প্রতিফলিত হয়। তখন মনে হয় নীল পাদদেশের পিছনে দাঁড়ানো চাৎকাল পর্বতমালার তুষারাবৃত চূড়া যেন সহরের সব জায়গায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি উজ্জ্বল-শ্বেত তুলোরই দূর প্রতিবিম্ব।

'পার্বত্য তুলোর' জন্যও নমানগানের লোকদের গর্ব। ছাগলীর যে জাত থেকে 'উজবেক লম্বা পশম' পাওয়া যায় এরা তাকে এই নাম দিয়েছে। এই ছাগলীর লম্বা, সাদা ও রেশমের মতো পশমের জন্য এই নাম। এ দিয়ে তৈরী হয় চমৎকার কম্বল, দামি মখমল, মজবুত ও সুদৃশ্য গৃহসজ্জার কাপড়। ১৯৩৭ সালে সবপ্রথমে উজবেকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় আঙ্গোরা ছাগলী আমদানি করা হয়। উজবেকিস্তানের মধ্যে নমানগান ছাড়িয়ে নীলাভ যে পাহাড়ী পাদদেশ সে জায়গাটি এদের পক্ষে সব চাইতে উপযোগী, আর সোভিয়েত ইউনিয়নেও অন্যতম। কিছুদিনের মধ্যেই এরা জলহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং এরকম পশম দিতে সুরু করে যা তুরস্কের সেরা পশমের সমান। কিন্তু পশু উৎপাদন সংক্রান্ত উজবেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের সোভিয়েত পশু উৎপাদনকারীরা আরও এগিয়ে গেছেন। স্থানীয় ছাগলীর সঙ্গে আঙ্গোরার মিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা এমন এক নূতন ছাগলীর সৃষ্টি করেন যা আঙ্গোরার চাইতে অনেক বড় এবং অধিক

প্রজননশক্তির অধিকারী। আজ চাৎকাল ও কুরামা পর্বতমালার ঘাস-ছাওয়া জমিতে দু'লক্ষেরও বেশী উজবেক লম্বা পশমওয়ালা ছাগলী চড়ে বেড়ায়।

নমানগানের উপকণ্ঠে ফলের বাগান ও আঙুর ক্ষেত ছাড়িয়ে ছড়িয়ে আছে ফেরঘানা উপত্যকার সব চাইতে চমকপ্রদ যৌথখামারের মাঠ।

রাতের বেলা রাস্তার পাশে চাখানায় পৌঁছলে প্রত্যেক পথিক জানে যে ওখানে রাত কাটাবার জায়গা পাওয়া যাবে। প্রাচীন কাল থেকে উজবেকিস্তানে এই প্রথা চালু, কিন্তু এই যৌথখামারের চাখানার লোক পথিককে নিয়ে যাবে কাছাকাছি অতিথিদের বাগানে। সেখানে আছে প্রাচীর চিত্র করা যৌথখামারের হোটেল। সাজান আছে পরিষ্কার বিছানা, নরম বালিশ, টেবিলের উপর খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকা আর টেলিফোন।

যে প্রশস্ত পথটির উপর চাখানা সেখান থেকে একটি বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে। এর দুপাশে লম্বার্ডি পপলারের সারি। তাদের ভিতর বিজলী তারগুলো চক চক করে। সহুরেদের মত স্থানীয় চড়ুইগুলিও এর সমঝদার, কারণ এর উপর বসে ছোটখাট জটলা করার ভারি সুবিধে ওদের।

রাস্তার উপর যৌথখামারের বসবাসের ঘরগুলি নতুন জীবনধারার প্রতীক। পুরোনো মাটির কুঁড়েতে এ ধরনের রাস্তার-দিকে-মুখ-করা চকচকে জানালা বা বাইরের দেয়ালে পোরসেলিনের ইন্‌সুলেটর ছিল না, উঁচু ভিত দেখে স্পষ্ট বোঝা যেত বাড়ির মেঝে কাঠের তৈরী নয়। সামনের দরজায় পাথরের সিঁড়ি আর ঘরে চিমনি ছিল না। খিলানযুক্ত গম্বুজওয়ালা একটি মাত্র বাড়ি আছে যা এশীয় স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, এটি হল যৌথখামারের স্নানাগার।

যে কোন বাড়িতে যান, যেমন যৌথখামারী বাতিরভের কাছে, দেখতে পাবেন ইউরোপীয় আসবাবপত্রের সঙ্গে নক্সা করা সুজানা, খোদাই-করা ব্রঞ্জের জগের পাশে আধুনিক গৃহের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম। আরও অসাধারণ এই যে দেয়ালগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্যের রঙীন চিত্রে সাজানো। মধ্য এশিয়ার কোন চিত্রবিদ্যা ছিল না, যা ছিল তা শুধু প্রাচীন উজবেকদের মিনিয়েচার। এখনই শুধু উজবেক জনগণের সামনে চিত্রকলার জগৎ খুলে গেছে।

যৌথখামার গ্রামের প্রধান রাস্তাটি আর একটি রাস্তার দ্বারা বিভক্ত হয়ে ইংরেজী অক্ষর টি(T)'এর আকার ধারণ করেছে। এই রাস্তাটিও নূতন, সটান চলে গেছে দূরের তুলোক্ষেতে। দুই রাস্তা যেখানে মিশেছে সেখানটার চারপাশে নতুন বাড়ি: যৌথখামারের নার্সারি, সপ্তবাৎসরিক স্কুল, সমবায় দোকান। কাছেই যৌথখামারের নূতন খামার প্রাঙ্গণ। একটু দূরে নূতন গোশালা ও গোলাবাড়ি। আমি ঘন ঘন 'নূতন' শব্দটি ব্যবহার করছি বলে পাঠকরা

স্বভাবতই আমার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে নূতনের প্রচণ্ড অগ্রগতির বহু পিছনে পড়ে আছে আমাদের শব্দকোষ। 'পুরাতন' শব্দের মত 'নূতনের' অতগুলো প্রতিশব্দ নেই—এ ক্ষেত্রে আমার কী করার আছে?

গ্রামের সব চাইতে সুন্দর বাড়ি হল যৌথখামার অফিস ভবন ও ক্লাবঘর। এর মধ্যে আছে একটি ফিল্ম প্রজেকশনের ঘরও। বাইরের দেয়ালগুলোতেও ছবি আঁকা। সব চাইতে মনোজ্ঞ এই যে, স্থপতি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে ক্লাবঘরের প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের জন্য প্রশস্ত সুপা বেদী তৈরি করেছেন। কম্বল-মোড়া প্রশস্ত বেদীকে ঘিরে আছে হাতল-ওয়ালা চেয়ারের সরু সারি যাতে অনুষ্ঠান দেখার সময় চাখানার মত দর্শকরা আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতে পারে।

অফিস ভবনে একটি বড়সড় আলো হাওয়ায় ভরা ঘর আছে। এটাকে অস্বাভাবিক বলতাম যদি না আজকাল বহু উজবেক যৌথখামারেই এধরনের ঘর দেখতে পাওয়া যেত। ঘরের মধ্যে দেয়ালের তাকে সাজানো গবেষণাগারের চকচকে যন্ত্রপাতি, রেটর্ট ও টেস্ট টিউব। যৌথখামারের সদস্য একটি মেয়ে, চোখদুটি কালো, দ্রুত গতিতে একটা ছোট্ট ঢোলক ঘুরিয়ে তাতে তুষার সাদা তুলোর সুতো জড়াচ্ছে। গবেষণাগারের অন্যান্য সহকারীরা, এরাও তরুণী, অঙ্ক বোঝাই নোটখাতার উপর ঝুঁকে আছে। তুলোর চারা, ফুল ও বীজের নমুনাসহ কাচের শো-কেসগুলো দেয়ালে ঝোলানো। ঘরটি যৌথখামারের প্রাণকেন্দ্র — বাছাই করা বীজ উৎপাদনের গবেষণাগার এটি।

যৌথখামার প্রথা প্রবর্তনের প্রথমদিকে যখন এখানে পরীক্ষা ঘর তৈরী হয় নূতন কার্যপ্রণালীতে অনভ্যস্ত এক দেখান সভাপতিকে বলেছিল, 'গবেষণা ঘর নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার? ও ছাড়াও আমরা দিব্যি কাজ করতে পারব।' সভাপতি হেসে এই প্রবাদটি বলে তার জবাব দিয়েছিলেন, 'খারাপ ঘোড়ার কাছে বর্ষার মেঘও বোঝা।' তিন বছর বাদে যৌথখামারের সব চাইতে 'পিছিয়ে-পড়া' যৌথখামারীরাও নিজেদের গবেষণা ঘরের জন্য গর্ব বোধ করল। বছর বছর তুলো ফসল বাড়াতে এবং প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ রুবল আয় করতে এই গবেষণা ঘর ওদের সাহায্য করেছে।

এই সেরা যৌথখামার সদস্যদের বৈশিষ্ট্য তিনটি: মিতব্যয়িতা, উদ্যোগ, বলিষ্ঠ উদ্দীপনা ও যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে নূতন পন্থা প্রয়োগে অক্লান্ত উৎসাহ। এরা বৈদ্যুতিক কেন্দ্র স্থাপন করল: প্রতিটি গৃহকোণ গেল আলোয় ভরে। গিন্নিরা দেখতে পেল ঘরের কোণায় আরশোলার জাল, ঝাড়ন দিয়ে সাফ করল তাদের। এই সামান্য কাজ দিয়ে তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুরু। এই যৌথখামারের বৈদ্যুতিক কেন্দ্র বহু গ্রামে তড়িৎ



উজবেকিস্তানের যৌথখামারে চমৎকার ফুটি হয়।



সমরকন্দ অঞ্চলে ওর্‌জনিকিদ্‌জে যৌথখামারের মৌচাক।

সরবরাহ করার পর থেকে শুধু উল্লিখিত গৃহিণীরাই ঝাড়ন হাতে নেয়নি, আশেপাশের কিশলাকের নারীরাও এইকাজই করল। গৃহস্থালিকে নূতন করে সাজাতে বসল তারা।

আজ উজবেকিস্তানী যৌথখামারের বৈদ্যুতিক শক্তি চালাচ্ছে চাল-ছাঁটাই যন্ত্র, নানা দানার খোসা ছড়ানো ও ময়দা কল, সার চূর্ণকারী যন্ত্র, মাটির তলায় জলের স্তরকে নীচু করার পাম্প এবং লেবু ও ডালিম গাছের জন্য জল তোলার পাম্পগুলিকে। যন্ত্র মেরামতের কারখানার লেদকে, শস্যমাড়াই যন্ত্র, ক্লভার কাটাই ও বাছাই করা যন্ত্রকে শক্তি যোগাচ্ছে এই বিদ্যুৎ। এরই সাহায্যে বিট, গাজর ও পেঁয়াজের বীজকে ঝাড়া হচ্ছে, পশুখাদ্যকে কেটে চাপ দিয়ে জমাট করা হচ্ছে। এ দিয়ে চলেছে তুলো শুকোবার কাজ, পেটিয়ে জোড়া লাগাবার কাজ, বৈদ্যুতিক সঞ্চয়কে বিদ্যুৎ চালান দেওয়া, যৌথখামার নার্সারী ও বাইরের রোগীদের হাসপাতালে তাপ যোগানো এবং যে সব যৌথখামারীর সূর্য-বাতির চিকিৎসা প্রয়োজন তাদের সেই চিকিৎসায় সাহায্য করা। শত শত লোকের কাজ এখন করে তড়িৎ শক্তি।

উজবেকিস্তানে ইতিমধ্যেই বহু শত বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত যৌথখামার গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাসখন্দের আশেপাশে আছে এদের অনেকগুলি, কারণ এই খামারগুলি সহজেই সহরের স্থাপত্য নক্সা-অফিস ও কারখানার সাহায্য পায়। ধীরে ধীরে প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র বৈদ্যুতীকরণ ও গ্রামগুলির পুনর্গঠনের কাজ চলেছে। এর পরিধি কত ব্যাপক তা বুঝতে পারব যদি মনে করি ১৯৫৫ সাল নাগাদ সমগ্র প্রজাতন্ত্রে গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতীকরণের পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে।

মহান স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের বহু আগে যখন প্রথম কিশলাকগুলিতে বিদ্যুৎ আসে এবং ওগুলি পুনর্গঠিত হয় তখন সমরকন্দে একটি ঘটনা ঘটে। তার কথা এখানে বলতে চাই।

একদিন কয়েকজন বিদেশী পর্যটক বসতোগি বোলোতে পৌঁছান। এটি সমরকন্দের কাছের এক কিশলাক। এঁদেরই একজন ইংরেজ মহিলা গাড়ি থেকে নেবে একটা আধা ধসে-পড়া মাটির দেয়ালের পেছনে ছাদ-বসা, ভাঙ্গাচোরা কুঁড়ে ঘরের ছবি তোলেন।

'উনি কেন এর ছবি নিচ্ছেন?' এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন একটি বৃদ্ধ। 'এটা ত ভেঙ্গে ফেলা হবে। আমিই থাকতাম এতে, কিন্তু এখন থাকি ওইখানে।'

তিনি একটা নূতন বাড়ি দেখালেন। ওটা যৌথখামার বৈদ্যুতিক কেন্দ্র থেকে বেশী দূরে নয়।

'হ্যাঁ, যা কিছু বিচিত্র তাকেই কমিউনিস্টরা শেষ করে দিচ্ছে।'

'উনি কী বললেন?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

'উনি দুঃখ পাচ্ছেন যে, আপনারা পুরোনো জিনিসকে, পুরোনো সৌন্দর্যকে নষ্ট করে ফেলছেন।' দোভাষী জানাল।

বৃদ্ধ হাসলেন। 'দয়া করে বলুন, আমি ঐ সুন্দর পুরোনো বাড়িটি সানন্দে ওঁকে দিতে রাজী আছি। উনি এতে বাস করুন। আর আমার কথা যদি বলেন, আমি আমার বাকি জীবন ঐ নূতন বাড়িতেই কাটাব।'

উজবেকিস্তানে আর 'সুন্দর' ছেঁড়াখোঁড়া কাঁথা বা 'মনোরম' ধ্বংসাবশেষ নেই। অতীতের একমাত্র জিনিস যা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থাতেও উজবেকরা সযত্নে রক্ষা করে তা হল স্থাপত্যের স্মৃতিচিহ্ন। আর ঐ 'বিচিত্র' দরিদ্রতাকে তারা চিরকালের মত বিদায় দিয়েছে। সোভিয়েত সমাজের ক্রমোন্নতির নিয়ম হল জনগণের ক্রমাগত বর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে মেটানো। ধনতান্ত্রিক সমাজে চূড়ান্ত লাভের নিষ্ঠুর নিয়মের কাছে মানুষ অধীন, ফলে জনগণের অদৃষ্টে জোটে ভয়ঙ্কর দুঃখ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত উৎপাদনের লক্ষ্য হল মানুষ ও তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন। এর সাক্ষ্য সারা প্রজাতন্ত্রে যৌথখামারের হাজার হাজার নূতন বাড়িগুলি এবং উজবেকিস্তানের সমস্ত যৌথখামার গ্রামগুলির পুনর্গঠন পরিকল্পনা।

১০। জলের জন্য নূতন পরিকল্পনা

যদি কোন ভ্রমণকারী ট্রেনে না গিয়ে নৌকায় করে সির দরিয়া ধরে প্রথম বারের মত ফেরঘানা উপত্যকা ঘুরে আসে এবং কেউ যদি পরে তাকে জিজ্ঞেস করে ঐ উর্বর উপত্যকাটি কী রকম, ও হয়ত 'উর্বর' শব্দটি শুনে কাঁধ ঝাঁকাবে।

ও বলবে কখনো হলুদ, কখনো ধূসর বালির বিশাল বিস্তৃতির কথা যাকে কেটে বেরিয়ে গেছে ঘোলাটে সির দরিয়া। হয়ত বলবে রোদে চক চক করা নোনা জমি কিংবা তাকিরের কথা। তাকির হল রোদে ফাটা তৃণশূন্য কাদাভরা জমি। মরুভূমির মধ্যে কেবলমাত্র কয়েক জায়গায় সির দরিয়ার পাশে গজিয়ে উঠেছে উজ্জ্বল সবুজ চিই (মধ্য এশিয়ার খুব লম্বা নলখাগড়া) আর গলাগলি ঝোপঝাড়। এর মধ্যে পাখিরা বাসা বাঁধে আর কখনো সখনো বনবিড়ালের হলদে চোখ চক চক করে ওঠে। চিইর পরেই মাঝে মাঝে ধূসর বালির স্তূপ মাথা তুলেছে। শাঁসযুক্ত সবজে গোলাপী রুবার্ব্ পাতার লম্বা মাথা

না থাকলে এগ্‌লোকে মৃতবৎ মনে হত, আর আছে উট কাঁটার গ্‌ল্ম। এর ভেতর থেকে মাঝে মধ্যে সরসর করে বেরিয়ে আসে তৈলাক্ত জলধারার মত এক আধটা সাপ।

স্মরণাতীত কাল থেকে ইয়াজ ইয়াভান স্তেপ ছড়িয়ে আছে একদিকে মর্‌ভূমি আর একদিকে চাষ করা অঞ্চলের মাঝখানে। প্রতি বসন্তেই ছেলেরা স্তেপে যেত রঙিন টিউলিপ আনতে। গ্রীষ্মে ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা রাখালের দল রোদ-পোড়া স্তেপে গরিব লোকদের ভেড়া চরাতে আনত। বাঁইরা এদের অধিত্যকার মাঠে যেতে দিত না। বাজ আর ঈগলগ্‌লো স্‌সলিকের খোঁজে স্তেপের উপর উড়ে বেড়াত। এই উর্বর, অথচ জলহীন বন্ধ্যা ও বিরল-বসতি স্তেপকে বিরাট মর্‌দ্যানে পরিণত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু একমাত্র হাসার পারত এর ব্‌কে জল আনতে।

হাসার একটি প্রাচীন শব্দ, যা মরে না, কখনো প্‌রোনো হয় না, মান্‌ষের উদ্দীপনার প্রতীক এটি। শব্দটির অন্‌বাদ করা চলে না। বড় ধরনের ভূমিকম্পের পর সবাই মিলে হাসার করে, উদ্দেশ্য য্‌ক্ত প্রচেষ্টায় ধসে-পড়া বাড়িগ্‌লোকে আবার তৈরী করা। নদীর উপর প্‌ল বসাতে হলে, কিংবা নলখাগড়া দিয়ে বাজারের ছাউনী বানাতে হলে দরকার হয় হাসারের। হাসার হল মিলিত কাজ এবং প্রয়োজনের সময় পারস্পরিক সাহায্য। হাসার বলতে বন্ধ্‌ত্বও বোঝায়, শত্র্‌ হলেও সময়ের মত শত্র্‌তা ভুলে গিয়ে সমবেত কাজটি শেষ করার জন্য তার সঙ্গেও হাত মেলান হয়। হাসার শব্দটির মধ্যে উৎসবের ব্যঞ্জনাও আছে। বাজিয়ে ও গায়ক সবসময়েই হাসারে মিলিত হয়ে যারা কাজ করছে তাদের আনন্দের খোরাক যোগায়, উৎসাহ দেয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাসারে শোনা যাবে ধ্বনিমৃখর নাগারার আওয়াজ, স্‌রনাইয়ের সঙ্গীত (মধ্য এশিয়ার বাঁশি) আর কারনাইয়ের প্রচন্ড আওয়াজ যার শব্দে 'আকাশ ওঠে কেঁপে'। এটা একধরনের প্রকান্ড রাম শিঙ্গা।

এরকম অবশ্য হয়েছে, যখন বেক আর খানরা হাসারকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে। তারা জোর করে লোকদের দিয়ে সামন্ততন্ত্র স্‌লভ ভারি কাজ করিয়ে নিত। হাসার শব্দটি, যে শব্দটি প্রত্যেকটি উজবেকের কাছে পবিত্র, প্রয়োগ করে নিজেদের দ্‌ষ্কর্মকে গোপন করত তারা। এ জন্য উজবেকিস্তানের কয়েক অংশে শব্দটির অর্থ ভয়াবহ র্‌প নেয়। সোভিয়েত রাষ্ট্র দেখানদের ঘাড় থেকে মধ্যয্‌গীয় কাজের যোয়াল তুলে নিয়ে চিরদিনের মত ফিরিয়ে আনল শব্দটির ম্‌ল, জনপ্রিয় ও উজ্জ্বল অর্থ।

বিপ্লবের কিছ্‌ পরে ফেরঘানাবাসীরা আধ্‌নিক লকগেট, জল-সংগ্রাহক ও স্পিলওয়ে বসিয়ে তাদের প্‌রাতন সেচ ব্যবস্থাকে প্‌নর্গঠিত করে। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে তারা এক প্রকান্ড হাসারে জমাট বাধে। আকারে অভূতপ্‌র্ব এ হাসারের উদ্দেশ্য

নতুন খাল কেটে ইসফাইরামের বাড়তি জলকে শাহিমর্দানে চালান দেওয়া; শাহিমর্দানের ভাঁটির দিকে সর্বদা জলের খুব অভাব ছিল। এরকম উৎসাহ ও শক্তি নিয়ে তারা কাজ করে যে যাকে মনে হত অসম্ভব তা সম্ভব হল: মাত্র সতের দিনে বিশ মাইল লম্বা ল্যাগান খাল কেটে ফেলল তারা। খবরটা সারা প্রজাতন্ত্রে দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ফেরঘানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। এই ভাবে লোক-শক্তির সাহায্যে নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়।

ল্যাগান খালের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ফেরঘানাবাসীরা স্থির করল ঐ বছরেই সির দরিয়ার নূতন এক তলদেশ খুঁড়বে যাতে মধ্য এশিয়ার এই শক্তিশালী নদীটির একটা অংশ এর ভেতর এনে সমগ্র স্তেপের সেচ ব্যবস্থা করা যায়। এক লক্ষ ষাট হাজার যৌথখামারী মহান হাসারে জমায়েৎ হয়, পঁয়তাল্লিশ দিনে বিরাট ফেরঘানা খাল কাটল। ঐ পঁয়তাল্লিশটি দিন মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহের সমগ্র ইতিহাসে হাজার হাজার বছরের সামিল। আগে কখনো এত বড়ো খাল মধ্য এশিয়ায় তৈরী হয়নি — ১৬৮ মাইল লম্বা এই খাল।

লোকে বলে তরুণ উজবেক সুরকার বুরখানভ একসময় প্রকৃতির সঙ্গে ফেরঘানাবাসীর সংগ্রামের যে মহান সিমফনি তার প্রস্তাবনাকে ল্যাগান খালের সঙ্গে তুলনা করেন। এই সুরের প্রথম পর্ব হল মহান ফেরঘানা খাল নির্মাণ। আমার মতে তুলনাটি অপূর্ব।

আপনারা কেউ কখনো উজবেকিস্তানের কোনো খাল নির্মাণের জায়গায় গিয়ে দেখেছেন কী উদ্দীপনায় লোকে কাজ করছে? এই সানন্দ উদ্দীপনাকে পৃথিবীর কোন কিছুই রুখতে পারে না। খাল নির্মাণের জায়গায় ধোঁয়া-ওঠা সামোভারের পাশে বসে কখনো শুনেছেন লোক অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত? কখনো কোন খালের উদ্বোধনের সময় উপস্থিত থেকে এর নির্মাতাদের সঙ্গে অনুভব করেছেন ছুটে-আসা জল দেখার উত্তেজনা? অনেক দূরে দেখা দেয় বাদামী রঙের ফেনিল জল ফুলে ফুলে ছুটে আসছে, তার পর যেই কাছে আসে অমনি অপেক্ষমান জনতা আনন্দের উল্লাসে ফেটে পড়ে, ভুলে যায় জীবনের রীতিনীতির বাঁধাধরা নিয়মের কথা। সেই আনন্দে শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী সবাই তাদের তুবেতেইকা আকাশে ছোঁড়ে, কিংবা ছুটন্ত জলের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা লাগায়, একটু থেমে আবার ছুটতে থাকে। সেই আন্তরিক উল্লাসের সরল আনন্দ-ভরা মুহূর্তগুলি একবার দেখলে সারা জীবন মনে থাকবে, অন্তরে গুঞ্জরিত হবে সঙ্গীতের মতো।

মহান ফেরঘানা খালের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সিমফনির প্রথম পর্ব শেষ হল না, এটা শুধু প্রথম পর্বের চূড়ান্ত পর্যায়। ঐকতানে যুক্ত হল অকর্ষিত জমিতে লাঙল-চালানো ট্র্যাক্টরের বজ্রনির্ঘোষ, আরাবার ঝর ঝর শব্দ, গরু ভেড়ার ডাক, শোনা গেল সেই সব হাজার হাজার যৌথখামার পরিবারবর্গের কলস্বর যারা তাদের আসবাবপত্র ও

গরু ভেড়া নিয়ে যাত্রা করেছে শারিখান ও ইয়াজ ইয়াভান স্তেপে। তারা তৈরী করল বাড়ি, কাটল ভবিষ্যৎ কিশলাকের রাস্তার সীমান্ত আর সেচ খাল, পুঁতল গাছ। প্রথমটায় নূতন বসতকারীদের ভাগ্যে এত কম ছায়া জুটল যে একটা গানই চালু হয়ে গেল। তরুণ তার প্রিয়াকে বলছে: 'তোমার আঁখি পক্ষ্মের ছায়ায় আমাকে রোদের হাত থেকে বাঁচাও।'

প্রকৃতির সঙ্গে ফেরঘানাবাসীদের সংগ্রামের সেই মহান সিম্‌ফনির প্রথম পর্যায়কে বলা চলে 'স্তেপ বিজয়' আর এর দ্বিতীয় পর্যায় হল 'সুগঠিত সেচ প্রণালী'। এটিও দুঃসাহসী ও অভূতপূর্ব পরিকল্পনা। ব্যাপার হল এই যে, ফেরঘানা উপত্যকায় বিস্তৃত স্তেপ ছাড়াও প্রাচীন মরূদ্যানে এখানে সেখানে ছিল এমন হাজার হাজার জমির টুকরো যাতে জল ছিল না। বাগান ও মাঠ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার শেষে নজরে পড়ত কিছু পতিত জমি যার উপর জন্মেছে সোমরাজ ও ছোট ছোট কাঁটাগাছ। ফেরঘানা উপত্যকা ছিল দীনহীন। সেচ বিশেষজ্ঞ আর যৌথখামারীরা স্থির করল এর জন্য নূতন সুন্দর সাজসজ্জা বানাতে হবে।

তাই কারা দরিয়া থেকে সুরু করে তারা দক্ষিণ ফেরঘানা খাল কাটল আন্দিজান ও মারগেলান মরূদ্যানে জল দেবার জন্য। নমানগান মরূদ্যানকে তারা উত্তর ফেরঘানা খাল দিয়ে ঘিরে ফেলল। নমানগানের পশ্চিমে শুষ্ক স্তেপের ফালিও ভরে উঠল মানুষের কণ্ঠস্বরে। গাছ আর তুলোর বাগানের সবুজ আর সাদায় এদের চেহারা গেল পালটে। উপত্যকার উত্তর পশ্চিম কোণে কাসান সাই নদীর উপর ওরা বানাল উর্তা তকাই জলাধার। এতে ১০ কোটি ঘন মিটার জল ধরে। লোহার কাঠামোর উপর কংক্রীট করে সখ নদীকে বেঁধে ফেলল তারা এবং এর থেকে নির্জলা জমিতে জল চালান দেবার প্রণালী বানাল।

ধীরে ধীরে ফেরঘানার সেচকর্মীরা রোদ-পোড়া স্তেপের হলদে জায়গাগুলোকে বিদায় দিল। ১৯৫২ সালে ফেরঘানার যৌথখামারীরা সোভিয়েত সরকারের কাছে ইয়াজ ইয়াভান স্তেপের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযান চালাবার পরিকল্পনা পেশ করল। তিন বা চার বছরের মধ্যে তারা প্রতিটি খন্ড জমিকে সেচ করবে বলে জানাল। সব চাইতে চিত্তাকর্ষক এই যে, এ কাজ তারা নিজের খরচায় করবে বলে স্থির করেছে, অর্থাৎ তাদের যৌথখামারের সংরক্ষিত তহবিল থেকে তারা এই পরিকল্পনায় খরচ করবে ৪০০ কোটি রুব্‌ল। এতেও কিন্তু সিমফনির শেষ হবে না। এটা শুধু দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ। তারপর, সম্ভবত সব চাইতে বিস্ময়কর ও উদ্দীপক তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের কাজ চলতে থাকবে।

ফেরঘানা উপত্যকায় সির দরিয়ার কাছে এখানে সেখানে অপসৃয়মাণ বালু রাশি, ভাঙ্গা পাথর ও নোনা ভরা ভূমি নিয়ে তখনো পড়ে থাকবে কাইরাক কুম বিশাল মরুভূমি।

বাতাস বইলে মনে হয় সেই আগের দিনের মতো বালুর পাহাড়ের উপর থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। সেই পুরোনো দিনের মতো রাত হলে লালচে লোমশ মাকড়সা শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। কখনো সখনো বিদ্যুৎ চমকের মত দুই বালু স্তূপের মাঝখান দিয়ে সর সর করে চলে যায় দু'একটা গিরগিটি। এই মরুভূমিকে সেচ ব্যবস্থা করে কোন লাভ নেই, কারণ এর বালি আর পাথরের মাঝখানে প্রয়োজনীয় কোনকিছুই জন্মাবে না। সোভিয়েত পুনরুদ্ধার বিশেষজ্ঞরা এটাকে জল-ভরাট করে সমুদ্র বানাবেন বলে স্থির করেছেন।

কয়েক বছরের ভিতরেই কোকন্দের লোকেরা প্রতি রবিবার গ্রামাঞ্চলে যেতে পারবে সাঁতার কাটতে, নৌকো বাইতে বা এই প্রকাণ্ড সমুদ্রতীরে রোদ পোয়াতে। উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলের বাগানে এর তীর সুশোভন হয়ে উঠবে, কারণ উপত্যকার শুকনো জল হাওয়া সমুদ্রের দরুন বদলে যাবে। কেবল লেবু বা ট্যাঞ্জারিন কুঞ্জই নয়, ম্যাগনোলিয়া, ইউকালিপটাস ও পারসিমন (আমেরিকার খেজুর গাছ) গাছ পুষ্পিত হবে। ২৩০ বর্গ মাইল ফেরঘানা সাগরের উপর দিয়ে জেলে নৌকো যাতায়াত করবে, তাদের পিছনে পড়ে থাকবে সাদা রেখা। তখন স্টীমারে করেও ফেরঘানা উপত্যকা ছেড়ে আসা সম্ভব হবে। কাইরাক কুম বাঁধ পর্যন্ত জাহাজের পিছু পিছু ধাওয়া করবে সমুদ্র চিল।

ফেরঘানা উপত্যকায় লেনিনাবাদ গিরিসঙ্কটের ফটকের কাছে তাজিক ভূমিতে এই বাঁধ তৈরী হবে। এরই পাশে যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বসবে তা ভবিষ্যতের প্রধান পরিকল্পনাসমূহের অন্যতম। একত্রে উজবেক, তাজিক ও কাজাখরা এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবে। এর ফলে তাজিকরা পাবে প্রকাণ্ড জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, উজবেকেরা বিশাল সমুদ্র আর উজবেক ও কাজাখরা নূতন জলসেচ ভূমির বিরাট অঞ্চল।

কিন্তু সেই অঞ্চল দেখতে হলে বর্তমানে আমাদের সূর্যালোকিত, ফুল-ছাওয়া সমৃদ্ধ ও সুন্দর ফেরঘানা থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যেতে হবে লেনিনাবাদ গিরিসঙ্কটের পথ ধরে ফর্হাদের পাহাড়ে। এই গিরিসঙ্কটের মধ্যেই ফেরঘানা সাগরের জল ঢুকবে, সেখান থেকে পশ্চিমমুখী খাল দিয়ে ক্ষুধিত স্তেপে। এই ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে ফেরঘানাবাসীদের সংগ্রামের যে সিম্ফনি তা মূর্তি নেবে সেই কাহিনী-কথিত উজবেক স্থপতি ফর্হাদের মধ্যে। পাহাড়ের একটি যুৎসই জায়গা থেকে ঈগল দৃষ্টিতে সে দেখে তার সমগ্র অঞ্চলটিকে। যেন সে ভাবে আর কোন্ কোন্ জিনিস করা বা নির্মাণ করা দরকার যাতে নিজের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন মানুষ বড়াই বা জাঁক না করে সরলভাবে ও বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারে যে সেই হল পৃথিবীর মালিক।

জরাফশানের ভাটিতে

১। আদিরের উপরে

ট্রেন চলেছে সমরকন্দের দিকে রুক্ষমূর্তি বিশাল দেশের ভিতর দিয়ে। রেললাইনের দুপাশে নুর আতার উত্তুঙ্গ কালো পর্বতমালা। নীচে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে পাহাড় থেকে পাহাড় বেয়ে চলেছে খরস্রোতা সানজার নদী।

গিরিসঙ্কট পড়েছে বন্ধুর স্তেপভূমিতে। এর ভেঁতরে ঢোকার আগে গাড়ি থামল মিলুতিন্‌স্কায়া স্টেশনে। প্রথমটায় নজরে পড়বার মত কিছুই দেখা যায় না। ছোট্ট স্টেশন পেরিয়ে শুধু চোখে পড়ে একটা বসতির লোহার ছাদ আর ধুলো ভরা রাস্তার পাশে গাছের সারি। দূরে লরির আওয়াজ পাওয়া যায়, একটা মুরগী ডাক ছেড়ে ওঠে — জানান দেয় এইমাত্র সে একটা ডিম পেড়েছে। একদিকে উত্তুঙ্গ খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, আর তিনদিকেও ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এই সুদূর সহরে নজরে পড়ার মতো কী থাকতে পারে?

এই প্রাথমিক ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। মিলুতিনস্কায়া উজবেকিস্তানের একটি চমকপ্রদ সহর। তাছাড়া এটি হল উজবেকিস্তানের বোগারা ও আদিরের রাজধানী। কিন্তু প্রথমেই বলব আদির আর বোগারা মানে কী।

মধ্য এশিয়ায় আদিরগুলিকে কখনো কখনো পাহাড়ের 'পাট্টা' বলা হয়। জলস্রোতে কাটা নালা এই পাহাড়ের পাদদেশ স্তেপের উপর দিয়ে মধ্য এশিয়ার শত শত মাইল ব্যাপী পাহাড়গুলিকে যুক্ত করেছে। অতীত কাল থেকে আদিরগুলিকে আড়াআড়িভাবে কেটে যাওয়া ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর পাশে হাজার হাজার ছোট ছোট মরূদ্যান সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সব মরূদ্যানের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা ছিল জনমানবশূন্য স্তেপের ভেতর দিয়ে। ছোট ছোট মরূদ্যানের পুষ্ট ও সরস সবুজের দিকে তাকালে অঞ্চলটির উর্বরতা দেখে পথিক বিস্মিত হবে।

দরিদ্র দেখানের নিজস্ব কোন সেচ জমি ছিল না। মরূদ্যানের একপাশের নীচু জায়গায় সামান্য জমিটুকুতে লাঙ্গল দিয়ে সে আদিরের অসাধারণ উর্বরতার উপর নির্ভর করে ভাগ্য প্রসন্ন হবার আশায় থাকত। স্মরণাতীত কাল থেকে এই জাতীয় জমির টুকরো মধ্য এশিয়ায় বোগারা নামে পরিচিত।

গরম পড়ার আগে দেখানের বোনা বার্লি পাকলে ভাবনার কিছু ছিল না। তাহলে খুব ভালো ফসল অবশ্য সে পেত, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ও কঠিন শত্রু গরমসিল একবার তার ক্ষেতে লাগলে সব শেষ। পাহাড়ে চরাবার মত দু'চারটে ভেড়াও যদি তার না থাকত তাহলে সে গিয়ে হাজির হত সমরকন্দ বা তাসখন্দের ধুলো বোঝাই রাস্তায় ভিখিরীর দল বাড়াতে।

গরমসিল (উষ্ণ প্রবাহ) হল এক ধরনের বাতাস যা বয়ে আনে মরুভূমির শুষ্ক উত্তাপ। উজবেক দেখান কি ভাবে এই অমোঘ শত্রুকে হটাবে? তা করতে পারলে মধ্য এশিয়ার আদিরগুলি, হাজার হাজার একর ভূমির এই অতি উর্বরা জমি তুষার-ছাওয়া পাহাড়ের পাদদেশে শস্য ক্ষেত আর ফলের বাগানে রূপান্তরিত হতে পারত। মিলুতিনস্কায়াতে বোগারা চাষের গবেষণা সংক্রান্ত উজবেকিস্তান পরীক্ষা কেন্দ্রটি বিশ বৎসর আগে ঠিক এই কাজেই লাগে।

এই কাজ যে কী কঠিন তা বোঝাবার জন্য আমি উজবেকিস্তানের জলবায়ুর খেয়ালখুশির কথা একটু উল্লেখ করব। উজবেকিস্তানের অবস্থান যদিও কালিফোর্নিয়ার মতো একই অক্ষাংশে, জানুয়ারীতে এখানকার গড়পড়তা তাপ দক্ষিণ গ্রীনল্যান্ড বা স্পিটস্‌বার্গেনের মতো কম, এগুলি উজবেকিস্তানের চাইতে উত্তর মেরুর ১,৮০০ মাইল কাছে। জুলাই মাসে উজবেকিস্তানের গড়পড়তা উত্তাপ বিষুবরেখার ১,৬১৫ মাইলের কাছাকাছি গ্রীন কেপ দ্বীপপুঞ্জের মত।

শীতকালে তাসখন্দের তাপ প্রায়ই শূন্যের নীচে ৩০° সেণ্টিগ্রেডে নেবে আসে আর গ্রীষ্মে এটা ওঠে ৪০° সেণ্টিগ্রেডের ওপর। এটা হল ছায়াঘেরা জায়গার তাপ আর রোদে বালু ও পাথরের তাপ হয় প্রায় ৭৫° সেণ্টিগ্রেড। এর অর্থ হল তখন কোন দেয়ালের গায়ে গা ঠেকান যায় না, বা খালি পায়ে হাঁটা চলে না। সহজেই বালুর তাপে ডিম ভেজে নেওয়া যায়। এই তারতম্যের কারণ হল, যে সমুদ্র জলবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণ করে, তার থেকে মধ্য এশিয়া বহু দূরে। এ কারণে অন্যত্র যেখানে পাহাড়ের পাদদেশ সব চাইতে সুজলা সুফলা, সেখানে তিয়েন শান, পামির ও আলাই পর্বতমালার এসব জায়গা প্রাণহীন মরুভূমির মতো।

আর একটি কারণ। মধ্য এশিয়ার আদিরগুলি বহু বিস্তৃত তুষারাবৃত পাহাড় এবং

কিজিল কুম ও কারা কুম মরুভূমির মাঝখানে ছড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মের রোদে বালি তেতে ওঠে। গরম বাতাস অবিরাম মরুভূমি থেকে উঠতে থাকে দিগন্তে তুষার ছাওয়া নীল পাহাড়গুলোর উপর। বাতাস যখন এত গরম হয় যে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন তখন ওকে বলা হয় গরমসিল। রাস্তায় বা মরূদ্যানে যা কিছু পায় তাকেই এ পুড়িয়ে ছাড়ে, এমনকি মাঠের মধ্যে ফসল পুড়িয়ে কালো করে দেয়।

মিলুতিন্স্কায়া পরীক্ষামূলক কেন্দ্রের লোকেরা কি ভাবে বোগারা চাষকে সফল করে, এই সংগ্রামে তারা কী পরিমাণ শক্তি ও উদ্ভাবনী কৌশল লাগায় তা নিয়ে অনেক কথা বলা চলে। তাদের প্রধান অস্ত্র হল কস্তিচেভ, দকুচায়েভ ও উইলিয়ামস কর্তৃক গঠিত জমি চাষের নূতন পদ্ধতি। এতে সোভিয়েত বিজ্ঞান যথার্থ গর্ব অনুভব করে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল মিচুরিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও লিসেঙ্কো কর্তৃক সম্প্রসারিত গাছের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাবার তত্ত্ব। এর ফলে অনাবৃষ্টি-সওয়া গম, বার্লি ও বহুবিধ নতুন ফসল উৎপাদনে সফল হয় মিলুতিন্স্কায়ার গবেষণাকারীরা।

এঁদের আবিষ্কার ও সাফল্য সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁদের চেষ্টা যে সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হলে মধ্য এশিয়ার যে কোন পাহাড়ী উপত্যকায় গেলেই যথেষ্ট। দেখা যাবে শত শত কম্বাইন পাহাড়ের পাট্টার থেকে ফসল তুলছে। কিছুদিন আগেও এখানে কিছুই জন্মাত না। কাটাই যন্ত্রের ফলকের উপর সূর্যের আলো ঝকমক করছে। যে রাস্তা পাহাড় বরাবর আঁকাবাঁকা বেরিয়ে গেছে তাই বেয়ে সারি সারি লরি সিমেণ্ট, কাঠ, কাপড়, জুতো, বই, বেতারযন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় খামারের নতুন বসতিগুলিতে। সোভিয়েত জনগণ আদিরকে প্রাণ দিয়েছে, একে মধ্য এশিয়ার শস্যাগারে পরিণত করেছে। আজ উজবেকিস্তান নিজের রুটি নিজেই উৎপন্ন করে। সৌভাগ্যবান জরাফশানের প্রান্তবর্তী পাহাড়ের আদিরগুলিতে প্রজাতন্ত্রের সব চাইতে বেশী শস্য জন্মায়।

সঙ্কীর্ণ গিরিসংকটের দ্বারা বিভক্ত পর্বতমালা যেখানে একটার থেকে আর একটা সূক্ষ্ম কোণে আলাদা হয়ে গেছে তারই কাছাকাছি তৈরী হয়েছে গালা আরাল (শস্য দ্বীপ)। উজবেক প্রজাতন্ত্রের চমৎকার রাষ্ট্রীয় শস্য খামার এটা। মিলুতিন্স্কায়ার কাছাকাছি, সমুদ্রের মতো পতিত বোগারা জমির মাঝখানে একটা দ্বীপের মতো এই গালা আরাল গড়ে উঠেছে। একে আর এখন দ্বীপ বলা চলে না, 'শস্য সমুদ্রের'ই অংশবিশেষ, কারণ এরই সঙ্গে গড়ে উঠেছে আরও বহুসংখ্যক রাষ্ট্রীয় খামার। কিন্তু গালা আরাল একটি অগ্রবর্তী খামার রয়ে গেল। ২৫ মাইল জোড়া এর বিশাল মাঠে সবপ্রথম নূতন শস্যের জাত

আর নূতন চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। মিলুতিন্‌স্কায়া কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্য প্রমাণিত হয়েছে।

গ্রীষ্মে গালা আরালের মাঠের ভিতর দিয়ে মোটরে করে গেলে ফসলের সীমাহীন মাঠ নজরে পড়ে।

অন্যান্য জায়গার মত এখানকার মাঠের উপর ভরত পাখি ছোট্ট ডানা মেলে মিষ্টি গান করে। মাঠের মধ্যে লুসার্নের গাদা, মিলুতিনস্কায়ার গবেষকদের আবিষ্কৃত বোগারা তরমুজ ও ফুটির বিশাল ক্ষেত। আর একটি জিনিস যা এখানে নজরে পড়বে তা হল বোগারা তিল শস্য। উজবেকিস্তান এই শস্যের প্রধান উৎপাদক, জলসেচ ছাড়াও তিল চাষ করতে শেখার ফলে উজবেকরা এখন মরূদ্যান থেকে এই চাষ তুলে নেবে। প্রথম বোগারা আঙুর ক্ষেত এরি মধ্যে পাহাড় বেয়ে নেমেছে রাষ্ট্রীয় খামার বসতির কাছে। মিলুতিন্‌স্কায়ার পরীক্ষাকারী কর্তৃক খাপ খাওয়ানো 'রূকাৎসিতেলি' ও 'কারাকিশমিশ' নামক দু'ধরনের আঙুর জন্মায় এখানে। প্রায় ৫০ একর ব্যাপী এক বিরাট নীচু জায়গায় যে নতুন পুকুর বানানো হয়েছে হাজার হাজার হাঁস তার নীল জল ছিটিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে কার্প মাছের কালো-ধূসর পিঠ চোখে পড়ে। গালা আরালের প্রতি টুকরো জমিতে প্রাণের স্পন্দন।

নূতন বনাঞ্চল পরিদৃশ্যকে উজ্জ্বল করেছে, শোভন করেছে। খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোগারা জমিতে গাছ জন্মানোর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অনাবৃষ্টিতে কোন গাছ বাঁচত না। কিন্তু মিলুতিন্‌স্কায়ার গবেষকরা সরু-পাতা কারাগাছ, হলুদ রঙের বাবলা, বুখারার বাদাম গাছ ও অলিয়েষ্টারের কুঞ্জ বসিয়েছেন। এর পর গালা আরালেও গাছ দেখা দিল। মধ্য এশীয় বনবিভাগ গবেষণা ইনস্টিটিউট গোছা করে এশ গাছ, হনিলোকাস্ট, আইলানথাস ও বাবলা গাছ লাগাতে সুরু করল। কিছুদিনের ভেতরেই ফসলের ক্ষেতের চারপাশে একটা নূতন বনের দেয়াল দেখা দিল। ১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মে যখন কিজিল কুম থেকে গরমসিল গালা আরালের দিকে ছুটে এসে সমানে বয়ে চলল দুদিন ধরে নূতন হলেও ঐ বনের সবুজ প্রাচীর শস্যকে বাঁচিয়ে দিল। আগের মত শস্য ত পুড়লই না, বরং প্রতি একরে ৪২০ কিলোগ্রাম করে ফসল পাওয়া গেল। তখন দূর থেকে যৌথখামারীরা আসতে লাগল গালা আরালের বনভূমির আশ্রয়টিকে নিজ চোখে দেখার জন্য। শুধু দেখার জন্যই নয়, আদিরগুলিকে রক্ষা করার জন্য কি ভাবে গাছ লাগাতে হয় তা শিখবার জন্য।

একটি প্রাচীন উজবেক প্রবাদ আছে: 'কোন লোক যদি একটি গাছও লাগায়, তার নাম অমর হয়ে থাকবে।'

২। জয়তু সমরকন্দ!

প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে সমরকন্দে যাওয়া ভালো। সেখানে শিল্পীদের সঙ্গে, আঙ্গুর-মদ ও তামাক উৎপাদক, ছাত্র, কারখানার কর্মীদের সঙ্গে সময় কাটান এবং ফলচাষীদের সঙ্গে আলাপ করে ভ্রমণ শেষ করুন। এই হল একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই বিরাট ও অনন্ত বৈচিত্রপূর্ণ সহরের অন্ততঃ কিছুটা পরিচয় পাবেন। এমন একটি সহর যেখানে একবার গেলে তার কথা কোন দিনও ভোলা যায় না।

সমরকন্দের প্রান্তে সহূরে ফলের সবুজ বাগান আর মাঠের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে একটা বহু মাইল জোড়া গাছপালাহীন পাহাড়। এই পাহাড়ের নাম আফ্রোসিয়াব। পুরোনো সমরকন্দ ছিল এখানে।

আফ্রোসিয়াবের উপর থেকে যে কখনো সমরকন্দ দেখেনি, ফেনিল সিয়াব আরিকের কাছে চাল-ছাঁটাই কলের স্তূপীকৃত গোলাপী চালের তারিফ করেনি সে সমরকন্দের নামের তাৎপর্য বুঝবে না। বাজারের দিকে ছুটে-চলা পথচারী, সাইক্লিস্ট ও ঘোড়সওয়ারের ভীড় যে দেখেনি বা কোন দিন গাছের মাঝখানে মাটির ছাদের ওপর সগৌরবে মাথা তোলা মিনার চূড়োর উপর চোখ পেতে রাখেনি সে সমরকন্দকে বুঝবে না। সহরের যে অংশে নূতন রাস্তার পাশে বাড়ির ছাদগুলি রূপোলী কুয়াসার চকচক করছে আর তাদের উপর মাথা তোলা সহরের কারখানা ও মিলের ইট-গাঁথা চিমনি যে দেখেনি সে সমরকন্দকে বুঝবে না। এগুলি গঠনের দিক থেকে মিনারের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। এই জীবনের স্পন্দন ও রঙ-ভরা পরিদৃশ্য যারা না দেখেছে তারা কখনো এখানকার লোকদের অতীতে দেওয়া নামের তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। এ নাম আজও বেঁচে আছে: 'সমরকন্দ সাইঘল-এ রুই-এ-জামিনস্থ' — এর অর্থ, 'সমরকন্দ পৃথিবীর সৌন্দর্যের আকর'।

আমির তাইমুর গুরাগান অথবা তৈমুরলঙ্গকে বলা হত 'পৃথবীর ও ধর্মের দন্ড'। সেই নৃশংস বিজয়ী জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, সেইস্তান, দক্ষিণ রাশিয়া, ভারতবর্ষ ও এশিয়া মাইনরের শত শত সমৃদ্ধশালী নগরকে ধূলিসাৎ করে, তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের সাম্রাজ্যের রাজধানী সমরকন্দকে 'বিশ্বের কেন্দ্রে' পরিণত করতে। যে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল বিজিত দেশগুলির লুঠ করা ধন, নিজের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তা ধসে পড়ে, তৈমুরলঙ্গের নাতি উলুগ-বেগ না থাকলে সম্ভবতঃ এই সাম্রাজ্যের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকত না।

উলুগ-বেগ মাত্র পনেরো বছর বয়সে সমরকন্দের রাজা হন। তাঁর সময়ে, সংক্ষিপ্ত হলেও, শিল্প ও বিজ্ঞানের আশ্চর্য অভ্যুত্থান ঘটে। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল, সবসময়েই বৈজ্ঞানিক ও কবির সঙ্গে থাকতেন তিনি। ঠাকুর্দার জীবিত কালে আরম্ভ করা বাড়িগুলিকে শেষ করে তিনি সমরকন্দে একটার পর একটা অনেক মাদ্রাসা, গণ স্নানাগার, বাণিজ্য সংক্রান্ত গৃহ ও অন্যান্য সরকারী ভবন তৈরী করেন। কিন্তু তাঁর সময়কার সব চাইতে বিস্ময়কর স্মৃতিচিহ্ন হল জ্যোতিষ মানমন্দির।

সমরকন্দের একটি মিউজিয়ামে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে ছাপা ছবির কপি। এতে দেখা যায় জ্যোতির্বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উরেনিয়ার ডান দিকে পৃথিবীর ছ'জন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদের সঙ্গে উলুগ-বেগ বসে আছেন গোল টেবিলে তাঁর বিশিষ্ট আসনটিতে। এই পণ্ডিতদের ভিতর আছেন টলেমি, কোপার্নিকাস ও টিহ্ দ'ব্রাগে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে উলুগ-বেগ বহু বই লিখেছেন। এর মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হল 'জিজ-এ-গুরোগানি'—জ্যোতিঃশাস্ত্রের তালিকা ও তারাদের পরিচয় যা একশ বছর পরেও ইউরোপীয় লোকদের তালিকা ও পরিচয়ের চাইতে অনেক বেশী সঠিক। বিখ্যাত লাপ্লাস যথার্থই তাঁকে বলেছেন 'মহোত্তম পর্যবেক্ষণকারী'।

সমরকন্দের কাছে একটি পাহাড়ের উপর একা দাঁড়িয়ে আছে রঙীন টাইল ঢাকা একটি নূতন বাড়ি। উলুগ-বেগ মানমন্দিরের যে অংশটুকু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সোভিয়েত মানুষরা ওর উপরে এই মণ্ডপ তৈরী করে। এর ভিতরে ঢুকলে পাঁচ শতাব্দী আগেকার কথা মনে হয়। দুই সারি সোপান চলে গেছে পাহাড় কাটা আধো অন্ধকার পরিখার মধ্যে। মার্বেল পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা এবং দ্রাঘিমাবৃত্তের হিসেবে অবস্থিত একটি বিরাট কোয়াড্রান্টের (অথবা কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে সেক্সটাণ্ট) দুইটি বৃত্তের চাপ সিঁড়িদুটির মাঝখানে উপরের দিকে উঠে গেছে। মাটির নীচের ঘরটা স্যাঁৎসেঁতে, তাই গরম আলখাল্লা পরে চিন্তাশীল ও জ্যোতির্বিদ উলুগ-বেগ কোয়াড্রান্টের উপর দিয়ে অপসৃয়মাণ তারা দেখার জন্য এক এক করে ঐ ধাপগুলি বেয়ে উপরে উঠতেন। উলুগ-বেগের মৃত্যুর বহু দশক বাদে আলিশের নাভোই লিখেছেন: 'উলুগ-বেগ বিজ্ঞানের দিকে হাত বাড়িয়ে অনেককিছু লাভ করেছেন; আকাশ নেবে এসেছে তাঁর দৃষ্টির সামনে।'

উলুগ-বেগের নির্দেশমত বুখারা মাদ্রাসার প্রবেশ দ্বারে যে কথা লেখা হয়েছিল তা এখনও আছে: 'স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মুসলমানের কর্তব্য হল নিজের মনকে আলোকিত করা।' উলুগ-বেগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তরুণরা শুধু ধর্মশাস্ত্রই পড়ত না,

বৈষয়িক বিজ্ঞানেরও চর্চা করত: এর মধ্যে ছিল ইতিহাস, ভূগোল এবং স্বভাবতঃই জ্যোতিষবিদ্যা। 'ধর্ম কুয়াসার মত মিলিয়ে যায়, রাজত্ব ধ্বংস পায়, কিন্তু বিজ্ঞানীর কাজ চিরদিন বেঁচে থাকে,' তিনি বলতেন। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা যেমন গ্যালিলিওকে ঘৃণা করত, গোঁড়া মুসলমান মৌলবীরা উলুগ-বেগকে তেমনি ভয়ংকর ঘৃণা করত।

কিন্তু উলুগ-বেগ রাজা, পিতামত তৈমুরলঙ্গের সাম্রাজ্য তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে, মৌলবীরা গিয়ার্দানো ব্রুনোর মতো তাঁকে না পারল পোড়াতে, না পারল গ্যালিলিও-র মতো তাঁকে দিয়ে নিজের মতামত প্রত্যাহার করতে। তাই ষড় করল তারা আবদুল-লতিফের সঙ্গে; উলুগ-বেগের এই ছেলেটির ইচ্ছে ছিল রাজা হওয়া। ভাড়া করা লোক দিয়ে বাপকে হত্যা করাল সে। উলুগ-বেগকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হল না, ওরা মানমন্দিরটিকে ধ্বংস করে ভূগর্ভের অংশকে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিল যাতে এর স্মৃতি পর্যন্ত লোপ পায়। কিন্তু সাধারণ লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানমন্দিরটির কথা মনে রাখে তাদের কাছে এই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মানবহিতৈষীর স্মৃতি পবিত্র ছিল। উজবেকিস্তানে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটল, আমাদের দু'জন সমসাময়িক নিজের মতো করে সেই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তুললেন। এঁদের নাম উলুগ-বেগের সঙ্গে জড়িত।

উলুগ-বেগের জীবন ও শোচনীয় মৃত্যুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু উজবেক সুরকারের শিক্ষক আলেক্সেই কজলভ্স্কি তাঁর শ্রেষ্ঠ অপেরা সৃষ্টি করেন। চাইকভ্স্কি ও উলুগ-বেগের জন্মভূমির দুই সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি এই অপেরায় মিলিত হয়ে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করল। মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এটা অসম্ভব মনে হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সবপ্রথম ইউরোপীয়দের গান শোনেন তাঁর মনে হয়েছিল এটা পাখির কাকলীর এক অদ্ভুত অনুকরণ। রুশ লেখক নিকলাই কারাজিন যখন সবপ্রথম উজবেক সঙ্গীত শোনেন তিনি নিশ্চিত ধারণা করেছিলেন ওরা কারও মৃত্যুতে বিলাপ করছে। আজ এমন একজন রুশ বা উজবেক নেই (একেবারে সঙ্গীত রস বঞ্চিত ছাড়া) যাদের একজন আর এক জনের সঙ্গীতের মধ্যে গভীরভাবে বিচলিত করার মতো, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো এবং মহৎ কাজে অনুপ্রেরণা জাগাবার মতো জিনিস খুঁজে পায় না।

কিন্তু যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তাদের বিশালতা, প্রসার ও গভীরতা আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ কারি নিয়াজভের চমৎকার বইটিতে। এ বইটি হল 'উলুগ-বেগের জ্যোতির্বিদ্যার পদ্ধতি'। খুব বেশী দিনের কথা নয় মধ্য এশিয়ায় ছিল শুধু রুশ

বৈজ্ঞানিক। কারি নিয়াজভ উজবেক বিজ্ঞানের অগ্রদূত। তখন থেকে আজ পর্যন্ত শত শত উজবেক নরনারী মস্কো, তাসখন্দ, সমরকন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েছে। আজ তারা নিজেদের মেন্দেলেয়েভ, মিচুরিন, কোপার্নিকাস ও উলুগ-বেগের প্রদত্ত সম্পদের সরাসরি উত্তরাধিকারী বলে মনে করে।

সমরকন্দের সঙ্গমস্থল রেগিস্তান পাথর শিলা বাঁধান এক বিরাট চত্বর। এর তিনদিকে বিরাট মাদ্রাসা। এদের রৌদ্রালোকিত দেয়াল ও মিনার বহু বর্ণের টাইল-শোভিত। এদের তুলনায়, বিপুল তোরণের নীচে বিশাল আর্চ বিশেষ করে অন্ধকার মনে হয়।

কোন কোন জায়গায় দেয়ালের মোজেইক নষ্ট হয়ে গেছে। রেগিস্তানের মাদ্রাসা টিল্লা কারির উঠোনে ঢুকলে চোখে পড়বে হুজরাতে (ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ যার ভিতর মুসলমান ধর্ম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাস করত) পাকা-দাড়ি উসতোস বা লোক শিল্পীদের। এরা নষ্ট-হয়ে-যাওয়া মোজেইকের জায়গায় নূতন করে ছবি আঁকছেন কিংবা প্ল্যাস্টারের কারুকার্য উদ্ধারের জন্য কোন নক্সার সূক্ষ্ম প্যাটার্ণ তৈরী করছেন। সমরকন্দ স্থপতি বিভাগের পুনঃসংস্কার চিত্রশালাটি এখন টিল্লা কারিতে। এর কাজ হল প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলিকে রক্ষা করা।

রেগিস্তানের উল্টোদিকে একটি আরামপ্রদ গণ উদ্যান। এর সতেজ সবুজ কুঞ্জ আর গাছ গাছড়া চত্বরের জৌলুষ আরো বাড়িয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আলিশের নাভোইয়ের নাম লেখা একটি চাখানা। বাড়ির চাঁদোয়া-ঢাকা সামনের দিকটায় কবির একখানা প্রতিকৃতি এবং এর দেয়ালের গায়ে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর চিত্রাকার প্যানেল।

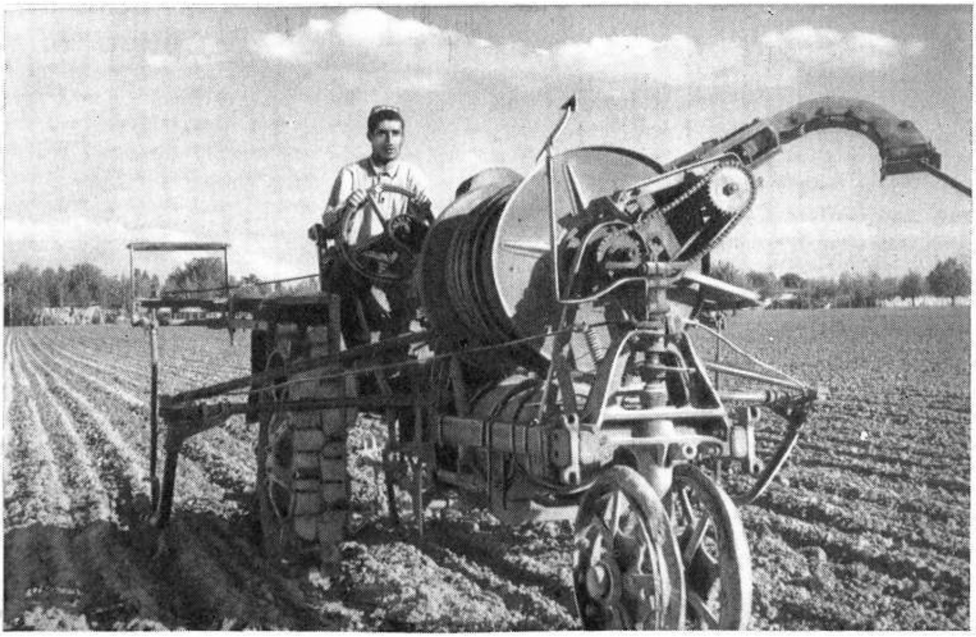
নিজামদ্দিন আলিশের তাঁর কবিতার নীচে 'নাভোই' (সুশ্রাব্য) বলে নাম সই করতেন। ইনি উজবেকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি। পাঁচশ বছর আগের লেখা হলেও তাঁর কবিতাগুলির দীপ্তি ম্লান হয়নি — এরা শাশ্বত। কবিতাগুলি লঘু ও সুপাঠ্য। জীবন ভোর যার জয়গান তিনি করে গেছেন বলে শুধু নয় বিশেষ করে তাঁর রচনার সেই প্রধান বিষয়বস্তু, আমাদের যুগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। এই বিষয়বস্তু হল মানুষের শ্রম। যে প্রাণফূর্ত শ্রম পৃথিবীর রূপান্তর ঘটায় এবং পার্থিব সবকিছুর ঊর্ধে যার স্থান। আলিশেরের জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর। আজকের উজবেকিস্তানে এমন একজনও শ্রমিক বা যৌথখামারী নেই আলিশেরের কবিতার লাইন যার মুখস্থ নেই, বুদ্ধিজীবীদের কথা না হয় নাই বললাম। ঘোর বিতর্কই হোক বা গল্পগুজবই হোক লোকেরা তাদের মতামত ও মন্তব্যকে সমর্থন করার জন্য মহান আলিশেরের বাণী উদ্ধৃত করে। আইবেকের একটি উপন্যাসে কবির জীবন



বুলুঙ্গুর রাষ্ট্রীয় খামারে আঙুর তোলা।

বুখারায় ভরশিলভ মাধ্যমিক স্কুল।





তুলো ক্ষেতে বৈদ্যুতিক কালটিভেটর।

গাল্লা আরাল রাষ্ট্রীয় খামারে বীজ বপন চলেছে।



বর্ণিত হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের থিয়েটারগুলোতে আ. উইগুণ ও ই. সুলতানভ কর্তৃ প্রযোজিত নাটকে এবং কামিল ইয়ারমাতভ কর্তৃক প্রযোজিত ছায়াছবিতেও তাঁর জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু আলিশেরের মূর্তি বিশেষভাবে জীয়ন্ত হয়ে উঠবে, তাঁর কবিতার আত্মিক জোর আরও স্পষ্ট হবে যদি যাওয়া যায় প্রাক্তন পুরোনো সহরের প্রধান রাস্তা রেগিস্তান স্ট্রীটে। অপরাহ্নে যখন দিনের উত্তাপের হাত থেকে মুক্তির আভাস মেলে ঠান্ডা বাতাসে, তখন তাজিক লেখকদের উপাচার্য সাদ্রিদ্দিন আইনি বেড়াবার জন্য নিজের ছোটো উঠোন ছেড়ে বাইরে আসেন। ইনি সেই স্বল্প সংখ্যক লোকদেরই একজন যিনি বুখারার আমিরের অন্ধকার শাসনকালে নাভোইয়ের ভাবধারা ও নীতিকে অনুসরণ করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

বুখারার আমির আইনিকে বেত লাগায়। পরে কখন তার একথা মনে পড়ে যায় যে 'বেতের দাগ মিলিয়ে যায় কিন্তু কথার দাগ মেলায় না,' তখন যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয় তাঁকে যাতে 'আমিরের মহিমাকে হানি করতে পারে,' এমন সব কথা প্রজাদের কাছে পেঁছিতে না পারে। ১৯২০ সালের বুখারা বিপ্লবে আইনি মুক্তি পান। আমিরের বেতের দাগ মিলিয়ে গেছে। তিনি গল্প ও উপন্যাস লেখেন, এমন কথা লেখেন যা 'মিলিয়ে যায় না'। অধুনা অতীতের যা কিছু দায়ভাগ তাকে সক্রোধে ধিক্কার দেন, গুণগান করেন মানুষের সেই মেহনতের যার প্রথম বন্দনা উজবেকিস্তানে করে গেছেন আলিশের নাভোই।

পাঁচ শ' বছর আগে নির্বাসিত নাভোই রেগিস্তান স্ট্রীটে চলাফেরা করেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন মানুষের সুখের, অনাগত শতাব্দীর বুকে তার অস্পষ্ট ছবি দেখেছেন সেই রেগিস্তান স্ট্রীটের সর্বত্র আজ প্রাণের স্পন্দন। এই প্রাণ ফুটে উঠছে বই হাতে বিশ্ববিদ্যালয়গামী মেয়েটির লঘু পদক্ষেপে, উন্মুক্ত চাখানায় দাবার ছকের উপর ঝুঁকে-পড়া ছেলেদের গোলাপী গালে, দুজন পথচলতি ইঞ্জিনিয়ারের সহাস্য অভিভাবদনে। এরা পুরোনো বন্ধু। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাস্তার ভীড়ে বিকেল বেলায় সাদ্রিদ্দিন আইনির সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। তিনি তাঁর লাঠি ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলতেন। সমস্ত পথিকরা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাত। এমন কি সাইকেলওয়ালারাও সাইকেল থেকে নেমে নমস্কার জানাবার জন্য বুকের উপর হাত রেখে মাথা নীচু করত। এ সবকিছুই সেই জীবন্ত বন্ধনের প্রতীক যা অনেক শতাব্দী ধরে জনগণকে তাদের মহান কবি নাভোইয়ের সঙ্গে একাত্ম করে রেখেছে।

৩। সমরকন্দের গরিমা

লোকসংখ্যা, শ্রমশিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে উজবেকিস্তানের মধ্যে সমরকন্দের স্থান দ্বিতীয়। এর অনেক মহল্লাই দেখতে অনেকটা তাসখন্দের মতো। তাসখন্দের মতো এর বড় বড় কলকারখানা আছে, রাত্রিতে এগুলিতে আলো জ্বলে ওঠে, যন্ত্রের শব্দে চারদিক মুখরিত হয়। তাসখন্দের শ্রমিকদের বসতির মতো সাদা ঘরবাড়ি সবুজ গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। তাসখন্দের মতো এর স্ট্যাডিয়াম, সংস্কৃতিভবন ও পার্কে হাজার হাজার লোকের ভীড়। রাস্তাগুলির পাশে গাছের সারি আর তার পাশ দিয়ে শীতল ছায়ার নীচে বয়ে চলেছে আরিকগুলো। এমন রাস্তাও আছে যার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কারাগাছের সারি, এখানে দেখতে পাওয়া যায় মূল্যবান বিরল গাছ যেমন সিকোয়িয়া আর জলা সাইপ্রেস। সমরকন্দবাসী এই গাছগুলি আগন্তুকদের দেখিয়ে আনন্দ পায়। তাসখন্দের মতো এখানকার দোকানের জানালাগুলি প্লেট কাঁচে ঢাকা, তার উপর আরামপ্রদ ছুটন্ত বাসের ছায়া পড়ে। ট্রাম, মোটরকার ও মানুষের চলমান ভীড়ের মাঝখানে মাঝে মধ্যে কাঁচে ভেসে ওঠে গোলাপের সাজি হাতে ফুলওয়ালী। এক কথায়, সমরকন্দকে বলা চলে দ্বিতীয় তাসখন্দ। ছোট কিন্তু বেশী আরামপ্রদ সম্ভবত।

সহরের পুরোনো ইতিহাস স্মরণ করে সমরকন্দবাসী সহরের শিল্পকলার ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলে। এ নিয়ে সব উজবেক জনগণের গর্বের যথার্থ কারণ আছে। এরা বলে এক হাজার বছর আগের সমরকন্দের ধাতুশিল্পীদের তৈরী জীনের রেকাব, ঘোড়ার মুখের শিকল ও ছুঁচের কথা। সমগ্র প্রাচ্যে এর খ্যাতি ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সমরকন্দে চীর কাগজ আবিষ্কৃত হয়। এর নাম ছিল 'সমরকন্দ কাগজ'। দশম শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলিতে চামড়ার ও নলখাগড়ার কাগজের বদলে এই কাগজ চালু হয়।

'প্রেমহীন মানুষ গাধার সমান, আর আকাঙ্ক্ষাহীন মানুষ কাদার মত' — উজবেকিস্তানের লোকেরা এ কথা বলে। প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার জন্য মাথা উঁচু করে জীবনের পথে এগুনো উচিত কিন্তু 'যে মুহূর্তে গরীব মাথা তোলে অমনি বাইয়ের পাথর পড়ে তার উপর।' এই প্রবাদের সৃষ্টি কত যুগ আগে কিন্তু বিপ্লবের পরে এর অর্থ হারিয়ে গেল। সোভিয়েত রাষ্ট্র বাইদের উৎখাত করার পর মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা বিকাশের এত বিপুল সুযোগ এল যে তাদের পূর্বপুরুষরা হাজার হাজার বছর ধরে যে সাফল্য ও খ্যাতি লাভ করেছে এরা ৩০ বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে তাকে ছাপিয়ে গেল।

এদের পূর্বপুরুষ — কারিগর ও দেখানদের প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা মধ্যযুগের প্রভুদের চাবুক আর তরবারীর ভয়ে মাথা তুলতে পারেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রধান শিল্প সহরগুলির প্রখ্যাত নামের মত সমরকন্দের নামও দেখা যাবে 'কিনাপ' কারখানায় তৈরী ট্রান্সফরমারে, টেনসন স্টেবিলাইজারে, সেলেনিয়াম রেক্টিফায়ার ও অন্যান্য বহুবিধ যন্ত্রে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২ তলা ভবনে তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া ও উক্রেনের বিজ্ঞান আকাদমীর গবেষণা ইন্স্টিটিউটগুলোতে 'কিনাপের' যন্ত্রপাতি দেখা যায়।

গ্রীষ্মকালে একটি সোভিয়েত সহরের কেন্দ্রীয় রাস্তা দিয়ে চললে সুবেশ জনতার মধ্যে নজরে পড়বে রঙীন উজ্জ্বল সিল্কের পোষাক পরা মেয়েদের। কয়েক ধরনের সিল্ক তৈরী হয় সমরকন্দের রঙীন সিল্ক মিলে। কিংবা কোন একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে গিয়ে গদিওয়ালা আসনের উপর বসলে লক্ষ্য করা যায় যে কার্পেটটি দিয়ে এই আসনটি মোড়া তাও বোধ হয় তৈরী সমরকন্দে। এমন হতে পারে যে এটি তুর্কমেনের তৈরী, কিন্তু যে রঙীন সিল্ক সুজানাটি দেয়ালে ঝুলছে ওটা অবশ্যই সমরকন্দের, কারণ সব চাইতে সেরা সুজানা এখানেই তৈরী হয়। এর খ্যাতি পৃথিবীময়।

আরও বহু জিনিসে সমরকন্দ কারখানার ট্রেড মার্কা আছে। মদের বোতল থেকে সুরু করে (স্থানীয় মদের কারখানা প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সর্ববৃহৎ), টিনের ফল, চা, সিগারেট, বুট ও জুতো, সোয়েটার ও স্যুটে পর্যন্ত এই ট্রেড মার্কা।

সমরকন্দের আরও গরিমা এর বিজ্ঞানীদের জন্য। সমরকন্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের কারাকুল উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা ইন্স্টিটিউট — কারাকুল উৎপাদন বিজ্ঞানের বিশ্বকেন্দ্র। যে সব সমস্যা নিয়ে ইন্স্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে কাজ করছেন তার অন্যতম হল কি ভাবে কারা কুম মরুভূমির সুদূরবর্তী ও জনশূন্য 'কালো বালির' গোচারণ অঞ্চলের অংশকে কালো, ধূসর, বাদামী ও সোনালী কারাকুলের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করা যায়।

মধ্যযুগের একটি ইউরোপীয় কাহিনীতে বলা হয়েছে যে দুজন তীর্থযাত্রী লাঠির ভিতর লুকিয়ে রেশমপোকার ডিম সমরকন্দ থেকে ইতালীতে নিয়ে যায়। কাহিনীতে জানা যায় যে সমরকন্দের লোকেরা তাদের রেশম উৎপাদন কৌশলকে গোপন রাখত কিন্তু ধূর্ত তীর্থযাত্রী তাদের উপর টেক্কা মারে। এর ফলেই ইতালীতে রেশমের উদ্ভব। সমরকন্দে রেশমপোকা প্রজনন ও নির্বাচন কেন্দ্রটি দেখলে কাহিনীটি মনে পড়ে যায়। এই কেন্দ্রের কর্মীরা ডিম ফুটাবার নূতন যন্ত্রটি দেখাবে। সম্প্রতি উদ্ভাবিত হলেও এই ধরনের যন্ত্র

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু প্রজাতন্ত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এ ছাড়াও দেখা যাবে রেশমপোকার নূতন ও দামী সাদা গুটি। এর উদ্ভাবন করেন সমরকন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মী সাতিবালদিয়েভ। এই জাতের ডিম আমাদের রেশম উৎপন্নকারী সমস্ত প্রজাতন্ত্রে এবং বিদেশের কয়েকটি জায়গায় পাঠান হয় ডাক যোগে, তীর্থযাত্রীর লাঠির ভিতরে নয়।

নিজেদের আবিষ্কার নিজেদের লোকেদের মধ্যে গোপন রাখার সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের কোন কারণ নেই। এ কাজ করেন না তারা। একটা উদাহরণ দিই। সমরকন্দ রেশমপোকা উৎপাদকদের উদ্ভাবিত পন্থার বিস্তারিত আলোচনা তথা প্রচারের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষিবিজ্ঞান সংক্রান্ত লেনিন আকাদমী ১৯৫১ সালের শরৎকালে সমরকন্দে রেশমপোকা উৎপাদন বিভাগের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ডাকে। ঐ সময় সমরকন্দের রেশমপোকা উৎপাদনকারীরা বহু সমস্যার সমাধান করেছিল। এই অধিবেশনে কেবল মস্কো ও তাসখন্দের গবেষকরাই যোগ দেননি, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিয়া, তাজিকিস্তান ও কিরগিজিয়ার গবেষকরাও যোগ দেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার জন্যও সমরকন্দের গরিমা বেড়েছে: এই সহরটি প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ শিক্ষা কেন্দ্র। বহু ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ্যাবিদ্, গণিতশাস্ত্রজ্ঞ, জীববিদ্যাবিশারদ, ভূমিতত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভূগোলজ্ঞ সমরকন্দে শিক্ষা পেয়েছে বলে এবং উজবেক রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছে বলে গর্ব অনুভব করে। প্রতি বছর সমরকন্দের কলেজগুলো প্রজাতন্ত্রকে যোগান দেয় নূতন ডাক্তার, কৃষিবিদ, অর্থনীতিজ্ঞ ও শিক্ষকের।

শিল্পীরাও সমরকন্দের গৌরব বাড়িয়েছে। শিল্পীদের সভা সমিতিতে সেই সব নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা রঙীন সিল্ক মিলে সিল্ক বস্ত্রের নক্সা আঁকে। উজবেক জাতীয় ঐতিহ্যের বিকাশ এবং সিল্ক প্যাটার্ণের কৌশলে নূতনের প্রবর্তন সম্পর্কে এই সব সভায় তুমুল আলোচনা হয়।

সমরকন্দে 'ক্রাসনি দ্ভিগাতেল' কারখানাতেও শিল্পকলা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার ঢালাই বিভাগের দস্তা-ছাওয়া ছাদের উপর বাবলা গাছের শাখা আনত হয়ে আছে, এইখানে দেখা যাবে ইনায়াতুল্লা নারজুল্লায়েভকে। ইনি কারুকার্যময় লোহা ঢালাইয়ের কাজে ওস্তাদ, দেখা যাবে ইনি গম্বুজাকৃতি ফারনেসের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, ঘরের মেঝেয় ধাতুর গুঁড়োর চমক।

বাপ ঠাকুর্দার মতো ইনিও যৌবনকালে কাঠকয়লার উপর ব্রোঞ্জ, টিন ও তামা গলাবার

জন্য একটা ভস্ত্রা ব্যবহার করতেন, সোনার জন্য ব্যবহার করতেন নিজের তৈরী মোচাকৃতি গ্রাফাইটের মুচি। গড়তেন জিন লাগাবার বকলেস, ঘোড়ার মুখ-শিকল, ব্রেসলেট এবং সুন্দর কুমগান, অর্থাৎ লম্বা বাঁকান ঘাড়ওয়ালা ব্রোঞ্জ-গড়া জগ। ১৯৪২ সালে তিনি কারখানায় যোগ দেন এবং ছাঁচের নম্যতার জন্য ছাঁচে-ঢালা লোহার কাজ নেন। কিছু দিন তিনি উরালে কাজ করেন এবং রুশ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আকৃতিবিশিষ্ট ঢালাইয়ের কাজ শিখে উঁচু দরের ঢালাইকারী হিসেবে সমরকন্দে ফিরে আসেন। বর্তমানে ফসল কাটাই কমবাইনের বাড়তি যন্ত্র, বৈদ্যুতিক কেন্দ্রের জটিল ইউনিট ও নানা যন্ত্রপাতির উৎপন্নকারী বিরাট কারখানায় তাঁর কাজ। কারুকার্যময় ঢালাই বিভাগের কর্তা তিনি।

উজবেকিস্তানের লোক 'প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নির্বাচন' ছবি জানে, কারণ সমরকন্দের শিল্পী জিনাইদা কভালেভস্কায়ার আঁকা এই ছবিটি সকলেরই প্রশংসা পেয়েছে। এর বিষয়বস্তু সেই জনগণ যারা তাদের রাষ্ট্রের কর্তা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে নির্বাচন দিনে একটি ভোট কেন্দ্রকে। ঘরটি আলো বাতাসে ভরা, সুন্দর করে সাজানো। ঘরের সাজসজ্জায়, লোকদের পোষাকে, এবং এমনকি মায়ের সঙ্গে-আসা একটি ছেলের মাথায় তুবেতেইকার শোভা-বাড়ানো উজ্জ্বল রঙ-করা পেঁচার পালকে উজবেকিস্তানের একক বৈশিষ্ট্য ও রঙের পরিচয় মেলে। ছবির মাঝখানে একজন উজবেক স্ত্রীলোকের মূর্তি। সে বাক্সের মধ্যে ভোটপত্র দিচ্ছে, মুখ গম্ভীর। কাকে সে ভোট দিচ্ছে? সম্ভবত সমরকন্দের 'হুজুম' সিল্ক-গুটানো কারখানার বিখ্যাত কর্মী বাহোর আন্নাকুলোভাকে বা অন্য কোনও কমিউনিস্ট অগ্রগামী শ্রমিককে। ছবিটি দেখলে প্রার্থীর নাম আন্দাজ করা মুশকিল। মুখগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যায় কিসের জন্য এরা এবং ঐ স্ত্রীলোকটি ভোট দিতে এসেছে।

ওরা এসেছে সেই সরকারকে ভোট দিতে যে তাদের সহরে গড়ে তুলেছে সমাজতন্ত্রী কারখানা ও মিল, স্কুল ও কলেজ, গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, থিয়েটার, সংস্কৃতি ভবন, তৈরী করেছে পার্ক, এমনকি একটি কৃত্রিম হ্রদও যার নাম তাসখন্দের মতো কমসোমল লেক। এক কথায় তারা সেখানে এসেছে সোভিয়েত শাসনকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দিতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তারা সবাই জানে অন্যান্য সোভিয়েত লোকদের মতো সমরকন্দবাসীদের জীবনকে সুন্দর ও সুখী এবং আমাদের মহান যুগের উপযোগী করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কতখানি কাজ করেছে।

৪। ফলের বাগানে

সমরকন্দের জীবনে কিছু দিনের জন্য নিবিষ্ট হলে দেখা যাবে, প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও বিভিন্ন কাজে রত লোকদের যে জিনিসটি একই সূত্রে গেঁথে দিচ্ছে তা হল বেশী তুলো উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম। সমরকন্দের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এতে নয়, এর বৈশিষ্ট্য হল বাগান আর ফলে।

সমরকন্দের ফল নির্বাচন পরীক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি মধ্য এশিয়ার সর্বত্র। সহরের লোক এর নাম রেখেছে 'পমোলজিক্যাল বাগান'।

সহরের চার পাশে অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও ফেব্রুয়ারীর শেষে বাদাম গাছ ফুলে ভরে ওঠে। এদের সাদা ফুলগুলো যেন কাগজ দিয়ে তৈরী। এরাই হল বসন্তের প্রথম রঙ। তারপর আসে সৌগন্ধের মাস, ফুলন্ত গাছের মিষ্টি, মাতাল-করা গন্ধ। এ সময় যে কোন উজবেক মরূদ্যানের উপর দিয়ে বিমানে করে গেলে মনে হয় নীচে মাটির উপর সাদা, গোলাপী ও রক্তাভ লাইলাকের ঢেউ বয়ে চলেছে, লোকেরা যেন তাদের ছোট ছোট রাস্তা আর ঘরগুলিকে বানিয়েছে এই রঙ ভরা ফেনিল সাগরের ঢেউকে ধরে রাখার জন্য।

নাবার মুখে এই পুষ্প ঝড়ের পরিধি বেড়ে যায়। আলো মাখা ফুলের পাপড়ির রঙ ও পেলবতায় এগুলিকে মনে হয় স্বচ্ছ, অপার্থিব ও কম্পমান। ছুটন্ত বাতাস পাপড়িগুলোকে শাখার থেকে খসিয়ে আনে, হাওয়ায় ভেসে বাসা বাঁধে বাড়ির উপর, রাস্তার পাশে, তুবেতেইকা ও টুপির উপর, ঢুকে পড়ে খোলা জানলার ভিতর দিয়ে। আরিক ও পুকুরগুলো ঢাকা পড়ে সাদা ও গোলাপী ফেনায়। এই মাসটিতে দুধ আর সুপ থেকে পাপড়ি সরাতে সরাতে মেয়েরা গজর গজর করে কিন্তু তাদের মেজাজ সরস থাকে। সমরকন্দে এমন কে আছে যে শোবার সময় শার্ট খুলে তার নীচে ফুলের পাপড়ি না দেখতে পায়—দুমড়ে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধটুকু মরেনি।

জুন মাস থেকে ফল পাকতে সুরু করে, একটার পর একটা বছরের শেষ পর্যন্ত পাকতে থাকে। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা খুবানীগুলোকে মনে হয় ছোট ছোট চাঁদের মতো। এদের পরেই দেখা দেয় উজ্জ্বল গোছা গোছা মিষ্টি চেরি, সুন্দর কানের দুলের মত কালো চেরি আর ধুলোর মত আভা কুলের দল। ছোট ছোট বেগুনী-গাল আপেলের পর আসে পাটল-গাল, সোনালী, লেবু-হলুদ, চায়ের মতো বাদামী, সাফরান, ইঁট-লাল ও ঘোর-লাল রঙের আপেল। পিয়ারগুলো এত স্বচ্ছ যে তাদের খোসার ভিতর দিয়ে

বীজগুলি পর্যন্ত চোখে পড়ে। এরই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আর এক জাতের পিয়ার যাদের ঘোলাটে সবুজ দেখে লোভ হয় না, কিন্তু কামড় বসাতেই এর চটচটে, সুগন্ধি মিষ্টি রসের হাত থেকে পোষাক সামলাবার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়। নেকটারাইন (পীচফল বিশেষ) ও নরম পীচফলগুলি ফলকের মতো পাতার মাঝখানে রোদ পোয়ায়, এদের পাতা থেকে ছায়া পাওয়া যায় না বললেই চলে। নখ দিয়ে খুঁটে, এক টানে পীচের খোসা ছাড়িয়ে ফেলা যায়, শাঁস বেরিয়ে পড়ে গলে যায় হাতের ভেতর। তাছাড়া আছে সুস্বাদু ডুমুর, চকচকে, সুগন্ধি কুইন্‌স্‌ এবং শক্ত ডালিম। ডালিমের মধ্যে রস এমন গাঁজিয়ে ওঠে যে মনে হয় যে কোন সময় ফট করে ফেটে যাবে। খোসার মাঝখানে গর্ত করে হাত দিয়ে চেপে পানপাত্রের মত এর রস খাওয়া যায়।

মধ্য এশিয়ায় এক ধরনের পীচ আছে যার নাম 'রেকাবী আকৃতি ডুমুর-পীচ', বীচি থেকে এর শাঁস আলাদা করা সহজ নয় এবং অম্লতা না থাকায় খুবই মিষ্টি। পমোলজিক্যাল বাগানের কর্মী মিচুরিনপন্থীরা এলবার্ট পীচের সঙ্গে এর মিশ্রণ ঘটায়। এলবার্ট পীচ এত কোমল যে উজবেক শৈত্যে এর বাঁচা কঠিন। এই ভাবে উজবেকিস্তানে এক নূতন সুস্বাদু ফলের সৃষ্টি হল। সকালে পাকা আপেলের স্বাদ ছিল জলো, এজন্যে মিচুরিনপন্থীরা 'সকাল পাকা সমরকন্দের' সঙ্গে দেরীতে পাকা 'ল্যানড্‌স্‌বার্গ রেইনেটের' মিশ্রণ ঘটিয়ে এক সুস্বাদু দ্রুত পক্কমান সংকরের সৃষ্টি করল। ভাল জাতের পিয়ারকে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ান উজবেকিস্তানে এক কঠিন ব্যাপার ছিল, কারণ গ্রীষ্মের গরম ওরা সহ্য করতে পারে না। পমোলজিক্যাল বাগানের কর্মীরা উত্তাপ সহ্যকারী বিভিন্ন জাতের পিয়ার বানাল, তাদের নাম দিল 'সোয়ালো', 'সমরকন্দের সুন্দরী', 'জয়ন্তী'।

উজবেকিস্তানের খুবানী শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নষ্ট হত বসন্তকালীন শৈত্যে। মিচুরিনপন্থীরা এমন জাতের ফল বানাল যার ফুল ধরে দেরীতে। সমরকন্দের ফল নির্বাচন কেন্দ্র তাদের সৃষ্ট 'সোভিয়েতস্কি, নং ৭৭' খুবানী নিয়ে গর্ব বোধ করে, এতে চমৎকার স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফল জন্মায়। যে সব যৌথখামারী ক্ষুধিত স্তেপের নূতন জমিতে চাষ করছে তাদের জন্য এরা শৈত্য ও লবণ নিরোধী ফল সৃষ্টি করেছে।

বহু শতাব্দী ধরে মধ্য এশিয়ার বাজারে দিল-আফ্রুজের ('হৃদয়ের আনন্দ' এক জাতের পিয়ার) নাম শোনা যেত। গত পঞ্চাশ বছরে আমদানী হয়েছে গালভরা ইউরোপীয় নাম 'লুইজ বন দ্য আভ্রান্‌স' বা 'জোসেফিন' (এগুলোও পিয়ার)। আজকাল নূতন, মনোহারী নিজ নামের পীচফল দেখা দিয়েছে: 'স্টার্ট', 'ভাতান' (মাতৃভূমি), 'ফর্হাদ' ও 'শিরিন',

আপেলের নাম হয়েছে 'আফ্রোসিয়াবি', 'রেগিস্তানি' ও 'জরাফশান পিঙ্ক' এবং মিচুরিনপন্থী ও সঙ্কর উৎপাদকদের উদ্ভাবিত আরও বহু রকমের ফল।

এ কেবল কাজের সুরু মাত্র। পমোলজিক্যাল বাগান কর্মীদের এখনও কাটাতে হবে কত উৎকণ্ঠিত ক্ষণ, সপ্তাহ আর মাস তাদের পরীক্ষায় প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য। যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগায় প্রকৃতি হয়ত তার সব চেষ্টা সত্ত্বেও প্রবঞ্চিত করে বসবে তাকে, এক কিম্ভূত সঙ্কর সৃষ্টি করে তার শ্রমসাধ্য কাজকে বিকল করবে। অনেক ব্যর্থতা, ভুল, অন্বেষণ ও আশার মুখোমুখী হবে তারা। মধ্য এশিয়ার ফল বাছাই ও তাকে সুসম্পূর্ণ করার কাজ যতদিন না সেই স্বাভাবিক সীমায় পৌঁছয় যেখানে — কিন্তু মানুষের সৃষ্টিধর্মী শ্রম বা যে সুস্বাদু ও বিচিত্র ধরনের ফল মিচুরিনপন্থীরা বানাতে সমর্থ — নিশ্চয়ই তার কখনও সীমা থাকতে পারে না! যখন সমস্ত মরুভূমি ও পাহাড়গুলি ফলের বাগানে ছেয়ে যাবে তখনও সে কাজ চলবে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে। এ কাজে সবসময়েই তারা পাবে আরও অন্বেষণ ও আবিষ্কারের সুযোগ।

গত কয়েক বছরে সমরকন্দ একটি আশ্চর্য আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। উজবেকরা আগে কখনো লেবু, কমলালেবু বা ট্যাঞ্জারিন জন্মায়নি। সমস্ত মরূদ্যানে তারা এই সব গাছের বাগান লাগানো ঠিক করল। এই আশ্চর্য কাজে উৎসাহ দেবার জন্য সরকার ঘোষণা করল, প্রতি ২·৫ একর জমিতে সার্থক ভাবে সাইট্রাস গাছ লাগাতে পারলে যৌথখামারকে দু'টন গম বোনাস দেওয়া হবে। একটার পর একটা উড়ো জাহাজ জর্জিয়া থেকে চারা-গাছ আনতে লাগল। জর্জিয়ার লেবু জাতীয় গাছের বিশেষজ্ঞরা উজবেকিস্তানে এল নূতন গাছ লাগাবার কাজে যৌথখামারীদের সাহায্য করতে। শীতকালীন শৈত্য এবং গ্রীষ্মের তপ্ত বাতাসের দাপট থেকে লেবু, ট্যাঞ্জারিন ও কমলালেবু গাছকে বাঁচাবার জন্য উৎপাদনকারীরা ওদের বিশেষ ধরনের পরিখার মধ্যে লাগাতে সুরু করল। আজকাল স্থানীয় কমলালেবু ও লেবু উজবেকিস্তানের বাজারে দেখা দিয়েছে।

৫। আঙ্গুরের যৌথখামারে

যখন কোন উজবেক তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করতে চায় একখানা চ্যাপ্টা রুটি আর এক থোপা আঙুর খায় সে।

প্রায় প্রত্যেকটি উজবেক প্রাঙ্গণে, লালচে সবুজ পাঁচ-কোনা আঙুরের পাতা দেখা যাবে, তাদের ছায়ায় ঝুলছে মলিন আভা আঙুরের থোপা। কখনও আঙুর লতা কার্পেট

মোড়া সুপার উপর খুঁটির সঙ্গে দোল খায়, কখনও বা দু'তিনটে পীচ বা কুলগাছকে জড়িয়ে জীবন্ত দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। শরতে তাসখন্দ, ফেরঘানা বা আন্দিজানের গ্রামাঞ্চলে ফলের গাছের ছায়া-ঢাকা মাটির দেয়ালের মাঝ দিয়ে মোটরে করে গেলে ছোট্ট দরজা বা বেড়ার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়বে ফলের বাগানের পিছনে আঙুর ক্ষেত। রাস্তায় ঘন ঘন সাক্ষাৎ মিলবে চ্যাপ্টা ঝুড়ি মাথায় রঙচঙে আলখাল্লা পরা যৌথখামারীর। ঝুড়ির মধ্যে আছে এক গাদা আঙুর। ঝুড়িটাকে সে কিন্তু হাত দিয়ে ধরে না, সহজে হেঁটে চলে অভ্যেস মতো ঈষৎ দোল খাওয়ার ভঙ্গীতে, মাথা খাড়া, পেছনে হাত জোড় করা।

উজবেকিস্তানের সর্বত্র আঙুরের মর্যাদা। কিন্তু সমরকন্দের কাছে মাটির দেয়াল-ঘেরা সহরতলির বিরাট ফলের বাগানগুলি পেরুলে মনে হয়, যৌথখামার আঙুর ক্ষেতের সীমাহীন অঞ্চলে এসে পড়েছো। রাস্তা থেকে বহু ডজন মাইল ছড়ান এদের ছায়া-ঘেরা ঝোপ আর তারই মাঝে ক্ষুদে ট্র্যাকটরগুলো কাজ করছে।

সমরকন্দ উজবেকিস্তানের প্রধান আঙুর অঞ্চল আর সোভিয়েত ইউনিয়নের কিশমিশ রাজধানী। 'কিশমিশ' এক ধরনের বীচিহীন আঙুর উজবেক যৌথখামারীর প্রিয়, সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে 'রেইসিনের' প্রতিশব্দ। 'তাগোবি' ও 'নিমরাঙ', 'তাইফি' ও 'ভাসারগ' নামে ভাল জাতের আঙুর থেকেও কিশমিশ তৈরী হয়। অসাধারণ বড় চেহারার সুগন্ধি 'কত্ত-কুরগান' আঙুর থেকে তৈরী হয় 'আবজেস', পৃথিবীর সেরা মনক্কা।

শরৎকালে সমরকন্দের রেল স্টেশনে আঙুরের ট্রেন জমায়েত হয়। রেফ্রিজারেটর মালগাড়িতে ভর্তি হয় ঝুড়ি বোঝাই টাটকা আঙুর। দেখা যায় কোমল 'সুলতানির' ভারি থোপা, 'চারাশের' কালো গুচ্ছ, 'হুসেইনির' ধোঁয়া-সবুজ থোলো, এর আর এক নাম 'লেডিজ ফিনগারস'। সমরকন্দ বিমানঘাঁটি ছেড়ে আঙুর বোঝাই বিমানগুলি 'লেডিজ ফিনগারস' নিয়ে মরুভূমি ও কাজাখস্তানের প্রান্তর পেরিয়ে উত্তরে মস্কো, লেনিনগ্রাদ, উক্রেন, উরাল ও অন্যান্য জায়গায় রওনা দেয়।

উজবেকিস্তানে এমন এক ব্যক্তি আছেন সমরকন্দের লোকেরা যাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দোমুলা, অর্থাৎ শিক্ষক বলে। ইনি হচ্ছেন রিজামত মুসা মহম্মদ, দ্রাক্ষা উৎপাদনের গুণান্বিত বিশেষজ্ঞ উপাধীধারী। এঁকে বলা হয় আঙুরের যাদুকর। উজবেকিস্তানে সবাই তাঁর নাম শুনেছে। তিনি তাসখন্দের কাছে থাকেন, কাজও করেন ওখানেই কিন্তু তাঁর 'আঙুর উৎপাদনকারীর নির্দেশিকা' নামে পুস্তিকা সমরকন্দের আশেপাশের গ্রামবাসীদের অপরিহার্য সঙ্গী।

যৌথখামারের পরীক্ষাকারীরা প্রতিভাশালী, স্বশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ। এরা সাধারণত বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণ করে এবং তাদের আবিষ্কারগুলিকে জমিতে লাগায়। কিন্তু সময় সময় বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধা পায়, কৃষিবিদ যখন চিরাচরিত পন্থা আঁকড়ে থাকে। নতুন কায়দায় গবেষণা চালুকরণে বাঁধাধরা নিয়ম কাটাতে ভয় পেলে এটা ঘটে থাকে। বস্তুত কখনো সখনো মানুষের পক্ষে অভ্যাসের নিগড় কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময়ে যৌথখামারের পরীক্ষাকারীরা এগিয়ে যায়। মাঠে নিজেদের কাজে অনড় ধারণাগুলো উৎখাত করে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেবার প্রেরণা যোগায়।

যৌথখামারের পরীক্ষাকারীদের মধ্যে যারা সব চাইতে প্রতিভাবান তারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এত ভালভাবে আয়ত্ত করেছে যে বাস্তবিক পক্ষে তাদের বিজ্ঞানী বলা চলে। এদের মধ্যে সব চাইতে বয়স যাঁর বেশী তিনি রিজামত মুসা মহম্মদ। ইনি জনসাধারণেরই একজন, দাঁড়িয়েছেন নিজে নিজের পায়ে। হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত উজবেক চাষীদের অভিজ্ঞতাকে ইনি আত্মস্থ করেছেন। তাঁর কার্যকলাপ মধ্য এশিয়ার দ্রাক্ষা উৎপাদনের ভিত্তির অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে। এমনকি সমরকন্দে দ্রাক্ষা উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর এবং দ্রাক্ষা উৎপাদন সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ উজবেক বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাবের পর পঁচিশ বছর ধরে তিনি তাঁদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রবর্তী সারিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে বছরের পর বছর উক্ত বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছেন।

আজ উজবেকিস্তান থেকে 'আঙুরলতার সুরঙ্গ' বিদায় নিচ্ছে। আনত খুঁটির সঙ্গে আঙুরলতা জড়িয়ে এই সুরঙ্গ তৈরী হয়। মুসা মহম্মদ কর্তৃক প্রস্তাবিত নূতন পদ্ধতি হল 'খাড়া ভাবে ঢাকনা দেওয়া চাঁচবেড়া'। মধ্য এশিয়ার আঙুর ক্ষেতে 'সুরঙ্গের' পরিবর্তে এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। এতে শুধু আঙুর ক্ষেতের চেহারাই পাল্টে যায়নি, আঙুরের কাজে কৃষি যন্ত্র নিয়ে আসার সুবিধে হয়েছে, ফলে আঙুর-উৎপাদনে ঘটেছে বিপ্লব।

মুসা মহম্মদের 'প্রতিকল্প তত্ত্বটি' কী জিনিস? এটা দ্রাক্ষা উৎপাদনের পাঠ্য পুস্তকে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। একটা আঙুরলতা শুকিয়ে যেতে না যেতেই রিজামত একটা বাড়তি শাখাঙ্কুর থেকে নূতন আঙুরলতা বানান। যে সময় পুরোনো আঙুরলতা কাটবার সময় আসে এর বয়স্ক 'বংশধর' এরই পাশে থাকে। চাঁচবেড়ায় নূতন দ্রাক্ষালতা পুরোনোর জায়গা দখল করে এবং প্রথম বছরেই স্বাভাবিক পরিমাণ ফল দেয়।

রিজামত মুসা মহম্মদ মধ্য এশিয়ার দ্রাক্ষা উৎপাদনের প্রয়োগ কৌশলে আরও অনেক নূতনত্ব এনেছেন। এ জন্যই প্রতি গ্রীষ্মে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জায়গা থেকে আঙুর

উৎপাদনকারী, গবেষক ও যৌথখামারী তাঁর পরীক্ষামূলক আঙুর ক্ষেত দেখতে আসে। তিনি নিজেও মলদাভিয়া, জর্জিয়া, ক্রিমিয়া ও উক্রেনের বহু আঙুর ক্ষেত দেখেছেন। এটা স্বাভাবিক যে সমরকন্দের চারপাশের বহু ছেলের নামই তাদের মা বাবারা মুসা মহম্মদের নামানুসারে রেখেছে রিজামত। তাদের আশা ছেলেরাও হবে নামজাদা আঙুর উৎপাদক।

মুসা মহম্মদের বহু শিষ্য, এমন যে সাদি বোবো হাকিমভ যিনি সমরকন্দের সব চাইতে বয়স্ক আঙুর চাষী এবং যাঁর শিষ্যরা প্রচুর আঙুর উৎপন্ন করে দেশ-জোড়া খ্যাতি পেয়েছে তিনিও নিজেকে সবিনয়ে মুসা মহম্মদের শিষ্য বলে পরিচয় দেন। সাদি বোবো হাকিমভ একজন পরীক্ষাকারী এবং কমসোমল জেলার কিরভের নামে যৌথখামারের দলপতি। এটি বিখ্যাত আঙুর যৌথখামার এবং এখানকার আটজন আঙ্গুর উৎপাদক সমাজতন্ত্রী শ্রমবীর উপাধী পেয়েছেন। এর মধ্যে আছেন দলপতি জুরা খজাইয়েভ। তিনি প্রতি একরে ১২ টন আঙুর উৎপন্ন করেন। এটা অভূতপূর্ব।

তাঁর পরীক্ষামূলক ক্ষেতে প্রকৃতির এক চমকপ্রদ কান্ড লক্ষ্য করার সৌভাগ্য হয় সাদি বোবো হাকিমভের।

কুল ও খুবানীর সংকর কিম্বা অভূতপূর্ব কোন ফল দেখে আমরা আর আজকাল অবাক হই না কারণ আমরা জানি এ সবই হল মিচুরিনপন্থী চারা উৎপাদকদের কীর্তি। আমরা জানি মিচুরিনপন্থীরা প্রকৃতিকে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করিয়ে নেয়। মানুষ আজ কয়েক দশকের মধ্যে এমন খাদ্য শস্য বা ফল জন্মায় যা সৃষ্টি করতে প্রকৃতির লাগত লক্ষ লক্ষ বছর।

কিন্তু প্রথম আপেল, পীচ বা পিয়ার এল কোত্থেকে?

আমার মনে আছে তাসখন্দের প্র্জেভাল্স্কি স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমরা আমাদের প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাষ্টারকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম। তিনি একঘণ্টা ধরে আমাদের বুঝিয়েছিলেন, কি ভাবে প্রকৃতির ভিতর জৈবিক প্রক্রিয়া নূতন গাছ তৈরীর মত অবস্থার সৃষ্টি করে, কি ভাবে পরিমাণের পরিবর্তন গুণের পরিবর্তনে পরিণত হয় হঠাৎ। এক কথায় আমরা পাঠ্য পুস্তকে আগেই যা পড়েছিলাম তিনি সেই কথাই বলেছিলেন। তবু আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা কল্পনা করতে পারিনি যে এই মাটির ইতিহাসে এমন এক দিন এসেছিল যখন একটা শাখার উপর একটি আপেল দুলতে শুরু করে, আগের দিনটি পর্যন্ত যদিও পৃথিবীতে আপেল বলে কিছুই ছিল না। মানুষের মজাই এই যে প্রত্যক্ষ না করলে সে কোন কিছুই বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু সাদি বোবো হাকিমভ নিজের চোখে এই স্বাভাবিক উল্লম্ফন লক্ষ্য করেন।

প্রকৃতির পক্ষে ঘটনাটা সাধারণ, কারণ তার আয়ুষ্কাল অনন্ত, কিন্তু মানুষের জন্য অসাধারণ, কারণ তার যুগ কদাচিৎ একশ বছরের বেশী।

একদিন তাঁর দলের আঙুর ক্ষেত দেখতে যান তিনি। ওখানে আছে নূতন ও শত আয়ু আঙুর লতা। তিনি লক্ষ্য করলেন দুটো কিশমিশ লতায় কুলের মত বড় বেরি পাকতে সুরু করেছে। এই আঙুর লতা তাঁর পরিচিত, এর থেকে তিনি একাধিকবার ফল তুলেছেন। তিনি যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হলেন। বাছুরের মতো প্রকাণ্ড একটা তরমুজ দেখলে তিনি যতটা অবাক হতেন তার চাইতে কম না।

সেদিন থেকে আঙুর উৎপাদক ও কৃষিবিদদের তীর্থ হয়ে দাঁড়াল ঐ আঙুর লতা দুটি। পাকলে দেখা গেল আঙুরের মধ্যে কিশমিশের সব গুণই আছে, অর্থাৎ চিনির পরিমাণ বেশী, বীচি নেই। শরতে লতাদুটিকে সযত্নে মাটি থেকে তুলে সমরকন্দের দ্রাক্ষা উৎপাদন ইনস্টিটিউটের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে বসানো হল। পরের বছর ওতে ঠিক অত বড় বেরিই জন্মাল। এ ভাবে উজবেকিস্তানে হাজির হল বিশাল আকৃতির কিশমিশ।

কয়েক বছরের ভেতরেই নূতন জাতের এই কিশমিশ আঙুর নার্সারী থেকে যৌথখামারের আঙুর ক্ষেতে যাবে। তখন এদের বাজারে বিক্রি করা হবে, সবাই খেতে শুরু করবে এই ফল। এই ফল অনাদিকাল থেকে আছে ভেবে ছোটরা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করবে, 'কোত্থেকে এ ধরনের কিশমিশ এল?' তিনি যখন উত্তর দেবেন যে কিছুদিন আগে পরিমাণের পরিবর্তন থেকে গুণের পরিবর্তনের ফলে এর সৃষ্টি হয়েছে ওদের মনে সন্দেহ জাগবে। নিজেরা বড় হবার পর কদাচিৎ এ ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন দেখার আশা করবে। কিন্তু তারা যা করবে তা হল প্রকৃতিকে ত্বরান্বিত করা, তার নিয়মে হাত দেওয়া। এই ভাবেই ওরা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে।

এই কাজের প্রস্তুতি দেখা যাবে সমরকন্দের কাছে যে কোন আঙুর উৎপন্নকারী যৌথখামারে। যেমন যাওয়া যাক কিরভ যৌথখামারে, এর বেতার কেন্দ্র, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র, ক্লাব, ক্লিনিক, পরীক্ষাশালা ও দশ-সালা স্কুলে। সবগুলিতেই আছে স্থানীয় বিশেষজ্ঞের দল। একমাত্র ক্লিনিকের ডাক্তারকেই বলা চলে 'আগন্তুক', কারণ তিনি জন্মেছেন এবং মানুষ হয়েছেন প্রজাতন্ত্রের অন্য জায়গায়। পরীক্ষাশালায় চাষের অধীন পাঁচিশ ধরনের আঙুর নিয়ে পরীক্ষকরা গবেষণা করছেন। স্কুলে দেখা যাবে যৌথখামারীদের ছেলেরা পড়ছে উদ্ভিদবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার বই, ত্রিকোণমিতি ও ডারউইন তত্ত্ব।

এই সব ছেলেরা কী হবে। বেশী না ভেবেই বলা যায় যে এই সব রিজামত ও সৈয়দ, রসিদ ও কায়ুম এবং তাদের সহপাঠিরা হবে 'রিজামত'—বিজ্ঞানদক্ষ মানুষ।

৬। মিয়ানকালে উপত্যকা

ট্রেন সমরকন্দ থেকে পশ্চিমে কত্ত-কুরগানের দিকে এগুতে থাকে, বাঁ দিকে সামান্য দূরে বন্ধ্যা, ছাই-ধূসর উত্তুঙ্গ পাহাড় চলে সঙ্গে সঙ্গে। তেলের দাগে কালো রেল লাইন স্তেপ পেরিয়ে যায়, স্তেপটির রঙও ছাই-ধূসর। তবু এমনকি দূর থেকেও ছোট ছোট স্টেশনের চারপাশে নজরে পড়ে তুলোর পাহাড়। সূর্যালোকে ওদের সাদা রঙ এত চকচক করে যে চোখ না কুঁচকিয়ে তাকান যায় না। ওগুলো এত উঁচু যে কাছাকাছির ঘরবাড়িকে ছোট মনে হয়। এরা এল কোত্থেকে? কোত্থেকে আসে স্টেশন বাজারে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ আর পিওনি, এই মরু অঞ্চলে কী করে এল মনোহরা ফুটি, টকটকে লাল টমেটো আর ধুলো মাখা আঙুরের থোপা?

ডান দিকের স্তেপে একবার ভাল করে চেয়ে দেখুন। কাছাকাছি জায়গাটা কিছুটা পাহাড়ে আর রঙের দিক থেকে হাল্কা। দূরে একটা ছায়া আবছা দিগন্ত ঘেঁষে সমতলের উপর প্রসারিত। ট্রেন থেকে অদৃশ্য সমৃদ্ধ মিয়ানকালে উপত্যকা ঐ ছায়ার নীচে সরু ফিতার মত ছড়িয়ে আছে।

মিয়ানকালে একটি দীর্ঘ, জনবহুল মরূদ্যান। একে বলা হয় 'সুখী বসতির দ্বীপ'। হয়ত উজবেকিস্তানের এটি সব চাইতে প্রাচীন ও খুব সম্ভবত সব চেয়ে উর্বর মরূদ্যান। জরাফশান বরাবর এটি ৬০ মাইলেরও বেশি বিস্তৃত। ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যেখানে মিয়ানকালের সুরু সেখানকার নদী, কারা দরিয়া ও আক দরিয়া এই দুই নামে বিভক্ত হয়ে গেছে, সীমাহীন স্তেপ থেকে মরূদ্যানকে দুই পাশে আলাদা করে দিয়েছে।

মিয়ানকালে বেড়াবার সময় তুলোর চাষ ও ফলের বাগানের মাঝখানে অন্যান্য উজবেক মরূদ্যানের চেয়ে বেশী ঘন ঘন দেখা যায় ধানক্ষেতের বিরাট চতুর্ভুজ। মাটির আল চারিদিকে, জলভরা জমিখণ্ডগুলি ধাপে ধাপে নেমে যায়। মাথার উপর নীচু হয়ে একটা এরোপ্লেন জল-ভরা মাঠের উপর উড়ে চলে, শস্যকে খনিজ সার জোগায়। হতে পারে এটা জন স্বাস্থ্য রক্ষা মন্ত্রকের এরোপ্লেন, ম্যালেরিয়ার মশার জীবাণু ধ্বংস করছে, এই রোগ প্রকৃতপক্ষে যৌথখামার চাল উৎপাদকদের প্রধান ও ভয়াবহ শত্রু।

সবসময়েই ম্যালেরিয়া ছিল মধ্য এশিয়ার সব চাইতে ভয়ঙ্কর রোগ এবং এই রোগ বিভিন্ন আকার নিত। ম্যালেরিয়ায় এক একটা সম্পূর্ণ এলাকা ছারখার হয়ে যেত এবং

ধানক্ষেত থাকায়, বিশেষ করে মিয়ানকালেতে, এর প্রকোপ ছিল প্রচন্ড। সমরকন্দস্থ উজবেকিস্তান ম্যালেরিয়া ও মেডিক্যাল প্যারাসাইটোলজির ইন্‌স্টিটিউটের অধীনে উজবেকিস্তানের চিকিৎসক দল ম্যালেরিয়া বিতাড়নের কাজ ব্যাপকভাবে সুরু করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জায়গার মত সমরকন্দে এরা গ্যামবুসিয়া নামে একরকম ছোট মাছের চাষ করে। এরা মশার শূকেকীটকে খেয়ে ফেলে। এদের হ্রদ, নদী ও জলাধারে পোষা হয়। এ ছাড়া বিমানে করে জলাভূমি ও জলসিক্ত মাঠে কেমিক্যাল ছড়ান হয়। উজবেকিস্তানের ১০০টি ম্যালেরিয়া কেন্দ্র ও ৪৫০টি ট্রপিক্যাল কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকে সমরকন্দের গবেষকরা ম্যালেরিয়ার বহু প্রতিষেধক উপায় ও ম্যালেরিয়া বিতাড়নের বহু পন্থা বার করেছেন। যে অভিজ্ঞতার সম্পদ তাঁরা লাভ করেছেন তাতে তাঁরা মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ত্‌বিলিসি ও কিয়েভের ডাক্তার ও গবেষকদের শিক্ষা দিতে পারেন।

আকাদেমিশ্যান পাভ্‌লভ্‌স্কির ছাত্র, মস্কোর বিজ্ঞানীরা ম্যালেরিয়া বিতাড়নের ইতিহাসে কয়েকটি চমকপ্রদ পৃষ্ঠা যোগ করেছে। মধ্য এশিয়ার ধান ক্ষেতে থেকে সহজ অথচ বলিষ্ঠ কথাটা তাদের মাথায় আসে: কেমন হয় যদি লার্ভা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা সৃষ্টি হবার আগেই মাঠের জল সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা যায় তাহলে মধ্য এশিয়ার প্রখর রোদ লার্ভাগুলোকে শেষ করে দেবে?

তারা এই প্রস্তাব করল কিন্তু অভিজ্ঞ যৌথখামারী ও কৃষিবিদ্‌রা বলল লার্ভার সঙ্গে সঙ্গে রোদে ধান পুড়ে যাবে। তবু মস্কোর লোকরা হাল ছাড়ল না। তারা কৃষিবিজ্ঞান চর্চা করতে লাগল। কৃষিকৌশল সংক্রান্ত কয়েকটি পুরোনো প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল তারা যাতে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা পায়। মিত্রের অভাব হল না: কয়েকটি যৌথখামার পরীক্ষার জন্য এদের জমি ছেড়ে দিল। এখানেই জয় হল ডাক্তারদের। মিয়ানকালের আর সমগ্র প্রজাতন্ত্রের ধান ক্ষেতে যৌথখামারীরা ফসল নষ্ট না করে রোদ দিয়ে লার্ভাকে মারতে শিখল। তারা জমির জল বের করে নিয়ে পরে আবার তাতে জল ছেড়ে দিল।

কয়েক বছর বাদে এই অনন্যসাধারণ অবদানকে কাজে লাগাল ধান ফলানো গবেষকরা। তারা উজবেক পরীক্ষামূলক চাল কেন্দ্রের মাঠে এমন ধরনের বেশী সুফলা ধান বানাল যাতে কম জলের দরকার। এ ভাবে ডাক্তারদের শুরু করা স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ সম্পূর্ণ অন্য ক্ষেত্রে গবেষকদের জোরালো উৎসাহ যোগাল। হ্যাঁ, জীবনের বিভিন্ন বিষয় পরস্পরের

সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয় যারা জীবন থেকে নিজেদের কখনো আড়াল করে রাখে না।

জরাফশানের অর্থ 'স্বর্ণ বপনকারী'। এ নাম কেন? নদীর উজানির দিকে পাহাড়ে বাস করে যারা সেই তাজিকদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে জরাফশানের পলিমাটির সঙ্গে আছে সোনার গুঁড়ো। আজকালকার সোনা অন্বেষণকারীরা সোনা ধরার জন্য ড্র্যাগ ব্যবহার করে। তাদের বাপ ঠাকুর্দারা পশমের মধ্যে সোনা আটকাবার জন্য স্রোতের মুখে ভেড়ার চামড়া পেতে রাখত। কিন্তু মিয়ানকালেতে বাসকারী উজবেকেরা অন্য কথা বলবে। তারা বলবে জরাফশানের প্রতি বিন্দু জল সোনার মতো, কারণ এই জলই রূপান্তরিত হয় পরিপুষ্ট চাউলে, আঙুর ও পিয়ারের রসে অথবা 'সাদা সোনায়', তুলোতে।

তুলোর চাষে মিয়ানকালের যৌথখামারীদের গৌরব ও খ্যাতি। রাস্তা বরাবর 'প্যাখতা' (তুলা) শব্দটি নজরে পড়ে। কিশলাকের সরকারী ভবনের উপর কাঠকয়লা দিয়ে শব্দটি লেখা। সেরা দলগুলির মাঠে বসানো খুঁটির লাল নিশানে লেখা কথাটি এবং লরির সঙ্গে লাগানো লাল কাপড়ের ফালিতে লেখা ঐ একই শব্দ। মিয়ানকালেতে একটি জেলা আছে যার নাম 'পাখতাকর' বা তুলো উৎপাদনকারী।

মিয়ানকালের তুলোকেন্দ্র হল কত্ত-কুরগান সহর। কত্ত-কুরগানের সহরতলিতে আঙুর ক্ষেত ও গাছের সারি দেওয়া রাস্তা সমরকন্দেরই মতো, এর আগেকার এশীয় অংশের গলির ভিতর সমতল ছাদওয়ালা ছোট ছোট ঘর তৈরী হয়েছে সমরকন্দের কায়দায়। এর অধিবাসীদের তুবেতেইকায় বিভিন্ন রঙের সুতোর কাজ করা পাতার নক্সা দেখে সমরকন্দের কথাই মনে হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও কত্ত-কুরগান অনেক বেশী ফেরঘানা সহরের মতো যেমন কোকন্দ বা নমানগান। এখানেও রাস্তায় সাদা রঙ অর্থাৎ তুলোর রঙের রাজত্ব। এখানেও কারখানার দেয়ালের ঊর্ধ্বে তুলোর পাহাড়, তেল কলের চত্বরে তুলো বীচির স্তূপ। এগুলোও সাদা কিন্তু ছোট ছোট কুণ্ডন থাকায় মনে হয় ফেনায় ঢাকা। এর একটি কল সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো। উজবেকিস্তানের মধ্যে এটি প্রথম কারখানা যেখানে প্রেস ব্যবহার না করে কেমিক্যাল প্রক্রিয়ায় তেল বার করা হয়।

কিন্তু কলকারখানার জন্য কত্ত-কুরগানের নাম তত বেশী নয়। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত নরনারী এর নাম জানে 'উজবেক সাগরের' জন্য। কত্ত-কুরগানের প্রান্তে এই বিশাল জলাধার তৈরী হয়েছে। এটা আমাদের যুগের সব চাইতে বড় গঠন কাজের একটি।

৭। 'উজবেক সাগর'

সমরকন্দের পূবদিকে, দূরবর্তী কুহিস্তান পর্বতমালার চূড়ার মাঝখানে বিশাল পাথুরে অক্টোপাসের মত একটি প্রকান্ড হিমবাহ হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। এর থেকে অসংখ্য পাহাড়ী ঝর্ণা বেরিয়ে এসে একটি বিরাট নদীর সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মের তপ্ত দিনগুলিতে এর অবিরাম গুরু গুরু ধ্বনির সঙ্গে মেশে হাজার হাজার ফাটলের ভিতর দিয়ে হিমবাহের মধ্যে ভেঙে পড়া পাথর খন্ডের অনুচ্চ আতঙ্কজনক শব্দ। এই ভাবে জরাফশানের উদ্ভব।

প্রায় ৪৪০ মাইল পশ্চিমে, বালিয়াড়ির ভেতর কারাকুল মরূদ্যানে একটা ছোট্ট তুলোর ক্ষেত আছে। কোমরে সিল্কের রুমাল বাঁধা একজন যৌথখামারী এর আইল ধরে চলেছে। কেতমেন দিয়ে সযত্নে সে একটার পর আর একটা খাতে জল চালান দিচ্ছে। মৃদু বুদ্বুদ তুলে জলের স্রোত খাতের শেষ প্রান্তে পেঁছয়। মাটি শেষ বিন্দু পর্যন্ত জল শুষে নেয়। এইখানে জরাফশানের শেষ।

প্রাচীন দিনেই লোকেরা জরাফশানের সমস্ত জল খালের ভিতর চালান দিত। জরাফশান আর আমু দরিয়ার উপনদী রইল না। এর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠে তিনটি উর্বরা মরূদ্যান। প্রথমটি মিয়ানকালে, এর একটি প্রান্তে সমরকন্দ অপর প্রান্তে চাতিরচার আঙুর বাগান। এটা কত্ত-কুরগান পেরিয়ে। দ্বিতীয়টি বুখারা মরূদ্যান, জলের দিক থেকে গরিব হলেও আকৃতিতে বিশাল এবং প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত। তৃতীয়টি কারাকুল। জল সব চাইতে কম, আকৃতিতেও সব চেয়ে ছোট।

সমরকন্দ ও বুখারা, মধ্য এশিয়ার এই দুই মহা নগরী বিশ শতাব্দী ধরে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। কখনো সমরকন্দ হত রাজধানী। নূতন বসতি বানিয়ে আর খাল কেটে এর অধিবাসীরা ছড়িয়ে বসত আর জলাভাবে বুখারার চারপাশের ফলের বাগানগুলো যেত শুকিয়ে। তারপর আবার বুখারার ক্ষমতা যেত বেড়ে। এর শাসকরা মিরাবদের পাঠাত সমরকন্দে এই আদেশ দিয়ে, 'ভদ্র বুখারাকে' বেশী করে জল সরবরাহ করা হোক, ফলে সমরকন্দ ও কত্ত-কুরগানের কাছে বহু আঙুরের বাগান পরিণত হত যেন শুকনো ছত্রক ঢাকা পতিত জমিতে।

অক্টোবর বিপ্লবের পর সমরকন্দ ও বুখারা উজবেক প্রজাতন্ত্রের আঞ্চলিক রাজধানী হয়। প্রথমটায় উভয় অঞ্চলকে আগের মতই কম জল দিয়ে চালাতে হত। অসাধারণ উর্বর মাটি হলেও কত্ত-কুরগানের তুলোচাষীরা ফেরঘানাবাসীদের অর্ধেক পরিমাণ ফসল পেত —

কারণ জলাভাব। তখন জরাফশান যৌথখামারীরা নূতন খাল খুঁড়তে সুরু করল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জলের অভাব দূর করার কাজ সুরু হয় ১৯৪১ সালে। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে বুখারা ও সমরকন্দের এক লক্ষ যৌথখামারী কত্ত-কুরগানের সহরতলীতে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জলাধারের অন্যতম একটি নির্মাণের জন্য সোৎসাহে সাড়া দেয়। 'সোনা বওয়া নদীর' জলধারার সঙ্গে আরও ২৪,০০০,০০০,০০০ কিউবিক ফুট সেচ জল যোগান দেওয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগে।

কিন্তু কি ভাবে সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা এই জলাধার ভরাট করবেন? ওখানকার প্রান্তরে নদী, পাহাড়ী নদী বা ঝর্ণা বলতে কিছুই নেই। জরাফশান অবশ্য আছে কিন্তু এর প্রতি বিন্দু জল মহার্ঘ। সত্যি বলতে একটি আরিকের কাছে পোঁতা গাছ ঐ আরিকেরই নীচের দিকে পোঁতা গাছের জলের অংশ শুষে নেয়। এ অবস্থায়, যেখান থেকে এক কিউবিক ফুট জল নেওয়াও সম্ভব নয় কী ভাবে সেই জরাফশান থেকে ২৪,০০০,০০০,০০০ কিউবিক ফুটের জল পাওয়া যাবে?

তবু সেটা করা সম্ভব! জরাফশান এমন একটি নদী আসলে যার ২৪,০০০,০০০,০০০ কিউবিক ফুট জল দেবার কথা। কিন্তু পাঠকদের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে হলে আমাদের কল্পনা করতে হবে আমরা চলেছি কত্ত-কুরগানের অনেক পশ্চিমে জরাফশানের ভাটির দিকে, চলমান বালুর সমুদ্র ঘেরা ক্ষুদ্র কারাকুল মরূদ্যানে।

কারাকুলের অর্থ 'কালো হ্রদ'। একসময় ওখানে ছিল বিরাট এক হ্রদ। চার পাশে ছিল ঘন গাছ গাছড়া। দূর থেকে মনে হত মরুভূমির হলদে পরিবেশে কালো বিন্দুর মতো। এই হ্রদে উলুগ-বেগ শিকার করতেন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে হ্রদটি অনেকটা শুকিয়ে যায়, পর পর বিচ্ছিন্ন হয় ছোট ছোট পুকুর। বালিয়াড়ির মধ্যে ওদের দেখাত আশ্চর্য নীল। আগেকার কারাকুল হ্রদের মতো শীতকালে এই পুকুর জরাফশানের জলে ভরাট হত। শীতকালে নদীর জল অপেক্ষাকৃত নীচুতে থাকে, এসময় আরিকে জল চালান দেওয়া হয় না। দেখানরা এসময় বসন্তকালের জন্য আরিকগুলির পলিমাটি পরিষ্কার করে।

বলশেভিকদের মহান কাজ হল পুকুরগুলিকে দিয়ে একটি হ্রদ বানানো; এটিকে জরাফশান বরাবর উজানির দিকে মরুভূমি থেকে সরিয়ে কত্ত-কুরগানের কাছে প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক খাদের ভিতর নিয়ে আসা এবং ঐ খাতের পরিধি বাড়াবার জন্য এক বিশাল মাটির বাঁধ নির্মাণ করা। শীতকালে জরাফশানের জলকে এর ভেতরে সঞ্চিত করা হবে আর গ্রীষ্মে সোনা-বওয়া মধ্য এশিয়ার নদীর ভিতর চালান দেওয়া হবে। ১৯১৯ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এই কাজের নির্দেশ দেন এবং তুর্কিস্তানের সেচ ব্যবস্থার সংগঠন

সংক্রান্ত নির্দেশনামায় সই করেন। এতে শুধু ক্ষুধিত স্তেপে জলসেচ ব্যবস্থার কথা নয় জরাফশানে জলাধার নির্মাণের কথাও ছিল।

তাই নির্মাতারা এল জরাফশানে। তাঁবু, চালা, খোঁদল, নলখাগড়ার কুঁড়ে, সাময়িক গুদাম ও রান্নাঘর সুদ্ধ শিবির তৈরী হল এখানে ওখানে পাহাড়ের নীচে আর স্তেপের ভেতর। খাতের মধ্যে শিবিরের আগুন জ্বলে উঠল। জল চালানো খালের পথ ধরে, হাজার হাজার লোক কেতমেন দিয়ে শুকনো মাটি কাটতে লাগল। এসময় সবার সেরা কেতমেন শ্রমিক মাভলান গাফুরভের নাম সমগ্র প্রজাতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তার ডাক নাম দেওয়া হল মাভলান পাভলান, অর্থাৎ 'বীর মাভলান'।

যুদ্ধ লাগায় 'কত্ত-কুরগান সাগরের' নির্মাণ কাজে বাধা পড়ল। ১৯৪১ সালে, লোকেরা সরবরাহ খাল আর সরান খাল এবং জলাধারের এক চতুর্থাংশ শেষ করার সময় পেল হাইড্রলিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে। যুদ্ধ জয়ের পর বিজ্ঞানীরা লড়াই থেকে ফিরে এসে তাদের অসম্পূর্ণ থিসিসে মন দিল, লেখকরা অলিখিত কাহিনী শেষ করতে বসল আর জরাফশান উপত্যকার যৌথখামারীরা তাদের সাগর বানাবার কাজে মন দিল। তারা দেখল যুদ্ধের বছরগুলিতে জলাধারের তীর ঘেঁষে সব গাছ জন্মেছে। শিকারীরা সমুদ্রে আসত হাঁস শিকার করতে, কত্ত-কুরগানের ছেলেরা মাছ ধরতে। ১৯৪৬ সালে আবার বহু হাজার নির্মাতার বাহিনী কত্ত-কুরগান জলাধারের আশেপাশে কাজে লাগল।

এক্সকাভেটরের বজ্র নির্ঘোষে, ক্রলার ট্র্যাক্টর আর কংক্রীট মেশান যন্ত্রের গর্জনে, ভারি লরি, বুলডোজার, কনভেয়র, কম্প্রেসর ও নুড়িপাথর পরিষ্কার করার যন্ত্রের ঘর্ঘরে ও নূতন শাখা লাইন ধরে যাতায়াতকারী ট্রেনের হুইসিলে মানুষের কণ্ঠস্বর গেল ডুবে। রোদে পোড়া মাটি আর রান্নাঘর থেকে আসা ভেড়ার চর্বির গন্ধের সঙ্গে মিশল কয়লা আর পেট্রোলের গন্ধ। কাজের জায়গায় হাজির হল বিভিন্ন যন্ত্রপাতি।

উজবেক সাগরের প্রতিটি গঠন কাজে সৃজনশীল কল্পনা ও প্রয়োগ কৌশলের দুঃসাহসের পরিচয় মিলে। বিজ্ঞান এখানে সক্রিয়, প্রতি পদক্ষেপে সাহায্য করতে লাগল নির্মাণ কাজে, নিজেও সমৃদ্ধ হল প্রভূত পরিমাণে। এ কথা অনায়াসে বলা চলে যে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের কাছে উজবেক সাগর নির্মাণ এক ধরনের আকাদমী হয়ে দাঁড়াল।

নীচের উদাহরণটি প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকে সব চেয়ে চমকপ্রদ না হতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে সব চেয়ে মনোজ্ঞ হবে।

অনেকদিন ধরে ধুলোর জ্বালায় লোকের পক্ষে কাজ করা ছিল কঠিন। ধুলোয় সমগ্র অঞ্চল ভরে যেত। খোলা পিট, রাস্তাঘাট, বাঁধ ও সমস্ত নির্মাণ কাজের জায়গাকে বিশাল

মেঘের মত ঢেকে দিত। মধ্য এশিয়ায় নদী উপত্যকার পাতলা ধুলো সামান্য একটু বাতাস পেলেই কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঘের মত উপরে উঠত। হাল্কা বটে, তবু কখনো কখনো কয়েক সপ্তাহ ধরে বাতাসে ভাসতে থাকে। লরিগুলো অবিরাম হর্ণ বাজাতে বাজাতে আস্তে আস্তে এগুত, একটার সঙ্গে আর একটার ধাক্কা লাগার ভয়। কেবল ড্রাইভারদেরই নয় নির্মাণ কাজের প্রত্যেকেরই কাজে বাধা পড়ত এই চোখ কানা করা ধুলোতে।

ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক'ও ড্রাইভার সবাই মিলে ধুলোকে জব্দ করার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কোন বইয়ে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। গ্রন্থকারদের ত কখনো সূক্ষ্ম ধুলো বোঝাই নদী উপত্যকার মাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু উজবেক সাগরের সংগঠকরা ধুলোকে জব্দ করল সহজে ও উদ্ভাবন কৌশলে। তারা খোলা খাতের মাঝখানে পাহাড়ের বুকে জলাধার খুঁড়ে পাম্প করে তার ভিতর প্রচুর জল চালান দিল। জমি এই জলকে শুষে নিয়ে আর্দ্র হল। কেতমেন শ্রমিক এবং এক্সকাভেটর চালক আর্দ্র মাটিকে সরাতে লাগল আর লরিগুলো নিয়ে চলল এদের রাস্তা বয়ে। এই মাটি যেমন তেমন ভেজা নয়, আর্দ্রতার রীতিমত মাপাজোকা অংশ ছিল এর ভেতর। মৃত্তিকা সংক্রান্ত গবেষণাগারের কর্মীরা এর উপর নজর রাখত। এর আগে মাটিকে জমাট বাঁধাবার আগে, বাঁধের মাটির প্রতিটি স্তরকে ভিজিয়ে নিতে হত, কারণ নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিঙে এরই দরকার ছিল। মাটির প্রতিটি স্তরকে ভিজিয়ে ঠিক করার জন্য প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগত। এখন আর্দ্র অবস্থায় মাটিকে বাঁধের জায়গায় নিয়ে আসার আগের চাইতে তিন থেকে চার গুণ দ্রুত গতিতে কাজ চলতে লাগল। নির্মাণ কাজের জায়গা থেকে ধুলোর মেঘ বিদায় নিল, বাতাস হল স্বচ্ছ ও নির্মল। এই ভাবে হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের পাঠ্যপুস্তকে একটি নূতন অধ্যায় যুক্ত হল।

নির্মাণের জায়গাটি হল যৌথখামারীদের কাছে এক বিরাট বিদ্যালয় স্বরূপ। শত শত লোক হল ড্রাইভার, দক্ষ যন্ত্রবিদ্ এবং এক্সকাভেটর চালক। শেষোক্ত পেশাটি অন্য পেশার চেয়ে যৌথখামারীদের বেশী প্রিয় হয়ে উঠল। বছর বছর বাঁধের পরিধি বাড়তে লাগল, শেষ পর্যন্ত সমুদ্র তার নির্দিষ্ট জায়গা দখল করল।

কত্ত-কুরগান সাগর বহু নূতন জমিতে জল দিয়েছে, আরও অনেক জমিতে জল দেবে। জলের আবির্ভাব উজবেক যৌথখামারীর জীবনে কী ঘটনা এ কথা সব চাইতে ভাল বলতে পারবে তারা যারা জুলাই মাসে তুলো গাছের উপরার্ধে ফল ধরার সময় উজবেক সাগর থেকে জল আসতে দেখেছে বুখারার মাঠে, কত শতাব্দী ধরে এই মাঠে ছিল জলের

অভাব। কিশলাকের লোকেদের কী উল্লাস। অঞ্জলি ভরে তারা কানায় কানায় ভরা আরিক থেকে জল খেতে লাগল। উজবেকের কাছে জলই হল সুখ। জল না থাকলে তার পৃথিবী সংকীর্ণ ও বিষণ্ণ, কিন্তু যখন আরিকে জল বয়ে চলে তার হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে।

৮। একটি সহরের সকাল

বুখারায় ঢুকলেই দু'পাশে নূতন বাড়ির সার এবং চওড়া লোকজন বোঝাই রাস্তায় গিয়ে পড়বেন, কিন্তু বড়ো রাস্তা থেকে একটু সরলেই সরু রাস্তার গোলক-ধাঁধা। আগেকার দিনে সহরের এক চতুর্থাংশ অঞ্চল ছিল কবরখানায় ভর্তি আর এক চতুর্থাংশে মাদ্রাসা, মসজিদ, আমিরের প্রাসাদ আর বাজার। 'পবিত্র নগরীর' সীমায় ছিল স্থানাভাব, এজন্য বুখারার কারিগরদের ঠাসাঠাসি করে মাটির ঘর বানাতে হত, তার ওপর বসাত মাটির ঘরের আর এক সার। এ কারণে রাস্তা যতটা না সরু তার চাইতেও সরু মনে হত। এর ভিতর রঙবেরঙের পোষাক পরা লোকদের দেখে মনে হত তারা বাড়ির ভিতরকার করিডর ধরে হাঁটছে।

বুখারার এই পাশের রাস্তার গোলক-ধাঁধায় এখানে সেখানে দেখা যাবে নূতন নাপিতের দোকানে, রুটির ও রকমারী দোকানে প্লেট কাঁচের জানলা। মাঝে মধ্যে মাথা তুলেছে পাথরে তৈরী নূতন বাড়ির পুরো মহল্লা। বানানো বাড়িগুলির ভেতর সব চাইতে সুন্দর হল সোভিয়েত প্রাসাদটি। সব জায়গাতেই প্রাচীন মাদ্রাসা ও মসজিদের প্রবেশ পথের সরু ও লম্বা তোরণগুলি বাড়ির মাথার উপর নজরে পড়ে। কতকগুলো ফটক তৈরী রঙীন টাইল দিয়ে। তার উপর সূর্যের আলো ঝিকমিক করে। অন্যগুলো তৈরী ছেঁদা-ওয়ালা পাথর দিয়ে। পাথরের বড় বড় শিলার ফাঁকে ফাঁকে শুকনো ঘাস বেরিয়ে আছে। আরও উঁচুতে আকাশের বুকে মাথা তুলেছে মিনার চূড়া আর নীলচে গম্বুজ। কোন কোন গম্বুজের উপর বড় বড় ধূসর রঙের পাখির বাসা। প্রতি বসন্তে এতে সারস পরিবার বাসা বাঁধে।

সারাফন, জারগারন ও টোকি তিলপাক ফুরোসন (তিনটি গোলাপাকৃতি ধূসর গম্বুজ, প্রতিটিতে একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজ) বুখারার প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলিকে স্থাপত্যের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে। এগুলি তৈরী ষোড়শ শতাব্দীতে, এক সময় এরা ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। আজ এর তলা দিয়ে প্রশস্ত রাস্তার চৌমাথা পার হচ্ছে দ্রুতগামী জনতা। দেখা যাবে যন্ত্রচালিত রুটির কারখানায় পাথরের

খিলানের নীচে শব্দ তুলে লরি চলেছে ময়দা নিয়ে। ক্লিনিক থেকে ডাক্তার নিয়ে রেড ক্রশ লাগানো 'পবেদা' গাড়ি চলেছে কোন রোগীর বাড়ি, কিম্বা কেঠো ঠ্যাং উটগুলো তুলোর বস্তা নিয়ে চলেছে এক সারিতে। রাস্তার এক কোণায় মিলিশিয়ার একটি লোক অবসর পেয়ে এক পেয়ালা চা খাচ্ছে।

বুখারার মিলিশিয়ার লোক কাজের সময় চা খাচ্ছে দেখে কেউ যেন অবাক না হয়। উজবেকিস্তানে চা পান খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়। এখানে এটা জলবায়ুর মতই দরকারী। উত্তাপ সহ্য করার জন্য মানুষের দেহে যে আর্দ্রতার প্রয়োজন চা তা জোগায়। তাসখন্দের প্রখ্যাত শারীরবৃত্তবিদ আ. সাদিকভ সম্প্রতি মধ্য এশিয়ায় মানুষের দেহে অত্যাবশ্যকীয় জল ও লবণের বিপাক সম্পর্কে বড় ধরনের গবেষণা কাজ শেষ করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে জানা যায় এখানকার মানুষের অবশ্যই ঘাম হওয়া প্রয়োজন, নইলে সে গাছের মতো শুকিয়ে যাবে। এ কারণে উজবেকিস্তানের সহর ও গ্রামের প্রতি রাস্তার মোড়ে তিন চারটি করে চাখানা। খাল নির্মাণের জায়গায় অবিরাম সামোভার ফুটছে।

বুখারায় এক পেয়ালা চায়ের অর্থ অন্য কিছু। আমাদের কালেও বুখারাবাসীরা তাদের সহরে চায়ের পেয়ালার উদ্দেশ্যে একটি অস্বাভাবিক ও বাহ্যতঃ বেমানান স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়েছে। এর যথেষ্ট কারণ আছে। প্রধান চত্বর রেগিস্তানের ওপর এই জলমিনার, মসজিদ-মিনার ছাড়িয়ে উঠেছে এই কাঠামো। প্রাচীন অট্টালিকার শোভন সারি বা গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে-পড়া নূতন তৈরী থিয়েটার বা আঞ্চলিক সোভিয়েতের কার্য নির্বাহক কমিটি ভবনের ভিড়ে এটি একেবারে বেমানান। বস্তুত এই স্তম্ভটি প্রথম দেখে অবাক হয়ে এই কথাই বলতে ইচ্ছে করে, 'বুখারাবাসীরা কি এটাকে তৈরী করার আর কোনও জায়গা পেল না? কম নজরে পড়ে এরকম কোনও জায়গা কি বেছে নিতে পারেনি?'

বুখারার সেই দুর্গন্ধযুক্ত চা যার কথা ভোলা যায় না, চায়ের পাতা অনেক ফুটিয়েও যার দুর্গন্ধ তাড়ানো যেত না, বিশ বছর আগে যারা এই চা খেয়েছে তারাই সঙ্গে সঙ্গে একথা উপলব্ধি করবে কেন বুখারাবাসীরা সগৌরবে সহরের সব চাইতে সুন্দর চত্বরটিতে তাদের নূতন জলমিনার বানিয়েছে।

বুখারার আগে জলের অভাব কী প্রচন্ড ছিল তার পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার জন্য আমি সাহ্‌রুদ, হউজ ও ভিস্তিওয়ালাদের কথা বলব। হাইড্রজিওলজিস্ট বলেন যে আজকের বুখারা দাঁড়িয়ে আছে আগেকার অনেক যুগের মাটির স্তরে সৃষ্ট ৪৫ ফুট উঁচু জায়গায়। সাহ্‌রুদ, বা সহরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা প্রধান খালটিকে দেখলে এমনি চোখেও এ তথ্যটি ধরা পড়ে। যদিও বুখারাবাসীরা বার বার এই খালটিকে নতুন করে তৈরী করেছে,

পার উঁচু করে পাথর দিয়ে বাঁধিয়েছে তবু এটা বয়ে চলেছে রাস্তার লেভেলের অনেক নীচে, মনে হয় ফাটলের তলা দিয়ে। এতে জলের পরিমাণ ছিল কম এবং জরাফশানের ভাটির দিকে চিরকালই জলাভাব বলে বুখারাবাসীরা জল ধরবার জন্য পঁচাশিটি হউজ বা পাথর ঘেরা জলাধার তৈরী করে।

হউজগুলি মারাত্মক জীবাণু ভর্তি। ভিস্তিওয়ালারা জলের সঙ্গে সহরে রোগ ছড়াত। কবরের পাথরগুলো মূক না হলে বলত যে ওদের নীচে যারা শুয়ে আছে তাদের বেশীর ভাগ বুড়ো হয়ে বা গুলি খেয়ে বা ছোরার আঘাতে মারা যায়নি, মরেছে ঐ সব রোগে।

রাস্তার প্রথম জলকল থেকে উৎসারিত জলের ধারা প্রসন্ন বুদ্বুদে চকমক করে উঠে যখন প্রথম ওদের জগের ভিতর পড়ল তখন বুখারাবাসীদের আসল উৎসব। ওরা যে জলমিনার বানাল রেগিস্তানে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। জলের কল মানেই হল রোগ আর কুৎসিৎ চায়ের হাত থেকে মুক্তি এবং ফলের বাগানে গাছের পাতার আশীর্বাদী মর্মর।

রেগিস্তানের প্রান্তে, নূতন জল মিনারের উল্টোদিকে গণ উদ্যান গড়ে উঠল এবং সহরের অন্যান্য অঞ্চলে বাগান। কবরখানা সহর থেকে সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় বানানো হল বড় অবসর বিনোদনের পার্ক। এটা চওড়া পাতা গাছ আর পাখির কলরবে ভর্তি। পার্কের মাঝখানে পাথর গাঁথা পাড়ের মধ্যে দেখা দিল নূতন একটি হ্রদ। জল এত স্বচ্ছ ও নির্মল যে মনে হয় সূর্যের আলো ওকে ভেদ করে চলে গেছে। শ্যামবর্ণ ছেলের দল গরমের দিনে এর জলে হুল্লোড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়, তাদের চিৎকার মেশে পাখির কিচিরমিচিরের সঙ্গে।

বুখারার অবসর বিনোদনের পার্কে একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ আছে। দুর্লভ শিল্পবস্তুতে যাদের প্রচণ্ড লোভ সেই আমেরিকার ক্রোরপতির দল, এটিকেও কিনতে চেয়েছিল। এরা মিশরের আসল স্ফিংক্স্ কিংবা গ্রীসের দুর্লভ মূর্তি, এমনকি আস্ত একটা মন্দির পর্যন্ত হাতাতে অভ্যস্ত। যারা এর মালিক তাদের জাতীয় গৌরবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এরা সে সব দেশ থেকে এগুলিকে তুলে নিজেদের জাহাজে চাপিয়ে আমেরিকায় চালান দেয়।

এই ক্রোরপতিদের সঙ্গে তৈমুরলঙ্গের কোনই প্রভেদ নেই। সে গাড়ি বোঝাই করে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে যা পারত নিয়ে আসত নিজের রাজধানীতে। ব্রুসা থেকে সে সমরকন্দে নিয়ে এসেছিল সন্ত পিটার ও পাভেলের মূর্তি খোদাই করা ব্রোঞ্জের দরজা। এর উপর ছিল এনামেলের পালিশ দেওয়া সোনালী ও নীলে কাজ করা সূক্ষ্ম প্যাটার্ণ।

দরজা এত উ'চু যে ঘোড়ায় চড়েও তার ভিতর দিয়ে যাওয়া যায়। তার সুয়োরাণী বিবি খানুমের তাঁবুর পাশে এটিকে বসাবার হুকুম দিয়েছিল তৈমুরলঙ্গ।

স্বভাবতঃই উজবেকরা আমেরিকানদের কাছে তাদের স্মৃতিস্তম্ভটি বিক্রি করতে রাজী হয়নি। তারা ওদের বুঝিয়ে দিল ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে ব্যবসা করা সভ্য জাতির জাতীয় মর্যাদার রীতিবিরুদ্ধ। বিদেশী অতিথিদলের অবশ্য এ কথার পুরো তাৎপর্য বোঝানো কঠিন। উজবেকরা যে তাদের কড়া কথা শোনায়নি তা কেবল ভদ্রতার খাতিরে। আমেরিকানরা চলে যাবার পর, উজবেকিস্তানের বহু লোক অবাক হয়ে বলতে লাগল, 'বেড়ে লোক এরা: সারা পৃথিবীটাকেই একটা বাজার বলে মনে করে!'

এটি হল ইসমাইল সামানিদের সমাধিমন্দির। মধ্য এশিয়ার প্রাচীনতম স্মৃতিস্তম্ভের একটি। এটা বিরাট নয়, এতে খুব বেশী কারুকার্যও নেই। সাধারণ হলদে রঙের ই'ট দিয়ে তৈরী। তবু এটি সম্ভবত মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে সব চাইতে মনোরম। যে গঠন শৈলীতে এর ই'টের দেয়ালগুলি গড়া তাতেই এর মহান উৎকর্ষ ও পেলবতা। প্রকৃতপক্ষে এর নক্সার সৌন্দর্য অপরূপ। এই যে শিল্পসৃষ্টি এর উপাদান হল ই'ট। পৃথিবীর মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভটি অনন্য, এর অজানা স্থপতি এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে প্রকৃত শিল্পী সাধারণ ই'ট দিয়েও অপূর্ব শিল্পবস্তু বানাতে পারে।

দশম শতাব্দীতে সামানিদদের তাজিক রাজবংশের আমলে বুখারার ইতিহাসে সব চাইতে চমকপ্রদ কাল। বুখারার বাঁধানো পথঘাট, ছাউনি ঢাকা বাজার ও পান্থনিবাসের বর্ণনা দেবার সময় তখনকালের ভৌগোলিকগণ গ্রন্থাগারের কথাও উল্লেখ করেছেন। এর ভিতর সামানিদ গ্রন্থাগার ছিল সব চাইতে নাম করা। মহোত্তম তাজিক কবি রুদাগি এখানে পড়াশুনো করতেন। বহুমুখী প্রতিভা যাঁর সেই আশ্চর্য তাজিক বিজ্ঞানী আবু আলি ইব্‌ন্ সিনা তাঁর যৌবনের অনেক আনন্দময় দিন এখানে কাটান। ইউরোপে আভিসেন্না নামে ইনি পরিচিত।

১৯৫২ সালে ফ্রেডেরিক জোলিও কুরির প্রস্তাব মতো বিশ্ব শান্তি রক্ষা পরিষদ সিদ্ধান্ত করেন সব দেশে ব্যাপকভাবে ইব্‌ন্ সিনার সহস্রতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা নানা সমাবেশে আবেগময়ী বক্তৃতা দেন। পৃথিবীময় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে মহান, সৌভ্রাত্রমূলক বন্ধন রয়েছে সে কথাই প্রমাণিত হয়।

ইব্‌ন্ সিনার জন্মবার্ষিকী অবশ্য তাঁর নিজ সহর বুখারাতেও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইসমাইল সামানিদের সমাধিমন্দির ছাড়াও ইব্‌ন্ সিনার নামের সঙ্গে যুক্ত আর একটি বাড়ি আছে। এটি একটি মাদ্রাসা। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে এটি তৈরী হয়। এর

পাথর বাঁধান, প্লাস্টারের মূর্তি শোভিত আরামপ্রদ প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটি ফোয়ারা উৎসারিত। জায়গাটিতে গ্রন্থাগার সুলভ নৈঃশব্দ বিরাজমান। উজবেকিস্তানের ১,৪০০ গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি, প্রজাতন্ত্রের (তাসখন্দের পরেই) প্রাচ্য পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। এর নাম আবু আলি ইব্‌ন্ সিনা গ্রন্থাগার।

পাঠকক্ষে এই বিখ্যাত বুখারাবাসীর একখানা বড় প্রতিকৃতি টাঙানো। ঘরে শুধু শোনা যায় কেউ কেশে গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছে, আর পাতা উল্টাবার খসখস আওয়াজ। এখানে টেকনিক্যাল বিদ্যালয় এবং আধুনিক বুখারা ইন্‌স্টিটিউটের ছেলেরা পরীক্ষার পড়া তৈরী করে। তরুণ গবেষকরাও আসে এখানে। এদের কেউ হয়ত ইব্‌ন্ সিনার একখানা বইয়ের উপর ঝুঁকে আছে — হয়ত বা বইখানা বিখ্যাত 'আল কোয়ানুন' বা 'হাই ইব্‌ন্ ইয়াকজান', দর্শন সাহিত্যের সেই বই যার উপর ভিত্তি করে ইব্‌ন্ তুফেইল তাঁর প্রথম এ্যাডভেঞ্চারমূলক উপন্যাস লেখেন।

হাজার বছর ধরে ইব্‌ন্ সিনার নাম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বুখারায় তার ব্যাপ্তি সব চেয়ে কম সে সময়, কেননা তখন সামন্তদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে। সামানিদদের পর সহরে নাম করার মত কোন গ্রন্থাগার ছিল না। অজ্ঞতা, হিংস্রতা ও ধর্মের উন্মাদনা এক হাজার বছর ধরে জোটে বুখারাবাসীদের ভাগ্যে। এই গ্রন্থাগার মাত্র বর্তমানে তৈরী হয়েছে। সোভিয়েত সংস্কৃতি এখানে নিয়ে এসেছে সব শাখার জ্ঞানের বই। এই নূতন, বিশ্বজনীন সংস্কৃতি বুখারাবাসীদের জীবনে তাদের মহান দেশবাসীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিছুদিন আগেকার সামন্ততান্ত্রিক স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সহরের প্রাচীর এখনও বর্তমান, কিন্তু নূতন সমাজতন্ত্রী কারখানার ছাদ ও চিমনি তার উপর মাথা তুলেছে।

বুখারার কারখানা কখনও বন্ধ হয়নি। এখানে কোন ধর্মঘট বা ধর্মঘটভাঙ্গা লোকের সাক্ষাৎ মেলেনি। ধর্মঘট, ধর্মঘটভঙ্গকারী, কারখানা বন্ধ, সঙ্কট, প্রলেতারিয়েট, পুঁজিবাদের সৃষ্ট এই জাতীয় শব্দ উজবেক ভাষায় নেই। যখন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঊর্ধ্ব শিখরে উঠে উজবেকরা অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদের ইতিহাস পড়ে তখন রুশ শব্দকোষ থেকে এইসব শব্দ তারা ধার করে।

বুখারার পরিবেশ তথা উজবেক ভাষা পরিষ্কার সেই কথাই প্রমাণ করে অধ্যাপকরা যা প্রায়ই বলে থাকেন: 'উজবেকরা পুঁজিবাদের পর্যায়ের ক্রমবিকাশ লাফিয়ে পার হয়েছে,' অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি পেঁৗছে গেছে সমাজতন্ত্রে।

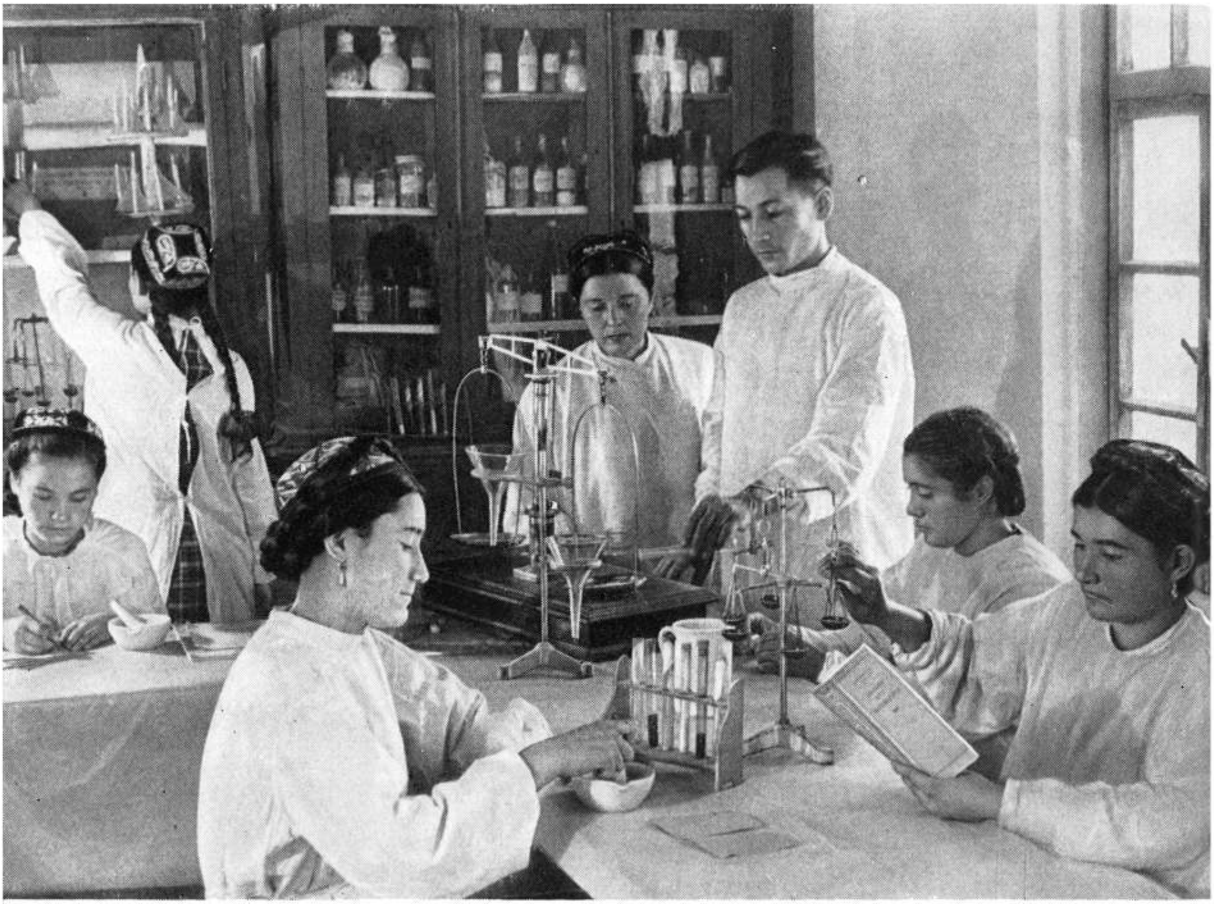
বয়স্ক উজবেকদের প্রত্যেকে সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি এসে গেছে সমাজতন্ত্রে।



প্রখ্যাত আঙুর উৎপাদক রিজামত মুসা মহম্মদ।

যন্ত্রের সাহায্যে তুলো গাছে পরাগযোগ।





বুখারায় সহকারী ডাক্তারদের স্কুলের একটি ক্লাস।

উদাহরণ স্বরূপ উজবেক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করা যাক।

সুরকার মুখতার আশরাফির জন্ম বুখারাতে ১৯১২ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন লোক গীতিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর বাবা যে সান্ধ্য জলসা করতেন, তাতে বুখারার মার্গ সঙ্গীতে উৎসাহী বহুলোক হাজির হত। এরা উসুল, অর্থাৎ সঙ্গীতের বিধিবদ্ধ নিয়ম ঠিক ঠিক অনুসরণ করা হচ্ছে কি না সেদিকে কড়া নজর রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে রকম চলে আসছে অবিকল সেইভাবে সবকিছু হওয়া চাই। স্বর এতটুকু এদিক ওদিক হলে চলবে না। নূতন যা কিছু সবই হারাম।

সেই থেকে চার দশক পার হয়েছে। গ্লিঙ্কা, চাইকভ্স্কি, স্ক্রিয়াবিনের রুশ মার্গসঙ্গীত বুখারার সহর থিয়েটারে কনসার্টের সময় এখন বেজে উঠছে। সহরের রাস্তা, চত্বর ও গৃহের অগণিত লাউডস্পীকারে এই সুর বাজছে। বাজছে মুখ্তার আশরাফির 'বীরের সিমফনির' সঙ্গে সঙ্গে। সেই সিমফনি উজবেক লোক সঙ্গীতকে আধুনিক সাঙ্গীতিক সংস্কৃতির পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সিমফনির মেলডিতে এবং জটিল ও অসরল প্রথম সুর পর্যায়ের সঙ্গে মাপ করা দ্বিতীয় সুর পর্যায়ের বৈষম্যে জনগণের আত্মিক শক্তি প্রতিফলিত। এর যথার্থ সুরতানের মধ্যে, যেভাবে প্রধান সুরলীলা দ্বিতীয় পর্যায়ের মধুর, সাবলীল ও কমনীয় সুরলীলার সঙ্গে মিশ খায় তাতেই এর আধুনিকতা। যেভাবে প্রথমে এই সুর ধ্বনিত হয় বাঁশীতে, ইংরেজী শিঙ্গা ও ক্লেরিনেটের সাহায্যে এবং পরে বেজে ওঠে তারের ও কাঠের যন্ত্রে, যেভাবে ক্ষুব্ধ সুরের পরিবেশে ফরাসী শিঙ্গা ও বৃহৎ বেহালা একে পরবর্তী পর্যায়ে রূপ দেয়, যেভাবে এই সুর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং মিলিয়ে যায়, তাতেই এর আধুনিকতা ফুটে ওঠে।

তিরিশ বছর আগে, আজকের বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক নবি গানিয়েভকে তাঁর বাবা একটি মক্তবে নিয়ে আসেন।

'ওর হাড় কখানা আমার, কিন্তু মাংসের ভার আপনার উপর,' বাবা বললেন মোল্লাকে। 'ওকে যেমন খুশি লেখা পড়া শেখান কিন্তু ও যদি খাঁটি উজবেক না হয়, আল্লার বিশ্বস্ত অনুচর না হয়...' উনি একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি কসাই, আমার জীবনে আমি হাজার হাজার ভেড়া মেরেছি। আমার পক্ষে একটা ছেলেকে মেরে ফেলা মোটেই কঠিন হবে না।'

কয়েক বছর বাদে ১৯২৯ সালে গানিয়েভ যখন বাড়ি ছেড়ে মস্কোয় পালিয়ে গেল নিখিল ইউনিয়ন শিল্প প্রয়োগকৌশল স্টুডিওতে শিক্ষা নিতে, ইমাম এই দাবী জানাল

যে ওর বাবা যেন জেলা মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্যে ছেলেকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু বিপ্লব তখন বৃদ্ধের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সুরু করেছে।

'আমি আশা রাখি আমার ছেলে আমাকে অপদস্থ করবে না,' বৃদ্ধ বললেন ইমামকে।

তিনি ইমামের নির্দেশ মানতে রাজী হলেন না, যদিও এর অর্থ সেই থেকে মসজিদের দরজা তার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে, আত্মীয়রা তাকে একঘরে করবে। এটা ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন শাস্তি।

দু'বছর বাদে গরমের ছুটিতে নবি গানিয়েভ তার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সামারায় (বর্তমানে কুইবিশেভ) পেঁৗছে সে স্টেশনে মাথা কামিয়ে ফেলল, ট্রেনে ফিরে এসে স্যুট খুলে টুপিসুদ্ধ ওটাকে বাক্সবন্দী করল। পরল উজবেক আলখাল্লা আর তুবেতেইকা যাতে সাবেকী চেহারায় ফিরে গিয়ে বাবার অবস্থাকে সহজ করতে পারে।

আরও কয়েক বছর কাটার পর গানিয়েভ 'তাহির ও জুহ্‌রা'র (বুখারার সুবিদিত লোক কাহিনী অনুসরণে) চিত্ররূপ দিতে সুরু করে।

'আমাকে খুলে বল্,' বাবা একদিন ছেলেকে বললেন, 'তুই কি সফল হবি, তুই কি নামজাদা সোভিয়েত চিত্র পরিচালক হতে পারবি?'

'না হলেই বা কি?'

'তাহলে তুই বরং আবার পড়াশুনো করে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হ।'

এই তিনটি কাহিনী একটি লোকেরই জীবনের, অথচ মনে হয় তারা তিনটি বিভিন্ন যুগের। সামন্ততন্ত্র ও সমাজতন্ত্র — এই দুটি যুগ সোভিয়েত শাসনের মাত্র চল্লিশ বছরের দ্বারা বিভক্ত।

৯। এটা ঘটে বুখারায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব অসংখ্য রূপে প্রকাশ পায়। উজবেকিস্তানে বিশেষ আন্তরিকভাবে তার প্রকাশ ঘটে গত যুদ্ধের সময়। শান্তিপূর্ণ সহরের উপর ফ্যাসিস্ট বিমান হানায় বা যুদ্ধে নিহত বাপ মায়ের সন্তান সহ ট্রেন যখন মধ্য এশিয়ার স্টেশনগুলিতে আসতে আরম্ভ করে।

'ছেলেপিলের পরিবার বাজার আর সন্তানহীন পরিবার মাজার,' এটি উজবেক প্রবাদের কথা। বাজার অর্থ সজীবতা ও আনন্দ আর মাজার মানে কবর। প্রত্যেক জাতিরই ঐতিহ্য

আছে। উজবেকদের অতি সুন্দর এক ঐতিহ্য যাকে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বজায় রেখেছে তা হল সন্তানের প্রতি অসাধারণ আদর যত্ন। উজবেকিস্তানে সন্তানই হল পরিবারের কেন্দ্র। সেখান তার সমস্ত অবসরটুকু শিশুর সঙ্গে কাটাচ্ছে — এটা একটা সাধারণ ঘটনা। সন্তানহীনতাকে বরাবরই সব চাইতে বড় দুর্ভাগ্য বলে মনে করা হয়।

কিন্তু নিজের সন্তান ও অপরের সন্তান আলাদা জিনিস। যখন জ্বলন্ত সহরের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে-আনা শিশুদের নিয়ে প্রথম ট্রেন এসে পৌঁছল তাসখন্দে একথা কারও মনে হয়নি যে ওদের উপস্থিতি প্রজাতন্ত্রের জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমটায় স্থির হল ওদের জন্য মামুলী শিশুসদন খোলা হবে। কিন্তু প্রথম দফা ছেলেমেয়ে স্টেশন ছেড়ে যেমনি জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরে তাসখন্দের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল, অনেক উজবেক সরকারকে জানাল শিশুদের ওদের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হোক। তারা নিজের পরিবারে ওদের নিতে চাইল, আত্মীয়ের মত ওদের মানুষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে বলে। ওরা এত জোরের সঙ্গে এই অনুরোধ জানাল যে আর অস্বীকার করা চলল না।

কয়েকদিন বাদে তাসখন্দ, আন্দিজান, কারশি, বুখারা ও অন্যান্য জায়গা থেকে হাজার হাজার লোক শিশুদের নিয়ে-আসা ট্রেনগুলোকে ঘিরে ফেলতে লাগল। কারখানার শ্রমিক ও যৌথখামারী, একা লোক ও অবিবাহিতা নারী এবং সেই সঙ্গে বৃহৎ পরিবারের স্বামী স্ত্রী সবাই তিন থেকে পাঁচটি সন্তান, বস্তুত যত পাওয়া যায় তত নেবার আগ্রহ জানাল। বাচ্চারা হোক না রুশী, উক্রেনীয় বা লিথুয়ানীয়, কারেলীয় বা ইহুদী, কিছু এসে যায় না। আসল কথা হল এরা সবাই সোভিয়েত শিশু। তাদের দুর্বিপাক সমস্ত উজবেক জনগণের মনে সাড়া জাগিয়েছে।

নীল চোখ, লালচে বা সোনালী চুল, খাঁদা নাক ছেলেমেয়ে মধ্য এশিয়ার প্রাঙ্গণে কালো চোখ উজবেক বাচ্চাদের সঙ্গে চলা ফেরা করতে লাগল। কি ভাবে নূতন পরিবারে ওদের সম্পর্ক গড়ে উঠল, কি ভাবে অনাথ ছেলেমেয়ের প্রতি গভীর করুণার প্রথম অনুভূতি বিচিত্র জীবন ধারার ভিতর দিয়ে প্রবল স্নেহ ও ভালবাসায় ক্রমে রূপ নিল এখনও তা নিয়ে বহু বই লেখা হবে। বুখারায় আমার শোনা একটিমাত্র কাহিনী আমি বলব।

বুখারার কেন্দ্রে একটি মহল্লা আছে। এখানে নূতন চার-তলা বাড়ির সোজা সার। এরই একটি বাড়িতে ছিল এক তরুণ উজবেক দম্পতি। স্বামী কাজ করে কারাকুল পশম কারখানায় আর স্ত্রী সংসার দেখে। লোকটি কঠোর পরিশ্রমী, স্ত্রীকে খুবই ভালবাসে। স্ত্রীও স্বামী-পরায়ণা, কর্মপটু ও হিসেবী। এক কথায়, তাদের সন্তান না-থাকা ছাড়া সুখের আর কোনই প্রতিবন্ধক ছিল না। তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দু'বছর তারা

ভবিষ্যৎ সন্তানের বিষয়ে আলোচনা করত, স্বপ্ন দেখত। টাকা জমাচ্ছিল তারা, কারণ সন্তান হবার উৎসব পালন করতে না পারা লজ্জার ব্যাপার, রীতি অনুযায়ী তারা যেন বিরাট তোই'এ (উৎসব) তাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের নিমন্ত্রণ জানাতে পারে। পরে জানতে পারল যে তাদের সন্তান হবার আশা নেই, তখন পরস্পর দুঃখ পাবার ভয়ে এ নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে দিল।

দম্পতির (মহিলার নাম মুয়াবারা, স্বামীর নাম ভুলে গেছি) হয়ত এটা গা-সওয়া হয়ে যেত, ছেলেপুলে হবে না এই নিয়তিকেই মেনে নিত, কিন্তু উজবেকিস্তানে দরদী প্রতিবেশীদের অবিরাম প্রশ্নের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

তারপর এল যুদ্ধ। স্বামী সৈন্যদলে যোগ দেবার পর মুয়াবারা নিঃশব্দ দুঃখে কাল কাটাতে লাগল। তারপর সে কাজ নিল হস্তশিল্প সমবায়ে। সূচীতে বুখারার বিখ্যাত সোনার কাজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল এই সমবায় প্রতিষ্ঠান। বুখারার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যা করতেন সেও তেমনি অবসর সময়ে সোভিয়েত সৈন্যদের জন্য উলের মোজা ও সোয়েটার বুনত। সোভিয়েত সংবাদ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত ইস্তাহার পড়ত উদ্বেগের সঙ্গে, স্বামীর কাছ থেকে সৈন্যদের সেই বিশেষ তিন কোণা টিকেটহীন খামে চিঠি পেলেই ছুটে যেত প্রতিবেশীদের কাছে তার আনন্দের ভাগ দেবার জন্য।

একদিন তার জীবনে এল হঠাৎ পরিবর্তন। প্রতিবেশীরা দেখল সেদিন সে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে আবার দৌড়ে বেরিয়ে এল। হাতের মুঠোয় ব্যাঙ্কের বই। তাতে ছিল, যদি কখনো ছেলে হয়, তার জন্য আলাদা করে রাখা টাকা। সন্ধ্যায় সে বাড়ি নিয়ে এল ছ'বছরের একটি শণরঙা চুলওয়ালা মেয়েকে। প্রতিবেশিনীরা এসে হাজির হল তার ঘরে মেয়েটিকে দেখবার জন্য। ওর মা বাবা মারা গেছে সেই বরফ-ঢাকা রুশ প্রান্তরে যেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ চলেছে। এখন থেকে তাদেরই প্রতিবেশিনী, একটি উজবেক স্ত্রীলোকের মেয়ে হবে সে।

মুয়াবারা প্রতিবেশিনীদের বলল, সে ব্যাঙ্কের বই নিয়ে গিয়েছিল জনশিক্ষার সহর বিভাগকে দেখাবার জন্য যে মেয়েটির ভরণ পোষণ সে করতে পারে। মেয়েটির নাম কাতিয়া। সে বলল তার বাবা গেছে দূরে অনেক দূরে, যেখানে থেকে কোন মানুষ কখনো ফিরে আসে না। মহিলারা ধরে নিল ওর বাবা মারা গেছে। সে ছিল মায়ের সঙ্গে বাড়িতে। তারপর ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওরা ট্রেনে চাপে। কিন্তু রাস্তায় কী যেন একটা ঘটল। কাতিয়া বলতে পারল না ব্যাপারটা কী, সে শুধু জানে রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়।

চারদিকে বোমা পড়ছিল, সবকিছু জ্বলছিল। একটি লোক তাকে ট্রেন থেকে বার করে নিল। তার মা এখন কোথায় সে জানে না।

পরের দিন সকালে মুয়াবারা তার স্বামীকে লিখল, ওদের একটি মেয়ে আছে।

ধীরে ধীরে জীবন নূতন ধারায় বয়ে চলল। প্রথমটায় কাতিয়া এরোপ্লেনের শব্দ শুনলেই ভয়ে কেঁপে উঠত, লুকিয়ে থাকত। কিন্তু এ ভাব কিছুদিনের ভেতরেই কেটে গেল। মুয়াবারাকে 'মা' বলে ডাকা অভ্যেস হয়ে গেল যদিও আসল মায়ের কথা প্রায়ই বলত সে। উজবেক ভাষা বলতে শিখল সে, ভাব হল তার রাস্তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওদের ভিতর ছিল ওরই মতো অনেক সোনালী চুল খাঁদা-নাক ছেলেমেয়ে। উজবেক কায়দার যে রঙীন সিল্কের পোষাক মুয়াবারা ওকে বানিয়ে দিল সেটি ওর খুব পছন্দ। আরও খুশি হল সে চাচপাপুক (বিনুনীতে পরবার রুপোর গয়না) পেয়ে। মুয়াবারা বিয়ের আগে এগুলি পরত।

মুয়াবারার এখন সেই সস্নেহ জীবনের সূত্রপাত, যার স্বপ্ন সে দেখেছিল বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরগুলিতে। কিন্তু তারপরই ওর ভাগ্যে জুটল নিদারুণ আঘাত। ওকে জানান হল ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে স্তালিনগ্রাদ বাঁচাতে গিয়ে তার স্বামী প্রাণ দিয়েছে। ওর হতাশা যে কত গভীর তা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রতিবেশীরা তার কতই না যত্ন নিতে লাগল, তার দুঃখে সান্ত্বনা দেবার কতই না চেষ্টা করল। তার বুড়ো বাপ মা এল ভাবকন্দ থেকে ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে। ইতস্ততঃ করে পরে স্থির করল মুয়াবারা যে, বুখারাতেই থাকবে, তার মেয়েকে মানুষ করবে, সমবায় প্রতিষ্ঠানেই কাজ করবে।

দু'বছর কেটে গেল। স্নেহময়ী মায়ের পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব, মুয়াবারা তার একমাত্র সন্তান কাতিয়াকে তার সব কিছুই দিতে লাগল। সে চিরকালের জন্য তার জীবন ও স্বপ্নকে মেয়েটির জীবনের সঙ্গে, তার শিশুসুলভ আনন্দ, দুঃখ ও কষ্টের সঙ্গে জড়িত করল। কিন্তু তার কপালে লেখা ছিল আর এক আঘাত।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একটি দিন, তার দরজায় কে এসে টোকা মারল। কাতিয়া ছিল স্কুলে। মুয়াবারা দরজা খুলে দেখল একটি অপরিচিতা রুশ মহিলা। নবাগতার কারাকুল কোটের বোতাম খোলা। বুকের উপর চকচক করছে একটি গেরিলা মেডেল। জানা গেল সে কাতিয়ার মা। সে ঘরে ঢুকে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার কাহিনী বলতে শুরু করল। বসলও না, কোটও খুলল না কিংবা মুয়াবারার মৃতবৎ পাণ্ডুর চেহারাও লক্ষ্য করল না। সে আহত হয়েছিল, কিন্তু ভালো লোকেরা ওকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলে। পরে গেরিলা হিসেবে লড়াই করেছে সে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ছ'মাস সমস্ত

সোভিয়েত ইউনিয়নে তার হারানো মেয়েকে খুঁজে বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মেয়ের হদিস করে তাকে বার করেছে। অনর্গল কথা বলে চলল সে। মুয়াবারা তখনও তার চোট সামলে উঠতে পারেনি। উল্লসিত স্ত্রীলোকটির সামনে অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

সশব্দে দরজা খুলে গেল। উজবেক কায়দায় বাঁধা অনেকগুলো সোনালী বেণীকে সানন্দে ঝাঁকিয়ে কাতিয়া ছুটে ঘরে ঢুকল, এগিয়ে গেল মুয়াবারার দিকে। 'মা!' তার গলায় আনন্দের ডাক। পরে সে নবাগতাকে দেখে চিনতে পারল। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে সে চিৎকার করে উঠল 'মা!' ছুটে গেল তার দিকে কিন্তু মাঝপথে থেমে গিয়ে হতভম্ব হয়ে মুয়াবারার দিকে ফিরে তাকাল। তারপর মাথা নাবিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের কোণায় গিয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে, ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। দু'জনাই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল ওর কাছে।

মুয়াবারার এক প্রতিবেশিনী হঠাৎ এই দৃশ্যটি দেখতে পায়। একটু আগে সে এসেছিল তার মাংস কাটার যন্ত্র নিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের খবর দিল, অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের কাছ থেকে মুয়াবারার সুখকে যাতে সমবেত চেষ্টায় 'রক্ষা করা' যায় তার জন্য ওদের কাছে আবেদন জানাল। ঘটনা সম্পর্কে আদ্যোপান্ত আলোচনা করে, 'রক্ষা' কৌশলের ফন্দী এঁটে সন্ধ্যা নাগাদ ওরা টোকা মারল মুয়াবারার দরজায়, কিন্তু জানতে পারল ওদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটেছে। রুশ ও উজবেক দুজন মা-ই প্রাণভরে কেঁদেছে, নিজেদের সংযত করেছে এবং যা যা ঘটেছে দুজন দুজনকে বলেছে। সমস্ত বিষয় আলোচনা ও বিবেচনা করে তারা তখন থেকে একই সঙ্গে থাকবে বলে স্থির করেছে। সুদূর স্মলেন্স্কে কাতিয়ার মার বাড়ি পুড়ে গেছে, শিক্ষিকা হিসেবে সে বুখারাতেই কাজ করতে পারবে।

আমি জানি না এই পরিবার এখন কী ভাবে চলেছে। কী জানি মেয়েটি তার কন্যা-সুলভ ভালবাসা দিয়ে দুইটি স্ত্রীলোককে একই সূত্রে গাঁথতে পেরেছে কি না। হয়ত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, যেমন অনেক সময় ঘটে থাকে, স্ত্রীলোকদুটির সম্পর্কে চির ধরে ক্রমে তাদের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই অসুখী চিন্তা কেন যেখানে আরম্ভ এত সুন্দর? রুশ ও উজবেক মা, দুজনাই ত নিশ্চিন্ত ছিল যে তারা একসঙ্গে মিলে মিশে চলতে পারবে। তাই ত হওয়া উচিত, কারণ সুখে আস্থা না থাকলে মানুষ কী নিয়ে সংগ্রাম করবে, সে অবস্থায় মানুষ ত কোনদিনই সুখী হবে না।

১০। বালির সঙ্গে লড়াই

বহু শতাব্দী ধরে বুখারার চারপাশে মানুষ ও মরুভূমির মধ্যে ভয়ানক লড়াই চলেছে।

বুখারার বাইরে গেলে ফলের বাগান ও তুলো ক্ষেতের মাঝে মাঝে হলদে বালির অনাবৃত ভূখন্ড দেখা যায়। সহর থেকে যতই দূরে যাওয়া যায় ঐ ভূখন্ড আকারে বাড়তে থাকে। কর্ষিত জমি আরও ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, গাছগুলি ছোট — মনে হয় জল আর খাবারের অভাবে রোদে আরো শুকিয়ে গেছে। ভাবকন্দ, শফ্রিকান ও গিজদুভানের পর চলমান বালিয়াড়ির মাঝে ফসলের কোন চিহ্ন নেই। মরুভূমির সীমায় এখনও নজরে পড়ে বালুর ভিতর আধ ডোবা তুলোর ক্ষেত, বালির ভিতর থেকে মাথা-বার-হওয়া গাছ কিংবা ছাদ পর্যন্ত বালিতে ঢাকা বাড়িঘর। বুখারা মরূদ্যানের পশ্চিমে প্রাণশূন্য মরুভূমির বুকে বিক্ষিপ্ত ডজনখানেক সহর প্রাচীর চোখে পড়ে—একদা সমৃদ্ধশালী ভারাখ্সু, পাইকান্দ ও ভার্দানের ঐটুকুই মাত্র অবশেষ আছে। সত্যি, সংগ্রাম চলেছে বুখারার চারপাশে...

বালুরাশি সদা চলমান। কখনো কখনো ছোট, ঘোড়ার নাল আকৃতি বালিয়াড়ি দিনে প্রায় বিশ গজ পর্যন্ত সরে যায়। তরকারির বাগান, আরিক ও গ্রামের রাস্তায় হানা দেয়। বেশী দিনের কথা নয়, একটা আস্ত গ্রামকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়তে হয়। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি রমেতান জেলার (বুখারার উত্তর-পশ্চিমে) ১৬ হাজার অধিবাসীকে বালির আক্রমণে সুদূর খিবায় চলে যেতে হয়েছিল। মরুভূমি ওদের পরাস্ত করে, ওদের আশ্রয় কেড়ে নেয়। একথা ওরা বুঝতে পারেনি যে ওরা নিজেরাই এবং ওদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিকে এরকম মারমুখী করে তুলেছে। যতদিন না তারা তাদের সহর ও গ্রামের চারপাশের সাকসাউল গাছ কেটে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে এবং অন্যান্য গাছপালা উট আর ভেড়াছাগলকে খেতে দেয় ততদিন মরুভূমি ছিল শান্ত। গাছপালা কেটে বালির বাঁধ নষ্ট করে তাকে বাতাসের খেয়ালের হাতে ছেড়ে দেয়। মানুষ নিজে মরুভূমির সৃষ্টি করেছে, নিজের বিরুদ্ধে তাকে অস্ত্র জুগিয়েছে।

শফ্রিকান মরূদ্যানে তেজ-গুজার নামে একটি কিশলাক আছে। এর অধিবাসীরা বলে মরুভূমি ওদের গ্রামের প্রান্তে আসার পর আটক পড়ে।

বছর কুড়ি আগে যখন তেজ-গুজার যৌথখামারের পত্তন হয় সর্বজনীন সভার কার্য বিবরণীতে মাত্র দুটি লোক নাম সই করে, বাকি সবাই কাগজে টিপসই দেয়। সে সময় তেজ-গুজারে কদাচিৎ কেউ লেখাপড়া জানত। যারা দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে কাগজে

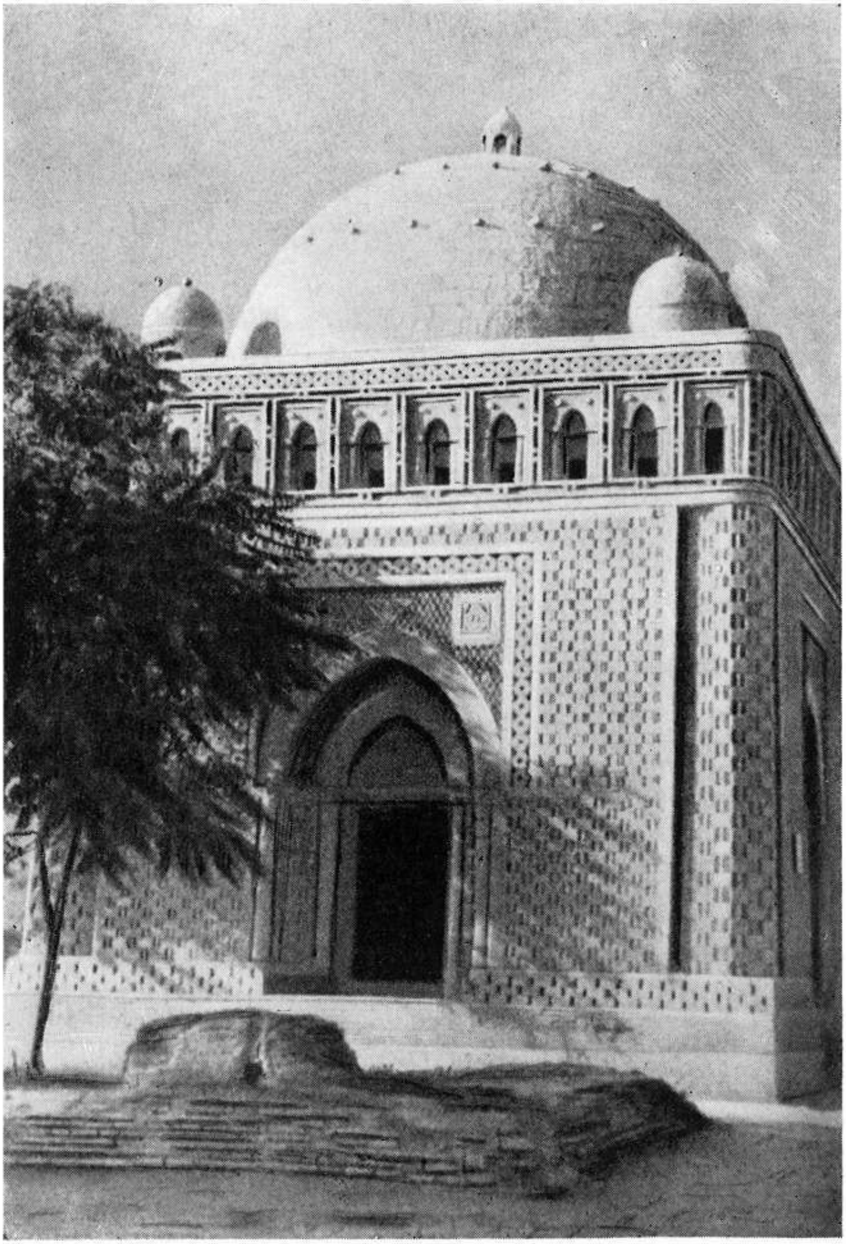
টিপসই দেয় তারা কী করে মর্ভূমির সঙ্গে লড়াই করবে? কিন্তু কয়েক বছর বাদে তেজ-গুজারের কাছে যখন বালুর ঝড় উঠল গ্রামবাসীরা জিনিসপত্র গুটিয়ে সরে পড়তে রাজী হল না। মর্ভূমির দিকে ফিরে যৌথখামারটিকে রক্ষা করার জন্য তারা স্থির সংকল্প হল। তখন তারা লেখা পড়া শিখে ফেলেছে। তারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, এবং জানে সমগ্র জেলা এবং প্রয়োজন হলে সমস্ত প্রজাতন্ত্র তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

কৃষিবিদদের সাহায্য নিয়ে যৌথখামারীরা তেজ-গুজারে কিজিল কুম মর্ভূমির সঙ্গে সংগ্রাম চালাল। ঐ প্রথম তারা কালো সাকসাউল, থিস্‌ল্‌ ও কানাদিম গাছের সারি লাগাল চলমান বালুকে আটকাবার জন্য। এরপর সোভিয়েত জনগণ মর্ভূমিকে হটিয়ে দিতে লাগল। ১৯৪৬ সাল নাগাদ বুখারা বর্ম, অর্থাৎ ৭০ মাইল দীর্ঘ ও দেড় থেকে দু'মাইল পর্যন্ত চওড়া সবুজ গাছের বেষ্টনী রচিত হল বুখারা অঞ্চলে মর্দ্যান ও বালুরাশির মাঝখানে। শফিকানের লোকেরা বালিডোবা উর্বর ভূমি উদ্ধার করতে লাগল এবং উজবেক সাগরের জল দিয়ে তাকে সিক্ত করল। শফিকানের বিখ্যাত তুলো উৎপাদক শরিফ বোবো হায়াইয়েভ কিজিল কুম মর্ভূমি থেকে উদ্ধার করা জমিতে 'সাদা সোনা' ফলাতে লাগলেন। যেখানে আগে ছিল বালিয়াড়ি সেই মর্ভূমিব প্রান্ত বরাবর যৌথখামারীরা ট্যাঞ্জারিন ও লেবুগাছের ঝোপ বানাল।

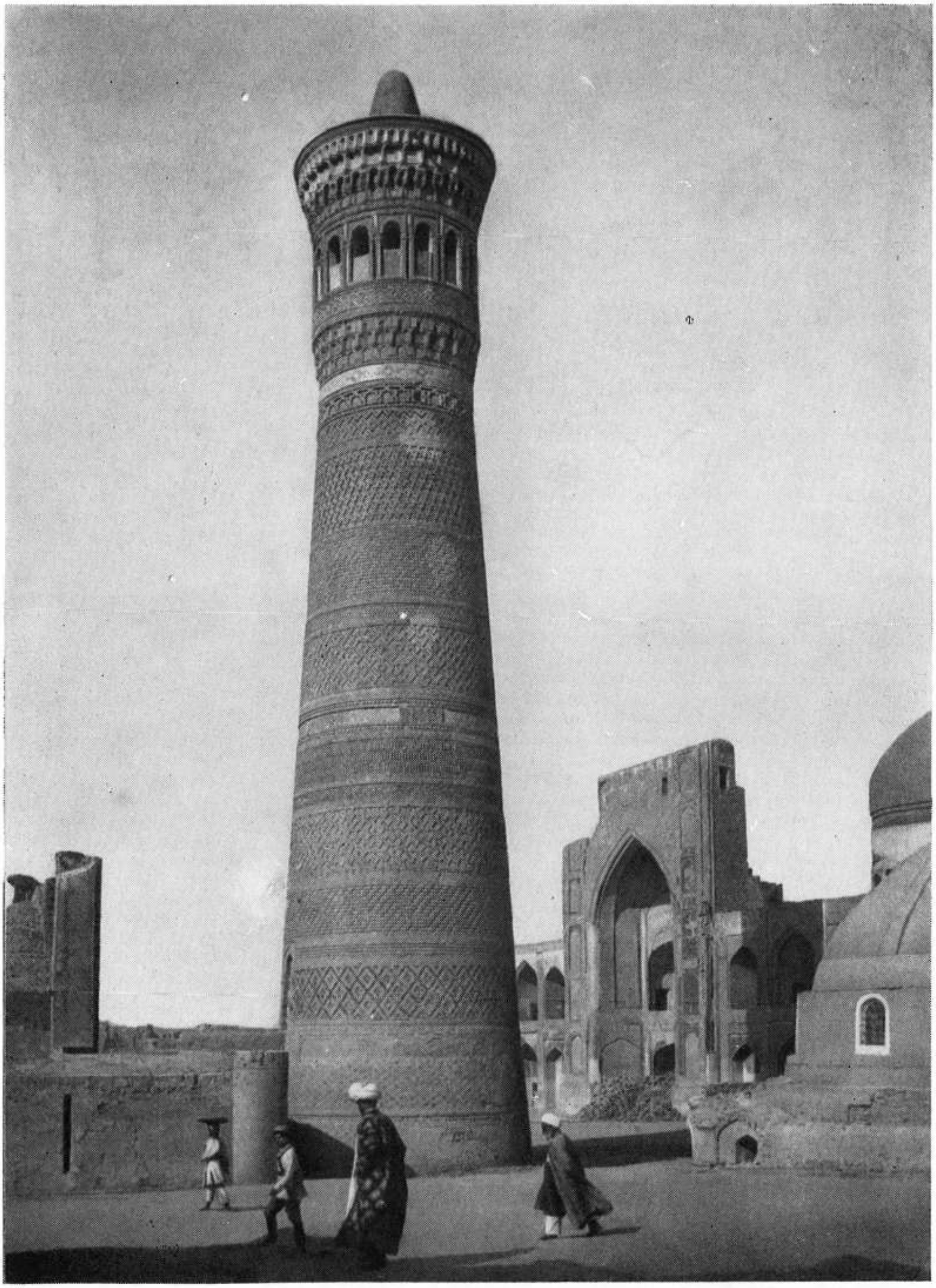
মর্ভূমির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম কষ্টসাধ্য কিন্তু রোমাঞ্চকর। প্রথমে আমি বলে নিই মর্ভূমি কী ধরনের জিনিষ।

সাধারণত ভ্রমণকারীরা মর্ভূমিকে মনে করে এক সীমাহীন বালুর সমুদ্র। সেখানে অভিজ্ঞ 'চালকরা' উটের দল নিয়ে যায়, তারা কম্পাস ও মানচিত্র দেখে পথের নিশানা ঠিক করে সমুদ্রে জাহাজের মতো। মনে হয় বালিয়াড়ির উপর থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। বালুকণা স্ফুলিঙ্গের মতো মুখ পুড়িয়ে দেয়, এখানে দিগন্ত আবৃত হয় বালু ঝড়ের মেঘে। বুখারা মর্দ্যানের চারদিকে অর্ধবৃত্ত আকারের মর্ভূমি এই ধরনের।

সকালে কিংবা সন্ধ্যায় যখন বালিয়াড়ি ছায়া ফেলে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা-চালকরা এখানে কেবল তখনই কাজ করতে পারে। দিনের বেলা এদের পরিলেখ ধরা যায় না। চোখের সামনে মর্ভূমিকে মনে হয় প্রাণহীন একঘেয়ে হলদে বালির সমভূমি বলে। এ সময় মর্ভূমি এতই সমতল যে মাত্র কয়েক পা দূরে হঠাৎ-আবির্ভূত ঘোড়সওয়ার বা উটের দল দেখে চমকে উঠতে হয়, মনে হয় ওরা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, আবার একই ভাবে আপনাকে অতিক্রম করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। এখানে অদ্ভুত দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছুকে তুলনা করার মতো চারপাশে কোন বাড়িঘর বা গাছপালা নেই



বুখারায় সামানিদদের অন্যতম ইসমাইলের সমাধিমন্দির।



পুরাতন বুখারায় কল্যাণ মিনার।

বলে আকৃতি সম্পর্কে যাবতীয় বোধই লোপ পায়। ছোট্ট একটা বালিয়াড়ির চূড়ায় আকাশের পটভূমিতে একটা গিরগিটির ছায়ামূর্তিকে মনে হয় দানবের মতো, ছোট গুল্মকে বিশাল গাছের মতো।

যখন ঝড় ওঠে, বালিয়াড়ির কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া বালু স্রোতে পরিণত হয়। আকাশ ভয়াল লাল হয়ে ওঠে। ঝড়ে-পড়া পথিকরা তাড়াহুড়ো করে বালুর ভিতর সেঁধিয়ে বসে থাকে। কখনো কখনো বালিয়াড়ি কবর হয়ে দাঁড়ায়। পথিকরা যখন বাতাসের দিক ভুল করে কিংবা বহুদিন ধরে ঝড় বইতে থাকে তখনই এরকম ঘটে। মরুভূমির ইতিহাসে কত না শোচনীয় মৃত্যুর কথা লেখা আছে!

মরূদ্যানের কাছাকাছি এই হল মরুভূমির চেহারা। কিন্তু মধ্য এশিয়ার দুটি সর্ববৃহৎ মরুভূমির অন্যতম কিজিল কুমের কেন্দ্রস্থল অন্য রকম। বুখারা থেকে বিমানে করে ওখানে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই এ জিনিসটা নজরে পড়ে। বুখারা মরূদ্যানের চারপাশে অনাবৃত চলমান বালুরাশি ছড়ানো। মানুষ এই বালুরাশিকে আলগা করে দিয়েছে। কিন্তু কিজিল কুমের গভীরে, সীমাহীন বালুর বিস্তৃতি সবুজ আঁচিলে ঢাকা, সেখানে বিভিন্ন রঙের দাগ। লালচে ভূভাগ দৃশ্যের ওপারে মাঝে মধ্যে কালো পাহাড়শ্রেণী। বিমান থেকে কারাকুল ভেড়ার দলকে কালো পুকুরের মতো মনে হয়। এই হল আসল মরুভূমি যার আছে নিজস্ব প্রাণ ও কবিতা, যে মরুভূমি নিয়ে নিজের প্রথম প্রেমের কথার মতো গভীর আদরের সঙ্গে বলে থাকে বৈজ্ঞানিক ও মেষপালকরা।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কিজিল কুম ও কারা কুম বিশেষ ধরনের মরুভূমি: তাদের গাছপালার শতকরা পঁচাশি ভাগ একমাত্র এইখানেই জন্মায়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সাকসাউল, বালু বাবলা ও আরও বহু রকমের গাছের অর্ডার দেয়। এদের ভিতর পাওয়া যায় রবার, রঞ্জক ও ওষধি।

উজবেকিস্তানে প্রত্যেকেই সাকসাউল গাছকে চেনে—পৃথিবীর সব চাইতে বাঁকা গাছ এটি। এর কাঠ এত ভারি যে জলে ডুবে যায়, এত শক্ত যে কাটা দায় আর এত ভঙ্গুর যে পাথরের উপর বাড়ি মেরে গুড়ো করা চলে। প্রায় কয়লার সমান উত্তাপ দেয় এই কাঠ এবং জ্বলে যাওয়ার পর সামান্য একটু সাদা ছাই পড়ে থাকে। কিন্তু সাকসাউল বন খুব কম লোকই দেখেছে।

কিজিল কুমে সাকসাউল বন এমন গাছে ভর্তি যেগুলোকে দেখতে বাদামী সাপের মতো, কিম্ভূত নৃত্যভঙ্গীতে শিলীভূত। পাতাগুলি নলাকার, এত সরু যে ছায়া দেয় না। সাকসাউল বনের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো সিধে ঢোকে, শাখার ফাক দিয়ে বহুদূর

দৃষ্টি চলে। বনে কোন শব্দ নেই, এমনকি মৃদু মর্মরও নেই। যখন রাত নামে, চাঁদ ওঠে আকাশে সবকিছুকে নীলাভ আলো ঢেলে মনে হয় মায়াময় বন চাঁদের দেশের, এ পৃথিবীর নয়। আকাশের সুদূর রুপোলী চাকতিকে পৃথিবী বলে ভ্রম হয়।

যেখানে সবকিছুই অদ্ভুত সেই মরুভূমিতে সবপ্রথম এলে এই অনুভূতি জাগে যে অন্য কোন গ্রহে এসেছি। নোনা জমি কখনো লবণে তুষার-সাদা, কখনো বা তার বুকে জন্মানো নোনা উদ্ভিদের উজ্জ্বল-সবুজ, হলুদ, পাটল, রক্ত-লাল বা ঘোর-বেগুনী রঙ হলুদ-ধূসর ও কমলা রঙের বালুরাশির বুকে ছড়িয়ে আছে। তাকিরগুলি (কর্দমাক্ত, সমতল ভূমিখণ্ড, দূর থেকে মনে হয় উজ্জ্বল আর্শির মত, কখনো বা বালুর বুকে নীল হ্রদের মত) অশ্বখুরে এ্যাসফল্টের মত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

কিজিল কুম বন্য প্রাণী-সম্পদ ও বৈচিত্র্যে ভরা।

অনবরত দিক পরিবর্তন করতে করতে গিরগিটি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংখ্যায় এত বেশী যে মাছের ঝাঁক বলে মনে হয়। কতকগুলি আছে যারা পাখির মত কিচিরমিচির করে। আগামা নামে একরকম টিকটিকি আছে। উত্তেজিত হলে তার সাদা বুক উজ্জ্বল-নীল হয়। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর আপাদমস্তক কাঁপতে থাকে। দেহের পাশ দিয়ে বালি ঠেলে চট করে বালির ভিতর ডুব মারে। ক্ষিপ্রগতি জেরবোয়া প্রায়ই পিছনের পায়ে দাঁড়ায়, কিছুটা মানুষের মতো কিন্তু প্রচণ্ড লাফ মেরে চলাফেরা করে। চোখদুটো এত বড় যে, মনে হয় চশমা-পরা, মুখটা বড়, সামনের থাবা ছোট, জানোয়ারটা অসম্ভব কৌতূহলী। অস্বাভাবিক মরুভূমির মধ্যে সাকসাউল জের মতোই এরা সাধারণ প্রাণী। সে পাখী বালির উপর ঘুরবার সময় ল্যাজ ঘোরায় খালি, ডানা ঝাপটায় আর সরু ঠ্যাং দিয়ে অসম্ভব লম্বা পা ফেলে।

চারা গাছের ডাঁটা ধরার জন্য কচ্ছপ গলা বাড়িয়ে দেয় — থুত্থুড়ে বুড়ীর মতো গায়ে ভাঁজ। লাল-বাদামী বোড়াসাপ অসতর্ক সুসলিকের দিকে চুপিসারে এগিয়ে চলে। প্রকাণ্ড পিচ-কালো গুবরে পোকা পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে চলে উষ্ট্রমলের বলটিকে। লাল-রঙা কারাগান্কা শেয়াল ল্যাজ দিয়ে বালুর উপর রাস্তা ঝেঁটিয়ে ছোটে। সাদা ছোপ বুকে শিং-ওয়ালা ও শিং-ছাড়া বাদামী-হলুদ স্তেপ-সাইগারা (saiga) চোখের সামনে দিয়ে অপসৃয়মাণ প্রেতের মত সরে যায়।

মরুভূমির কূপ অত্যন্ত গভীর, কোন কোনটা ৩২৫ ফুট পর্যন্ত নীচু। মরুভূমির প্রাণকেন্দ্র এই কূপগুলি দিয়েই কিজিল কুমের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ সুরু।

বিশ বছর আগে দেখা একটা কূয়োর কথা আমার মনে আছে। কূপের খুব কাছে গ্রাম্য

সোভিয়েত ভবনের উপর একটি লাল নিশান পত পত শব্দে বাতাসে উড়ছিল। এরই পাশে কয়েক দিনের জন্য ফেলা যাযাবর মেষপালকদের তিনটি ছেঁড়াখোঁড়া ইয়ুরত। দূরে দুটি সাদা ক্যানভাসের তাঁবু, এর একটি স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তারদের আর একটি হাইড্রজিওলজিস্ট দলের। দু'তিনটি মেষপালককে সব সময়েই দেখা যেত হাইড্রজিওলজিস্টদের তাঁবুর পাশে, সংযতভাবে এটা সেটা নিয়ে কথা বলছে। ওরা সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট হত তাঁবুর ভিতরকার এক গাদা রহস্যময় যন্ত্রপাতি দেখে: ওর ভিতর আছে ক্যামেরা, পিপা, গবেষণার যন্ত্র, প্রাইমাস স্টোভ, সাবানদানি, টিনের খাবার, দাড়ি কামাবার ব্লেড, ভাকুয়াম ফ্লাস্ক, দূরবীন আরও কত কি। মেষপালকরা বাহ্যত যেমন তেমন প্রশ্ন করে কোনটা কি জিনিস থেকে থেকে জানতে চাইত। মরুভূমিতে নূতন প্রভাতের এই হল প্রথম আলো।

আজ যে-কোনো কূপের কাছে গেলে দেখা যাবে গ্রাম সোভিয়েতের পাশে কমলা রঙের ছোট পাহাড়ের মাঝখানে ক্লিনিক, স্কুলঘর, পশুচিকিৎসার কেন্দ্র, সমবায় দোকান, ডাকঘর ও পাঠাগার। তাছাড়া আছে ডজন খানেক ছোট ছোট ঘর যাতে যাযাবর জীবন ত্যাগ করার পর কিজিল কুমের মেষপালক ও তাদের পরিবাররা বাস করতে সুরু করেছে। মরুভূমিতে বেতার যন্ত্র এসেছে, বালির বুকে পিয়ানোর সুর বাতাস ভেদ করে। হয়ত দেখা যাবে সমবায় দোকানের সামনে লরি থেকে মাল খালাস করা হচ্ছে। এর ড্রাইভার আগে ছিল মেষপালক। সে কাজ করেছে সোভিয়েত সেনাবিভাগে এবং তার সাংস্কৃতিক মান মধ্য রাশিয়ার রিয়াজান বা তাম্বভ অঞ্চলের যে কোন ড্রাইভারের মতোই উঁচু।

প্রথম আমলে যারা স্কুলে ভর্তি হয়েছিল অনেক দিন আগে তারা স্কুল ছেড়ে বিভিন্ন সহরে পড়াশুনো করে হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার, পশুচিকিৎসক বা শিক্ষক হয়ে ফিরে এসেছে সাংস্কৃতিক জীবনের স্পন্দনে গ্রামকে জাগিয়ে তুলতে। যেখানে ছিল প্রাচীন কূপ সেখানে উঠেছে বায়ুচালিত যন্ত্রের ১২০ ফুট ধাতুনির্মিত বুরুজ। এতে চালু হয়েছে চাপদন্ড-ওয়ালা পাম্প। এরই থেকে জল যাচ্ছে মেষপালকের কাছে। আলোক-সঙ্কেতের মত মরুভূমির সর্বত্র এগুলি মাথা তুলেছে। এরা হল কিজিল কুমের নূতন চেহারার বৈশিষ্ট্য।

কিজিল কুমে একটি বাড়ি আছে যেটা অন্যগুলির চেয়ে স্বতন্ত্র। এর চারপাশের হলদে বালিতে জন্মাচ্ছে ফুটি, আঙুর, শশা ও মুলো — নূতন জাতের 'বালু' ফল ও তরিতরকারি। এ ছাড়াও আছে বালি-জাত বার্লি ও মরুভূমির অন্যান্য গাছগাছড়া। বাড়িটি হল উজবেক বিজ্ঞান আকাদমীর কিজিল কুম বালু কেন্দ্র। কিজিল কুমের বিরুদ্ধে সোভিয়েত অভিযানের প্রধান কর্মকেন্দ্র।

এখানে, এই সৃজনশীল পরীক্ষা কাজ, সফলতা ও বিফলতার মাঝখানে ভেসে উঠছে মরুভূমির ভবিষ্যৎ, ভেসে উঠছে সেই দিন যে দিন বালুর ভিতর মাথা তুলবে আঙুর ক্ষেত আর ফলের বাগান। ঘন বনের বৃত্ত রচনা করে উজবেকিস্তানের মরূদ্যান, জলাধার, নদী ও বড় বড় খালগুলিকে ঘিরে ফেলা এবং গাছ ও ঝোপঝাড় দিয়ে ক্ষতিকর ও চলমান মরুবালিকে আটকে ফেলার বলিষ্ঠ পরিকল্পনার উদ্ভাবন কেন্দ্র এইটি।

বহু বছর ধরে কিজিল কুমের উপর বিমান ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিশাল অঞ্চল জুড়ে সাকসাউল বীজ ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে, বুখারা মরূদ্যান প্রান্তে, হাজার হাজার তুলো উৎপাদনকারী-যৌথখামারী পপলার, মালবেরি, ওলিয়েস্টার, ঝাউগাছ, বালু বাবলা ও আরও বহু ধরনের গাছগাছড়া লাগাতে সুরু করেছে।

বুখারাবাসীরা মরুভূমিকে আটকে ফেলেছে, বাধ্য করেছে তাকে পিছিয়ে যেতে। সেদিন আর বেশী দূরে নেই যখন বুখারার চারপাশে জোড়া মরুভূমিকে উপত্যকা ভূমির সমস্ত জায়গা থেকেই সরে যেতে হবে।

তখন কারাকুল মরূদ্যানও ধীরে ধীরে তার জমি ফিরিয়ে পাবে। আগে এটি ছিল বহুবিস্তৃত, কিন্তু এখন বালিতে ডোবা। মরুভূমি অজগরের মতো সোনালী বালুরাশি দিয়ে মরূদ্যানের চারপাশকে চেপে ধরে আর গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে লোকেরা যাযাবর হতে লাগল। মরুভূমি ওদের জমি কেড়ে নিল, বাধ্য করল পশুপালক হতে, মাটির ঘর ছেড়ে ইয়ুর্তে আশ্রয় নিতে। তারা যত বেশী ভেড়া পালতে লাগল, তত দ্রুত তারা মরুভূমির গাছপালা খেতে ও পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করতে লাগল আর কারাকুলকে তত শক্ত করে ঘিরে ধরল বালির বলয়। এই মেষ অসাধারণ ও অত্যন্ত মূল্যবান জাতের। আজ এর জন্মস্থান কারাকুলের নামে এরা পৃথিবীময় পরিচিত।

১১। কারাকুল মরুভূমি

উজবেক মেষপালকরা বলে: 'বালুর উপর আলখাল্লা পাত, কেৎলিভর্তি চা নাও, চতুর লোকদের সঙ্গে কথা বল, তারপর উঠে যদি দেখতে পাও তোমার আলখাল্লায় এক টুকরো ঘাস লেগে আছে তাহলে নির্ঘাৎ বুঝবে জায়গাটা কারাকুল ভেড়াদের উপযুক্ত।' কখনো কখনো কারাকুল ভেড়ার পাল চারণ ভূমির খোঁজে দিনে বিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

উজবেকিস্তানের কারাকুল পৃথিবী-খ্যাত। জন্মাবার মাত্র তিন থেকে পনের দিন পর্যন্ত মেষশাবকের অতি মূল্যবান আস্ত্রাখান কোঁকড়ানো লোম থাকে, সেই আশ্চর্য প্যাটার্ণ ও রং কদাচিৎ পরে পাওয়া যায়, এরই জন্য কারাকুলের এত নাম। মেষশাবককে এত কম বয়সে মেরে ফেলা হয় বলে নানা আজগুবী গুজব রটেছে।

যেমন কেউ কেউ আছে যাদের দৃঢ় ধারণা আস্ত্রাখান হল এমন অ-জাত মেষশাবকের চামড়া, যেটাকে ভেড়ীর পেট কেটে বার করা হয়। গত কয়েক দশক ধরে কারাকুল পশম বিশেষ করে উজবেক কারাকুল নিয়ে কারবার এমন সব কোম্পানীর ভাড়া করা ইংরেজ সাংবাদিকরা অবিরাম এই গুজব ছড়াতে থাকে। কোম্পানীগুলি এগুলিকে রাশিয়া থেকে কিনে বড়লোক মেয়ে খদ্দেরের কাছে বিক্রি করত। বড়লোকরা সঙ্গে সঙ্গে গুজবে বিশ্বাস করত, কারণ এতে করে তাদের দামী কারাকুল কোটের দাম আরও বেড়ে যাবে।

প্রথমটায় কারাকুল মেষের মিশ্র প্রজননের ফল দেখে সোভিয়েত গবেষকরা অপ্রীতিকরভাবে অবাক হয়ে যেতেন। হয়ত সাদা ভেড়ীর সঙ্গে সাদা ভেড়ার জোড় করলেন, ফল দাঁড়াল মরা ছানা। কিংবা দুটো কালোর জোড় করলেন। এর ফল ফলল যা আশা করা গিয়েছিল তার উল্টো — জন্মাল সাদা ভেড়া। কিংবা সেরা জাতের জোড় করে হয়ত নিকৃষ্ট জাতের বাচ্চা পাওয়া গেল। এর কোন মাথামুণ্ডু নেই।

সোভিয়েত পশু প্রজননকারীরা চাইছিলেন আগে থেকে স্থির করা সেরা জাতের মেষশাবকের চামড়া। সুখের কথা পশুপালন সম্পর্কে মিচুরিনপন্থী বিশেষজ্ঞরা কাজটার ভার নিলেন, এরা বিখ্যাত মিখাইল ইভানভের অনুগামী ও ছাত্র। ভাইসমান পন্থীদের সঙ্গে লড়াই করে এরা সাহসের সঙ্গে কারাকুল মেষের অসবর্ণ প্রজনন ঘটাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এরা সফল হলেন — পেলেন প্রথম সুনির্দিষ্ট ফল। নীচের দুটি তথ্য থেকে এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রথম তথ্য এই যে কারাকুল প্রজনন খামারে এখন শতকরা নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগ সেরা মেষশাবকের চামড়া হয়। দ্বিতীয় ও আরও চমকপ্রদ তথ্য হল এই, আজ কেবল বুখারার চারপাশে শুধু কারাকুল ভেড়ারা চমৎকার চামড়া দেয় না, উক্রেন, মলদাভিয়া এমনকি বুলগেরিয়াতেও দেয়, কিজিল কুম আর কারা কুম মরুভূমির সীমাহীন প্রান্তরের কথা ছেড়েই দিলাম।

কিজিল কুমের একেবারে মাঝখানে, মরুভূমি কেটে যাওয়া ছোটখাট পর্বতমালার ঢালু জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা ঝরণার কাছে পুরোনো গ্রাম তামদি। এখানে একটি নূতন কারাকুল প্রজনন কেন্দ্র তৈরী হয়েছে।

আজ তাম্দি মেশিন ও পশুপালন কেন্দ্রের লরিগুলো 'লাল বালুর' বুকে সমাজতন্ত্রী প্রয়োগ টেকনিক বিদ্যা ও সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরা চারণভূমিতে মিশেলী খাদ্য-সার যোগাচ্ছে, ঐসঙ্গে দিচ্ছে খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা। কেন্দ্রের কর্মীরা পশুপালকদের যন্ত্রের সাহায্যে লোম কাটার পদ্ধতি, কৃত্রিম প্রজনন ও ভেড়ার শ্রেণীভেদ করানো শেখান। বসন্তে এরা বিমানে করে ঘাসের বীজ ছড়ায়। দূরতম অঞ্চলের প্রজনন জায়গায় বার্লি ও অন্যান্য খাদ্য বিমানে করে আনা হয়। মরুভূমির গভীরে যেখানে মাত্র পঁচিশ বছর আগে প্রতিটি লোক ছিল নিরক্ষর আজ তারা চলচ্চিত্র দেখছে, বই পড়ছে।

এসব বই থেকে কিজিল কুমের লোকেরা অনেক কিছু শেখে। কিন্তু মরুভূমি নিজেই ত একখানা পাতামেলা বই — বালিতে দাগ হল যার অক্ষর — এর থেকে তারা সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার পরিচয় পায়। এ বই পড়ছে তারা যুগ যুগ ধরে, ওদের মতো ভালো কেউ এটা পড়তে পারে না। কিজিল কুমের মেষপালককে জিজ্ঞেস করুন এমন কিছু আছে কিনা মরুভূমিতে যার দাগ পড়ে না — উত্তরে সে হেসে উঠবে। কোন দাগ না থাকা মানে ছায়া না থাকার মতো, একেবারে শূন্য। আয়নার মতো মরুভূমির বুকে জীবন প্রতিফলিত। মেষপালকের তীক্ষ্ম দৃষ্টি তাকিরের উপর উটের পায়ের দাগ দেখতে পায়। অপরে সেখানে কিছুই দেখে না।

একবার মস্কোর দু'জন তরুণ ও তরুণী, দু'জনাই ছাত্র, সমরকন্দে কারাকুল উৎপাদন সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন গবেষণা ইন্স্টিটিউটে হাতে-কলমে কাজ শিখতে আসে। শিক্ষার গোড়ায় তাদের দূরবর্তী যৌথখামারে পাঠান হয় 'মরুভূমি কী জিনিষ তার একটা ধারণা করার জন্য'। খামারে পেঁছবার দু'তিন দিন বাদে ওরা মরুভূমিতে বেড়াতে বার হয়। যখন ফিরে আসে আকাশে তারা উঠেছে। পরের দিন সকালে ওদের মরুভ্রমণের খুঁটিনাটি সব কথা আশপাশের সবাই জেনে ফেলল। ওরা খুব পা চালিয়ে এগিয়ে যায়, দৌড়ে পাহাড়ে ওঠে চারদিক দেখবার জন্য। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে সতর্ক হয়ে চলে, সম্ভবতঃ সাপ বা বিষাক্ত মাকড়সার ভয়ে। উজবেকিস্তানে এদের কথা ওরা অনেক শুনে থাকবে। তারপর ওরা বসে বসে গপ্প করে আর নখ দিয়ে বালিতে আঁচড় কাটে। এ সময়টা তারা কাছে ঘেঁষে বসেনি। শেষটায় হাতে হাত ধরে বাড়ি-মুখো রওনা হয় ধীরে ধীরে আসতে থাকে যাতে দুজনা দুজনাকে বেশী সময় ধরে পায়। তরুণতরুণীরা যে স্নেহময় অনুভূতির কথা নিজেদের মনেও স্বীকার করার সাহস পায় না কিজিল কুমের মেষপালকরা বালুর উপর চিহ্ন দেখে তাকে এইভাবে ধরে ফেলল।

সময়ের সুরু থেকে মরুভূমি তার বুকে চিহ্ন এঁকে চলেছে। গুবরে পোকা তিনটে

দাগ রেখে যায়, তিন নম্বর দাগটা ওর টেনে চলা ল্যাজের। মানুষ গোড়ালির উপর ভর করে, কিন্তু উট বানায় গর্ত। একটা জায়গায় শজারুর সঙ্গে নাজার (বিষাক্ত সাপ) লড়াই হয়ে গেছে। নাজাটা পালিয়ে যেতে পারে। আর এক জায়গায় বাঁকানো লাঠি দিয়ে রাখাল একটা তাপরোমেটোপন সাপ ধরেছে, এর মানে নূতন চাবুকে সাপের চামড়ায় হাতল মোড়া তার দরকার ছিল। তাইত, পথ-হারানো উটটা ঘণ্টা দুয়েক আগে এখান দিয়ে চলে গেছে! ওর খোঁজে একজন রাখাল ছেলেকে পাঠাও। ওকে খুঁজে আনার আগে ওর মালিক হয়ত পায়ের দাগ ধরে এসে হাজির হবে — ওর সঙ্গে দিব্যি গপ্প জমানো যাবে।

এখন মরুতে জেগেছে নূতন চিহ্ন। প্রথমেই দেখা দিল দুটো চওড়া দাগ, যেন দুটো বিরাট অজগর পাশে পাশে চলে গেছে। এগুলো লরি চলার দাগ। তার পর এল একটার পর একটা নূতন চিহ্ন।

* * *

প্রাচীন বুখারাকে অর্থনীতির দিক দিয়ে কী ভাবে নতুন করে গড়া হবে সেটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দাম বিকাশের একটি সুদূরপ্রসারী স্বকীয় নিদর্শন। কিছুকাল আগে বুখারা অঞ্চলে দাহ্য গ্যাসের যে বিপুল খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাত-সালা পরিকল্পনায় তাকে আরো অনেক বেশী করে কাজে লাগানো হবে। আসছে সাত বছরের মধ্যে উজবেকিস্তানের ইন্ধন সম্পদের ব্যবহারে গ্যাসের ভাগ শতকরা ৩·৩ থেকে ৬০-এ উঠবে। স্থানীয় গ্যাসকে খাটিয়ে বুখারার কাছে দুটি শক্তিশালী তাপবিদ্যুত কেন্দ্র চালু হবে। শুরু হবে তুলো ক্ষেতের জন্য নাইট্রিক সার এবং আগাছা ও কীট বিনাশী রাসায়নিক জিনিস আর রেশম শিল্পের জন্য সির্কা-শোধিত রেশমের উৎপাদন। প্রজাতন্ত্রের সব চেয়ে বড়ো কারখানা, চির্চিক রাসায়নিক কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে গ্যাস।

শুধু যে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার বিপুলাংশে বুখারা তলানি থেকে গ্যাস যাবে তা নয়, উরালের শ্রমশিল্প কেন্দ্রেও। বুখারা থেকে সমরকন্দ হয়ে তাসখন্দ পর্যন্ত একটি গ্যাস-নালীর নির্মাণ চলেছে, পরে এটিকে জম্বুল এবং ফ্রুঞ্জে হয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আলমা-আতা পর্যন্ত। আরো দুটি পরিকল্পনার নক্সা রচনা হয়েছে — বুখারা-চেলিয়াবিনস্ক-স্ভের্দলভস্ক-বেরেজভো ও উজবেক-তাজিক গ্যাস-নালী।

কোটি কোটি বছর উজবেকিস্তানের খনিজ সম্পদ মাটির গভীরে খামখা পড়ে ছিল, সোভিয়েত জনগণের সংকল্পে সেটাকে এখন জাতীয় অর্থনীতির সেবায় লাগানো হবে।

দক্ষিণে

১। বরফ নদীর উপত্যকা

ভাইয়ের সঙ্গে বোনের যেমন মিল, জরাফশানের সঙ্গে উজবেকিস্তানের একটি নদীর তেমনি মিল। এর নাম কশ্‌ক দরিয়া। একই পর্বতমালা থেকে এর উৎপত্তি, বয়েও চলেছে পশ্চিমে, কিন্তু এর অবস্থান দক্ষিণে। জরাফশানের মতো এর দুইপাশে দুটি আলাদা পর্বতমালা, এরা নীচু হতে হতে বিপরীত দিকে এগিয়ে গিয়ে বালুর বিশাল সমুদ্রে মিশে গেছে। একসময় এ-ও ছিল আমু দরিয়ার উপনদী, কিন্তু বহুদিন আগেই এদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

কশ্‌ক দরিয়ার উপত্যকা — জরাফশান উপত্যকার প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। এর আছে নিজস্ব মরূদ্যান যাকে বলা চলে 'ছোট সমরকন্দ' — এর নাম শাহ্‌রিসাব্‌জ্‌-কিতাব মরূদ্যান। এটি বড়টির মতোই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। 'ছোট বুখারার' মতো এর আর একটি মরূদ্যানও আছে — নাম কার্শি মরূদ্যান। এর চারপাশে স্তেপ আর চলমান মরুবালি। কশ্‌ক দরিয়ার ভাটির দিকে ক্ষুদ্র কাসান মরূদ্যান অনেকটা কারাকুল মরূদ্যানের প্রতিরূপ। এর চারপাশেও কারাকুল ভেড়ার অনেক দল ঘুরে বেড়ায়, এখানেও আছে বায়ুশক্তি-চালিত যন্ত্রের ধাতব বুরুজ।

কিন্তু কশ্‌ক দরিয়া বরফ নদী। এর মূল উৎস বহু শতাব্দীর পুরোনো হিমবাহ নয়, পর্বতমালার উপর নীল বরফের পাতলা আবরণ। জরাফশানের মতো এখানেও বান ডাকে যখন বরফ কালো হয়ে হাজার হাজার ধারায় মধুর শব্দে গিরিখাত ভরে ফেলতে থাকে। কিন্তু জুলাই মাসে রোদ-পোড়া মাটি যখন জলের জন্য আকুল হয়, জরাফশানে যখন প্রবল বান ডাকে (এর প্রচণ্ড গর্জনে পাহাড়গুলো পর্যন্ত কেঁপে ওঠে এবং সব চাইতে চওড়া, দ্রুত ও সতেজ জলধারা উপত্যকা বেয়ে নেবে আসে) সে সময় কশ্‌ক দরিয়ার অবস্থা শোচনীয়। আঁকাবাঁকা তীরের মাঝখান দিয়ে থিতিয়ে চলে এই ক্ষুদ্র নদী।

মধ্য এশিয়ায় যেখানে জল নেই সেখানে প্রাণও নেই। উজবেকরা বলে: 'যেখানে জলের শেষ সেখানে মাটিরও শেষ।' এ জন্যই জরাফশান উপত্যকার তুলনায় কশ্‌ক দরিয়ায় গ্রাম, সহর আর মরূদ্যানগুলি এত ছোট। যা ছোট নয় তা হল বিশাল স্তেপ, প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে বন্ধ্যা।

স্তেপের গভীর থেকে দেখলে ছোট্ট কিন্তু আশ্চর্য একটি মরূদ্যান চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজ পাহাড়ের মতো। এখানে আছে পাশাপাশি দুটো সহর — শাহ্‌রিসাব্‌জ্‌ আর কিতাব।

শাহ্‌রিসাব্‌জের মাঝখানে মাথা তুলে আছে আক সরাইয়ের ধ্বংসাবশেষ। এ হল তৈমুরলঙ্গের 'শ্বেত প্রাসাদের' সামনের দিককার গম্বুজ-সদৃশ বিরাট দুই অংশ। এর উপর চকচক করছে সোনালী, নীল, সবুজ ও ঘন-নীলের কারুকার্য।

শাহ্‌রিসাব্‌জের শিশুরা যখন আক সরাইয়ের তলে রোদে খেলাধুলো করে, দূর থেকে মনে হয় ওদের রঙীন তুবেতেইকার উপর পড়েছে প্রাসাদপ্রাচীরের মোজেইকের টুকরো। সহরে এমন কোন মেয়ে নেই যে ছোটবেলা থেকেই তুবেতেইকার নক্সা সেলাই না জানে। 'ইরাকি', শাহ্‌রিসাব্‌জের বিখ্যাত সূচের নক্সা দিয়ে এটিকে সাজায় এবং তার পাশে আবার 'তেরমার', অর্থাৎ আরও সূক্ষ্ম নক্সা সেলাইয়ের কাজ করে। মেয়েদের জন্য এরা কার্পেটের নক্সা-আঁকা ফতুয়া বানায়, তৈরী করে হাত-ব্যাগ, জুতো, সাদা রেখা দেওয়া ঘোর লাল বেল্ট। এতে নক্সাকে প্রায় স্বচ্ছ বলে মনে হয়। এছাড়া অন্যান্য জিনিসও বানায় ওরা।

হুজুম সমবায়ের সেরা সূচীশিল্পীদের জন্য শাহ্‌রিসাব্‌জ্‌বাসীরা গর্ব বোধ করে। সমবায়ের ওস্তাদ মেয়ে শিল্পী য়ুলদাসখোন দালিলভার নাম প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র। এই সহরের খ্যাতি দেশজোড়া, কারণ শুধু মধ্য এশিয়াতেই নয়, উক্রেন, জর্জিয়া, উরাল, মস্কো ও অন্যান্য জায়গায় মেয়েরা শাহ্‌রিসাব্‌জে তৈরী তুবেতেইকা, হাতব্যাগ বা বেল্ট ব্যবহার করে। ১৯৩৭ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে শাহ্‌রিসাব্‌জের তুবেতেইকা সোনার মেডেল পায়।

শাহ্‌রিসাবজ ও কিতাবের মাটির দেয়ালের উপর ঝোলানো নলখাগড়ার মাদুর রাস্তার শোভাকে অপূর্ব করে তোলে। উজবেকিস্তানের অন্য কোন সহরে এমনটি নেই। শীতের সময় প্রচুর বৃষ্টির হাত থেকে মাদুরগুলো দেয়ালকে বাঁচায়। এ সময় পাহাড় থেকে অর্ধবৃত্তাকারে মরূদ্যানের উপর মেঘ নেবে আসে, পাহাড়ে বাধা পায় বলে বাতাস মেঘ উড়িয়ে নিতে পারে না।

শীতকালের প্রচুর বৃষ্টিতে সমগ্র মরূদ্যানের চেহারাও বিশেষ হয়ে ওঠে। মধ্য এশিয়ায়

আরিকের পাশে গাছ জন্মায় আর এ জন্যই তাদের চেহারা একই ধরনের, তাদের আকার, আকৃতি বা সবুজের আদল যেমনই হোক না কেন। সবসময়েই সারি বেঁধে এদের আবির্ভাব হয় আকাশের বুকে, বাড়ির উপর কিম্বা অন্য গাছের পটভূমিতে। এই গাছের সারি হয় হাল্কা সবুজ বা এত গাঢ় সবুজ যে প্রায় কালো বলে মনে হয়। সারিগুলো কখনো বা কুঁচির মতো কখনো বা ধোঁয়ার কুন্ডলীর মতো গোল, কখনো আলাদা, কখনো একসঙ্গে কিংবা কখনো এর ওর সঙ্গে জড়ানো।

শাহরিসাব্‌জ-কিতাবের মরূদ্যানে গাছ কিন্তু এভাবে জন্মায় না। এরা খাড়া হয়ে ওঠে পাহাড়ে কিংবা পাতায়-ছাওয়া শীর্ষ দিয়ে ভরে দেয় নীচু জায়গা। তার ভিতর দিয়ে পাহাড়ী নদীর মত আরিক বয়ে যায়। রাশিয়ার মতো গভীর ছায়াময় কুঞ্জও আছে, দেখে লোভ হয়, আর আছে গাছগাছড়া ভর্তি বনের ভিতর ফাঁকা জায়গা। গাছের এই স্বচ্ছন্দ বিন্যাস আর সেই সঙ্গে মধ্য এশিয়ার প্রাচুর্য, রঙ ও উজ্জ্বল্য শাহ্‌রিসাবজ-কিতাব মরূদ্যানকে উজবেকিস্তানের ভিতর সৌন্দর্যের লীলানিকেতন করে তুলেছে। সহরের লোকরা যথার্থই কেশ থেকে এর নাম পাল্টে রেখেছে শাহ্‌রিসাব্‌জ অর্থাৎ 'সবুজ সহর'।

শাহ্‌রিসাব্‌জ ও কিতাবের লোকরা তাদের সহরকে বলে 'ছোট সমরকন্দ্‌'। বস্তুতঃ এখানকার ফলের বাগান একই রকম ফলন্ত আর আঙুর ক্ষেত উর্বর। সমরকন্দের মতো টিনের ফল আর চমৎকার মদের জন্য কিতাব বিখ্যাত।

উজবেকিস্তানের মদের এক সুন্দর ইতিহাস আছে। আগে ধর্মীয় প্রথার জন্য মধ্য এশিয়ায় আঙুর থেকে যা তৈরী হত (কিশমিশ ছাড়া) তা হল সিনি (মধুর মতো এক ধরনের ঝোলা গুড়) আর মুসাল্লা (মিষ্টি সরবৎ)। মদও তৈরী হত অবশ্য আর তা কেবল দেখার জন্যই নয়। 'ওরে পেয়ালাদার, ভালবাসার আগুনের বদলে আন মদের আগুন!' বন্ধুদের মজলিসে বুদ্বুদ তোলা মদের গ্লাস উঁচু করে বলে উঠতেন আলিশের নাভোই। 'সরাব আর সাকী ছাড়া মক্কায় গিয়ে আমি কী করব!' সপ্তদশ শতাব্দীর কবি মাশরাব চাখানায় বসে গলা ছেড়ে গান গাইতেন। প্রাণ যা চায়, স্বচ্ছন্দে তাই গাইবার জন্য তিনি জীবন ভোর পাগল সেজেছিলেন। মধ্য এশিয়ায় মদ বানানো হত, মদ খাওয়া হত, কিন্তু গোপনে।

যারা মদ বানাত, তাদের বহুদিনের ধারণা স্থানীয় আঙুর থেকে কিশমিশ বানান চলে কিন্তু মদ নয়, কারণ এখানকার আঙুর খুব বেশী মিষ্টি আর শাঁসাল। এ জন্য তারা বাইরে-থেকে-আনা হাঙ্গেরীয় পার্টলি, আলেক্‌জান্দ্রিয়ার মুস্কাট, টাকভেরি, রকাৎসিতেলি, স্যপেরাভি, রান্ডওয়েইস ও অন্যান্য জাতের ফল লাগাত। কিন্তু মধ্য এশিয়ার ঝাঁঝাঁ রোদে এসব ফলও মিষ্টি হয়ে যেত। ভাটিদাররা দমে গেল। সমরকন্দ, তাসখন্দ এবং পরে কিতাব,

বুখারা ও দেনাউতে অবশ্য বড় বড় ভাটিখানা তৈরী হল। বছর বছর উজবেক মদের উৎকর্ষও বাড়তে লাগল, কিন্তু সমঝদাররা উজবেক লেবেল দেখলেই কদাচিৎ বোত্‌ল কিনত, সে মদ যত ভালই হোক না কেন। সাধারণত লোকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যাই কর আর তাই কর ক্রাইমিয়া বা ককেশাসের মদের সঙ্গে উজবেক মদ কখনো পাল্লা দিতে পারে না।

যখন স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধ সুরু হল, অভিজ্ঞ মদ তৈরীর লোক ক্রাইমিয়া থেকে হাজির হল উজবেকিস্তানে। এদের কেউ কেউ এল পোটলাপুটলি ছাড়াই, একেবারে এক বস্ত্রে কিন্তু পরীক্ষামূলক আঙুরের লতার নমুনা তারা সযত্নে সঙ্গে এনেছিল শণের কাগজে মুড়ে। এই হল তাদের ভবিষ্যতের আশাভরসা। এদের উৎসাহ এত বেশী যে দেখে মনে হল মধ্য এশিয়ায় না এসে সুদূর মেরু অঞ্চলে গিয়ে হাজির হলে সেখানেও তারা আঙুর বানিয়ে মদ তৈরী করে ছাড়ত।

উজবেক মদ খেয়ে প্রশংসা করল তারা। তাসখন্দ, সমরকন্দ, কিতাবের আঙুর ক্ষেত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে বলল স্থানীয় বহু জাতের আঙুর থেকে সেরা মদ বানানো চলবে। এই ভাবে ভুল ধারণা কাটানো হল। উজবেকিস্তানের সেরা মদ ককেশাস, ক্রাইমিয়া ও মলদাভিয়ার প্রখ্যাত মদের সমকক্ষ হল। আজকের সমঝদাররা 'উজবেকিস্তান', 'জাউস', 'বিশতি', 'বুআকি' নামের মদ কিংবা তাসখন্দে তৈরী লাল রঙের 'সোভিয়েত স্যাম্পেন' কিনতে দ্বিধা করে না। মধ্য এশিয়া থেকে ১,৮০০ মাইল দূরের লোকরা বিয়ে বা নূতন বছরের উৎসবে মদের গ্লাসে এক চুমুক মেরে বোতল তুলে লেবেলটি দেখে—মনে করে রাখে নামটাকে। লেবেলের উপর তাসখন্দ, সমরকন্দ বা অন্য কোন উজবেক সহর যেমন কিতাবের নাম লেখা।

কিন্তু মদের জন্য কিতাবের নাম নয়, এর আসল নাম অন্য কারণে। কিতাব অক্ষাংশ কেন্দ্রে বই আর চিঠিপত্র আসে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এটি এই ধরনের একমাত্র কেন্দ্র এবং পৃথিবীর পাঁচটির ভেতর একটি। কিতাব সহ এই সব কেন্দ্রগুলি একই অক্ষরেখায় অবস্থিত। ৩৯°০৮´ উত্তর অক্ষাংশে।

কিতাব কেন্দ্রের নাম উলুগ-বেগের নাম অনুসারে। বিশ্বের ইতিহাস বিবেচনা করলে তাঁর সময় থেকে যে পাঁচ শতাব্দী কেটে গেছে তা একটি মুহূর্ত মাত্র। যে তারাদের তিনি দেখেছিলেন তাদের আমরাও দেখছি। হয়ত তিনি জন্মাবার আগে এদের কেউ কেউ লুপ্ত হয়েছিল কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে তাদের আলো পৌঁছচ্ছে আমাদের কাছে। উলুগ-বেগের সময় থেকে মানুষের অগ্রগতি ঘটেছে প্রচন্ড, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও। জ্যোতিঃশাস্ত্র বহু নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, এর মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ পৃথিবীর আবর্তনের বিজ্ঞান।

সবাই জানে পৃথিবী তার অক্ষে ঘোরে। তবু অনেকেই জানে না বা জানলেও সম্প্রতি বুঝতে শিখেছে যে পৃথিবী যেমন ঘোরে তেমনি উত্তর ও দক্ষিণমেরুও জায়গা বদলায়—কখনো পাক দেওয়া ইস্ক্রুপের মতো কখনো বা পাক খোলা ইস্ক্রুপের মতো।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় জ্যোতির্বিদরা কিতাব অক্ষাংশ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসেন। ছায়াঘেরা কুঞ্জ পেরিয়ে তারা যান একটি মণ্ডপে। এর সাদা দেয়াল গাছের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে। মণ্ডপে আছে একটি 'জেনিথ' দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এটা খুব বড় বা শক্তিশালী নয়, কিন্তু একেবারে নির্ভুল। স্থানীয় জ্যোতির্বিদদের আসল কথাই হল নির্ভুলতা। তারা দূরবীক্ষণের উপর জোরে শ্বাস ফেলে না, ছোঁয়া ত দূরের কথা পাছে কোন গোলযোগ হয়। সারা রাত ধরে জ্যোতির্বিদরা সেই মুহূর্তগুলি টুকে রাখেন যখন বিশেষ তারাগুলি পৃথিবীর এই জায়গার উপর বিশেষ কোন দিক ধরে চলতে থাকে। তাদের পর্যবেক্ষণ-মানচিত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় কি ভাবে পৃথিবীর অক্ষাংশের তারতম্য ঘটে এবং মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মেরু জায়গা বদল করে।

প্রতি চোদ্দ বছরে একবার পূর্ণ আবর্তন খায় এই যে পরিক্রমা তার কথা দেড়শ বছর আগে বিজ্ঞানী এইলের গণনা করে গেছেন, ইনি বলবিদ্যার নিয়মকে পৃথিবী পরিক্রমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। অপর গতি, যাতে এক বছরে হয় একটি বৃত্তাভাস ক্ষেত্র তার কারণ নির্দেশ করেছেন সোভিয়েত জ্যোতির্বিদ আ. ওরলভ। বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর বুকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বরফপুঞ্জের বিস্তৃতির জন্য এই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অক্ষাংশের কোন কোন তারতম্য সম্পর্কে জ্যোতির্বিদ বা পদার্থবিদরা এখনও কোন কারণ দেখাতে পারেননি। এই রহস্যের সমাধানে মানুষের নিকট এখনও অপরিজ্ঞাত বা নূতন, পৃথিবীর বিশেষ ধর্ম সম্পর্কে গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট হন কিতাব বিজ্ঞানীরা যখন সূর্য তার জ্বলন্ত পথে চলে।

২। বাইসুন পাহাড়

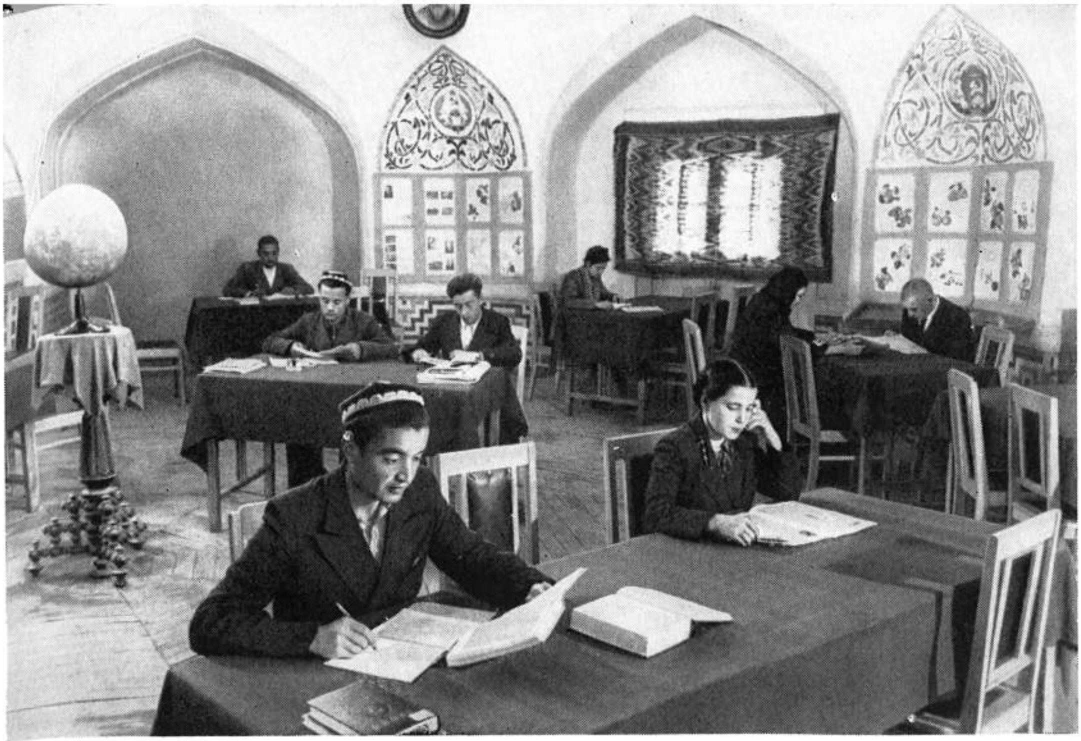
চলার পথে পাহাড়ী নদীর একটানা শব্দ কানে আসে—মনে হয় যাঁতায় অবিরাম পাথর গুড়ো হচ্ছে। পাহাড় চূড়া থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে কাঁপন ধরাচ্ছে। মাথা-ঘুরে-ওঠে এরকম উঁচুতে রাস্তা এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। প্রতি মোড়ে আশাতীত সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে অবধারিত ভেসে ওঠে।

কখনও দেখা যায় সিংহের চামড়ার মতো কপিশ রঙের উপত্যকা, পাশে মাটির ঘর আটকে আছে। বড় বড় পাথর রাশির ভিতর ওদের দেখবার জন্য ভালো করে নজর দিতে

হয়। কখনো বা চোখে পড়ে কালো শিলার উপর দাড়ানো সাদা বা লালচে চুনা পাথরের অদ্ভুতাকৃতি খাড়া পাহাড়। এদের পটভূমিতে মনে হয় গাছগুলি শূন্যে ঝুলে আছে, গিরিসঙ্কটের ভিতর ঢুকে-যাওয়া সূর্যরশ্মি এদের মাথাগুলোকে মোমবাতির মত জ্বলজ্বলে করে তোলে। পাশে মসৃণ ও তৃণহীন খাড়া পাহাড়ের ভিতর নীল আয়নার মতো ছোট্ট হ্রদ চকচক করছে। দূরের মেঘ-জমা পাহাড়ের বুকে খাড়াশিং বুনো ভেড়ার দল মাঝে মধ্যে ভেসে উঠে ছায়ামূর্তির মত মিলিয়ে যায়।

কারাশি স্তেপ থেকে খরেজ্মের এক ভ্রমণকারী প্রথম এর তুষারাবৃত চূড়া দেখে বাইসুন তাউ পাহাড়ের নাম দিয়েছিল 'পাগড়ি-ওয়ালা' আর এদের উপরে পাকা-চুল কুলপতির মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উজবেকিস্তানের সব চাইতে উঁচু পাহাড় (১৬,৩৭৭ ফুট) হজরত সুলতান শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের পাশ দিয়ে বিশৃঙ্খলভাবে বিক্ষিপ্ত পাথর শিলার মাঝখানে শুয়ে আছে কালো ও গম্ভীরমূর্তি সেভেরৎসভ হিমবাহ, মনে হয় দাদ আর ক্ষতে ভর্তি। ঐখানে পাহাড়ের ঐ উঁচু সারিতে আর বরফ ঢাকা বন্ধুর ও ঢালু জায়গাতে সাদা মাথা কুমাই আর বরফ শকুনরা বাসা বাঁধে, মানুষ কদাচ যায় ওখানে। যারা আসে তারা টোপোগ্রাফার, কাঁধের উপর সিমেণ্ট আর পাথর ছেঁদা করার তুরপুন — উদ্দেশ্য কোন না কোন পাহাড়ের চূড়ায় তাদের বিশিষ্ট ত্রিকোণমিতি-খুঁটি বসানো। আর আসে হিমবাহ বিশারদ, পর্বতারোহী কিংবা শিকারীর দল।

পাহাড়ের উঁচুতে চমৎকার শিকার মেলে কিন্তু পর্বতবাসীরা নীচু অঞ্চলে শিকার করতে ভালবাসে। এখানে আছে উঁচু উপত্যকা আর বন-ছাওয়া ঢালু জায়গা। এখানকার সব চাইতে বড় বনগুলো আর্চার, দেখতে গাছের মতো এই জুনিপার মরুভূমির উত্তাপ থেকে দূরে ঢালু জায়গায় ঝোপঝাড়ের মতো গজায়। কাঁটাওয়ালা আর্চা-গাছের ঘোর বনে এলম্, ম্যাপেল ও অন্যান্য বুনো ফলের উজ্জ্বল থোপাগুলো রঙের ছোপ লাগায়। মাঝে মধ্যে বার্চ বা রোয়ান গাছও দেখা যায়। একটা বেজী সতর্কে চলে যায় পেস্তা ঝোপের পাশ দিয়ে। শুঁকতে শুঁকতে আর ক্ষুদে চোখদুটোকে পিট পিট করে ঝোপের ভিতর দিয়ে বুনো শুয়র চলে বরফ-ঠাণ্ডা ঝর্ণার দিকে। এক আধবার ধূসর শেওলা-ঢাকা-পাহাড়ের পিছন থেকে কিংবা হথর্ণ ঝোপ বা কারাণ্ট ঝাড় থেকে নকুলের সাদা নাক বা ব্যাজারের (badger) বিষণ্ণ মুখ ভেসে ওঠে। পাথর ছড়ানো পথের উপরে বাদাম গাছের ঝোপে গুঁড়ি মেরে চলে একটা সজারু।' বুনো পিয়ার গাছের উপরে বসে মজাসে ফল খায় একটা ভালুক। বন জুড়ে পাখির মিষ্টি গান আর পাখনার আওয়াজ। ভাষায় কী করে ঐ ধ্বনিময়, সুগন্ধি আর বর্ণ-বিচিত্র অঞ্চলের বর্ণনা দেব!



বুখারায় আভিসেন্না গ্রন্থাগারের একটি পাঠাগার।

বুখারা রেশম গুটোনো মিলের এই বিভাগে তৈরী জিনিস জড় করা হয়।





উজবেকিস্তানে পর্বত আরোহণকারীদের একটি দল।

মরুভূমির দৃশ্য।



বাইসন পাহাড়, বিশেষ করে ওর দক্ষিণের ঢালু জায়গাটি এ ধরনের বনে ভর্তি। কিন্তু বেশীর ভাগই নজরে পড়ে ছেঁদাওয়ালা পাহাড় ঘেরা গিরিসংকট আর উপত্যকা বরাবর ঘাসের বিস্তৃত মাঠ।

চারণভূমিতে যান, কুয়াশা-চাপা ছোট্ট আগুনের কুণ্ডের পাশে রাখালদের সঙ্গে রাত কাটান। দেখা যাবে ওখানে, প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে অত দূরেও লোকদের ভিতর জেগেছে আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা। অন্যান্য জায়গার মতো ওরাও ক্রমাগত নূতনের খোঁজ করছে — বিফল হচ্ছে, সফল হচ্ছে আবার।

রাখালরা বলবে 'হিসার' হল পৃথিবীর ভিতর মাংস আর চর্বির দিক থেকে সব চাইতে বড় জাতের ভেড়া। ছ' মাসের বাচ্চার ওজন ১০০ পাউন্ড, মানে রমানভ জাতের পূর্ণবয়স্ক ভেড়ার চাইতেও বড়। সব চাইতে বেশী হৃষ্টপুষ্ট হিসারের ওজন ৩২০ থেকে ৩৫০ পাউন্ড। কেবল ওদের পিছনের চর্বির ওজনই হল ১০০ থেকে ১৪০ পাউন্ড। কিন্তু পালে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আগেকার হিসারের আকাশপাতাল তফাৎ। এদের থেকে পাওয়া যেত সব চেয়ে কম পরিমাণ উল, তা দিয়ে শুধু দড়ি বা মোটা ফেল্ট বানানো চলত। পনের বছরের ভিতর রাখাল আর পশুবিদরা তাদের ভেড়ার চামড়া বদলে ফেলে। সুন্দর লোমওয়ালা লিংকনের সঙ্গে হিসারদের মিশিয়ে 'লিনহিস' তৈরী করে। এগুলো হল মোটা ল্যাজ-ওয়ালা নূতন জাতের। হিসারের মতোই ওজন আর পাওয়া গেল পশমী সুতো তৈরী করার উপযুক্ত চমৎকার লিংকন উল।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের সঙ্গে রাখালরা এখন তেমনি ঘাসের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে যা জন্মাবে নুড়িপাথর ছাওয়া পাহাড়ের ঢালু জায়গায়। তা হলে এ সব জায়গাও হবে চারণভূমি। আগেকার দিনে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানোকে অসম্ভব বলে মনে করা হত। 'পৃথিবী সৃষ্টির দিনে আল্লার তৈরী জিনিস কি করে পরিবর্তন করা যায়?'

পাহাড়ে কোন মেষপালক হয়ত এক যাদুকরের গল্প শোনাবে। এই যাদুকর এক বুড়োকে গাধা বানাল, তারপর গাধা থেকে পায়রা, পায়রা থেকে মাছ আর মাছের পেটে বানাল এক দামী পাথর। এই গপ্পবলিয়ের চাউনি যতই সরল হোক বা তাকে যতই বিশ্বাসী ও স্বপ্নালু মনে হোক না কেন, ওর দৃষ্টির গভীরে দেখা যাবে অভিজ্ঞ লোকের বিদ্রূপের হাসি, যা কিছু অসাধারণ বলে মনে হয় তার সরল ও বাস্তব কারণ যে অনেকদিন আগেই বুঝতে শিখেছে। বুদ্ধির এই যে পরিপক্কতা এটা এসেছে সোভিয়েত বাস্তব পরিস্থিতি থেকে। লোকেরা অদ্ভুত কিছুতে আর বিশ্বাস করে না, কারণ নিজেরাই বহু অদ্ভুত জিনিসের সৃষ্টি তারা করছে।

সর্বত্র নজরে পড়বে চারপাশের পৃথিবী বদলাবার জন্য ওদের কি সর্বগ্রাসী আগ্রহ। চারণভূমি ছেড়ে পর্বতমালার গভীরে উপত্যকার উপর ছড়ানো যে কোন একটি রম্য গ্রামে যাওয়া যাক।

ওরা যে অধ্যবসায়ী উপত্যকার চারদিকে উঁচুতে জন্মানো প্রচুর শস্যই তার প্রমাণ। প্রথমটার পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্ট সবুজ জমির টুকরো দেখে এমন কিছু মনে হয় না। (আগের মত, এখানকার জমির মাপ হয় তুবেতেইকা দিয়ে। ওরা বলে: 'এ জমিতে তিন তুবেতেইকা বীজ বোনা চলে আর ওটাতে ছটা।') কিন্তু যে কোন যৌথখামারীই সগর্বে বলবে ওই জমিতে যে গম দেখা যাচ্ছে তা সাধারণ জাতের নয়, ও হল 'ত্যুয়া তিশ' (উটের দাঁত)। শিরাবাদ জেলার যৌথখামারী পরীক্ষক আবদুখলিল ওদিনায়েভ এর উদ্ভাবন করেছেন আর বাইসুন জেলার কুরবান নুরমাতভ এর উন্নতি ঘটিয়েছেন।

বাইসুন মিচুরিনপন্থীদের অগ্রগতি বিরাট। আগে পাহাড়ের বাগানে যেসব ফল জন্মাত তার উন্নতি করা ছাড়াও এরা খুবানী, আঙুর ও পীচফলের চাষ সুরু করেছেন। মিরাকিন জেলার 'মাদানিয়াত' যৌথখামারের সদস্য রহিমাতুল্লা সাফারভ সমুদ্র লেভেলের ১০ হাজার ফুটেরও উপরে যখন খুবানীর বাগান বানালেন সমগ্র পাহাড় অঞ্চল থেকে মিচুরিনপন্থী এল ওঁর কাছ থেকে কলম নিতে।

গবেষকরা আর্চা নিয়েও পরীক্ষা করছেন। এর বৈশিষ্ট্য হল, এগাছ ধীরে ধীরে যেমন বাড়ে তেমনি বহুদিন বেঁচে থাকে। ইয়াকোবাগ জেলায় দুটি বিখ্যাত আর্চা আছে, এর একটা মরে গেছে আর একটা বেঁচে আছে। দুটোই কয়েক হাজার বছরের পুরোনো বলে ধরা হয়। আর্চা থেকে মলম তৈরী হয়। তা ছাড়া, এর থেকে পাওয়া যায় পেন্সিলের ভাল কাঠ। যেহেতু স্কুলের ছাত্র, যৌথখামারী, ডাক্তার, পশুচিকিৎসক, ভূতত্ত্ববিদ, টোপোগ্রাফার প্রভৃতি সবারই পেন্সিল দরকার, এজন্য এই বন সাবাড় হতে বেশী সময় লাগবে না। এজন্যই গবেষকরা আর্চা বন যাতে তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে তার চেষ্টা করছেন।

বাইসুন পাহাড়ের গভীরে বিখ্যাত 'দেরবেন্ত' (লোহার ফটক) গিরিসংকট। গ্র্যানাইট আর পরফিরি পাথরের উঁচু খাড়া দেয়ালের মাঝখানে এই ভয়ংকর খাতের ভেতর সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। বসন্তে একটা ছোট নদী এর নীচে বয়ে চলে। বাইসুন পাহাড়ের উপর যে মোটরের রাস্তা তা গেছে এই গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে।

লোহার ফটক অঞ্চল থেকে দুটো ছোট নদী বেরিয়েছে, গুজার দরিয়া আর শিরাবাদ দরিয়া। প্রথমটা গেছে উত্তরদিকে কারশি স্তেপে, দ্বিতীয়টা গেছে দক্ষিণে সুরখান দরিয়া উপত্যকায়। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে গেছে দুটো নদীর একটার পর একটার পাশ দিয়ে, কখনো

নদীর পাশে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে কখনও বা নীচের দিকে খরস্রোতা ফেনিল জলের কাছাকাছি। মাঝে মাঝে পারাপেট দিয়ে নদী থেকে আলাদা করা হয়েছে রাস্তাটাকে। প্রাচীন কালে এখানে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রাস্তা। এর নীচে সরাইখানার মতো দুটো সহর গড়ে উঠেছিল—গুজার আর শিরাবাদ। যে দুই নদীর প্রান্তসীমায় এদের আঙুর ক্ষেত আর ফলের বাগান ছড়িয়ে ছিল তাদের নামেই এদের নাম, উত্তরে গুজার আর দক্ষিণে শিরাবাদ। প্রাচীন প্রবাদে বলে 'সরাইখানা পৃথিবীর আয়না', বাইসুন পাহাড়ীদের কাছে গুজার আর শিরাবাদ ছিল পৃথিবীর আয়নার মতো।

বাজারে একপাল ভেড়া নিয়ে পাহাড়ী এসে বসত চাখানায় উট আরোহীর কাছ থেকে দুনিয়ার খবর জানতে। এসব গল্প সেই সব ডাকাতদের যারা উটের দলকে আক্রমণ করে লোকদের লুটপাট বা হত্যা করত কিংবা ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। গল্প বলত সে সব লোকের, খানের হুকুমে যাদের নাক কাটা গেছে সেই নাক তৈরীর ওস্তাদদের। আরও গল্প চলত শয়তান বিচারক আর রক্তচোষা মহাজনদের নিয়ে।

পথিকদের অসংখ্য বিপদ, বাইসুন পাহাড়ীরা তার খপ্পরে পড়তে চাইত না। এদের বেশীর ভাগই কখখনো গুজার বা শিরাবাদের বাইরে যেত না। তিন হাজার বছর আগে যেমন তেমন মাত্র তিরিশ বছর আগেও এরা কেবল নিজের জায়গাটুকুতে স্বস্তি বোধ করত। পৃথিবীর বাকি অংশ ছিল অপরিচিত। আজ বাইসুনের তরুণ পাহাড়ীরা অবিশ্বাসের বিস্ময় নিয়ে এসব কথা শোনে কারণ তাসখন্দ বা সমরকন্দ যেখানে সে লেখাপড়া শিখেছে, বেগাবাদ বা কত্ত-কুরগান যেখানে হয়ত সে উজবেকদের বিরাট গণ নির্মাণ কাজে যোগ দিয়েছে, স্ভের্দলভ্স্ক বা ভ্যাদিভস্তক যেখানে সে সৈনিকের কাজ করেছে, কিয়েভ বা কিসিনেভ যেখান থেকে কামান দেগে ফ্যাসিস্ট শত্রুকে তাড়িয়েছে কিংবা মস্কো যেখানে কারিগরি কৌশলের উৎকর্ষের জন্য শিক্ষা নিয়েছে বা খেলাধুলো প্যারেডে যোগ দিয়েছে বা ছুটিতে স্রেফ বেড়াতে এসেছে—এ সব জায়গাই তার আপন ঘরের মতো।

৩। উপগ্রীষ্মমণ্ডলের গাছপালা

শিরাবাদের রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে এগুলে নজরে পড়ে লরির পর লরি চলেছে। জ্বলন্ত রোদে এদের হাওয়ার আবরণের কাচে বহু জায়গায় চিড় ধরেছে। এর থেকে মনে পড়ে তেরমেজ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চাইতে গরম জায়গা। গ্রীষ্মে এখানকার ছায়া-ঘেরা জায়গার তাপমাত্রা ৫০° সেণ্টিগ্রেড আর বালুতে ৮৫° সেণ্টিগ্রেড। পৃথিবীর সর্বোচ্চ

তাপযুক্ত মধ্য সাহারা বা কালিফোর্নিয়ার মৃত্যু উপত্যকার চাইতে এই উত্তাপ খুব বেশী কম নয়।

সোভিয়েত জনগণ সূর্যের এই জ্বালাপোড়া রোদকেই সুরখান দরিয়া উপত্যকার রূপান্তরে কাজে লাগিয়েছে। এর ফলে এখানে এমন সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত তুলো ও উপগ্রীষ্মমণ্ডলের শুষ্ক নিম্নাঞ্চলের উপযোগী অন্যান্য গাছপালা জন্মাচ্ছে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতিতে এ এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

পৃথিবীর প্রধান দেশগুলি মিশরের তুলো কেনে, কারণ এর তন্তু সব চেয়ে দীর্ঘ (১·৫ ইঞ্চিরও উপর) এবং সূক্ষ্ম সুতো খুবই শক্ত। এ দিয়ে তৈরী হয় সেরা কাপড়, মোটরের টায়ার এবং টিকসই অন্যান্য জিনিসপত্র। বেশী দিনের কথা নয় যখন একমাত্র নীল নদের উপত্যকায় এই রোদ-প্রিয় তুলো জন্মাত। বিশ্ববিজ্ঞান বলত সোভিয়েত রাশিয়ায় মিশরের তুলো জন্মাতে পারে না। তুলো উৎপাদন বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডাঃ হারলেন্ড বহু বার একথা লিখেছেন।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের মিচুরিনপন্থীরা অন্য ধারণা পোষণ করতেন। সে ধারণা সব চাইতে ভাল প্রকাশ পেয়েছে মিচুরিনের নিজের কথায়। আজ একথা সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোন স্কুল ছাত্রই জানে কিন্তু দশ বছর আগে নামজাদা অধ্যাপকরাও জানতেন না: 'প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় বসে থাকা আমাদের চলবে না, সে দাক্ষিণ্য আমাদের জোর করে নিতে হবে।' আজারবাইজান, তুর্কমেনিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের উদ্যমী তরুণ বৈজ্ঞানিকরা মিশরের তুলোগাছের প্রকৃতি বদল করে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সফল হলেন এঁরা। যেটা সবার সেরা, যার থেকে সব চাইতে লম্বা তন্তুযুক্ত তুলো পাওয়া যায়, যার শুঁটিগুলোও সব চেয়ে বড় এবং ব্যাধি-নিরোধকারী, তার উদ্ভাবন করেন উজবেকিস্তানের পরীক্ষক আ. আভতনমভ। উজবেকিস্তানের সুরখান দরিয়া উপত্যকার যৌথখামারীরা বিরাট অঞ্চলে এঁর '৩৫-১' জাতের তুলো এবং পরে এঁরই উদ্ভাবিত '১০৯৬৪' জাতের তুলো লাগাল। উভয় জাতের তুলোই সব চেয়ে তাড়াতাড়ি পাকে।

অভ্যাস দোষে আমাদের নূতন তুলোকে 'মিশরীয়' বলে থাকি কিন্তু এতে মিশরের কিছুই নেই, কারণ সোভিয়েত চারা-গাছ উৎপাদনকারীরা এর শুধু জায়গাই বদল করেননি, রূপান্তরও ঘটিয়েছেন। নীল নদের ভাটির অঞ্চলে যে সেরা জাতের 'পিমা' ও 'মাওরাদ' জন্মায় '১০৯৬৪'র সঙ্গে তাদের কোন তুলনা চলে না, কারণ এর তন্তু আরও বেশী ভাল

ও লম্বা। সোভিয়েত বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত এই নূতন সূক্ষ্ম আঁশের তুলো এখন ব্যাপকভাবে লাগান হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এরা জন্মেছে কশ্‌কে দরিয়া উপত্যকায় এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য মরূদ্যানের পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভাল ফসল দিচ্ছে। এমনকি দক্ষিণ চীনের তুলো ক্ষেতেও এরা হাজির হয়েছে। সেখানে চীনা বন্ধুরা এর যথাযথ নাম দিয়েছে 'সূক্ষ্ম-আঁশ-উজবেক'।

দক্ষিণ উজবেকিস্তান শুষ্ক উপগ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চল-কেন্দ্রের বিরাট বাগিচার সবুজের বিচিত্র আদল ভেসে ওঠে। যখন ফুল ফোটে তখন কত রকমের সুগন্ধ। এই বাগান জুড়ে আছে দেনাউ সহরের এক চতুর্থাংশ। বাগানে আছে জলবায়ুর সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো তিনশ' ধরনের চিত্রবিচিত্র বাহার ঝোপ ও গাছগাছড়া: যেমন কর্পূর ও লেমন ইউকালিপটাস, নীল-কাঁটা আরিজোনা এবং পিরামিড সাইপ্রাস, এলডার পাইন, সোপবেরি গাছ, চীনের চর্বি গাছ, বার্নিশ গাছ, গাটা পারচা, জুডাস গাছ, রেশম বাবলা ও কালো বাদামের গাছ। আর আছে মেলিয়ার ফোলা ঝোপ, পোলোনিয়া, স্পেনিশ ব্রুমের সুগন্ধী হলদে ফুল ও আরও কত শত গাছ।

কেন্দ্রের বাগানে আছে উপগ্রীষ্মমণ্ডলের শত শত ফলের গাছ, শিল্পের উপযোগী গাছ এবং ওষধি গাছ। উপত্যকাতেও এদের ব্যাপকভাবে লাগান হচ্ছে। এখানে আছে ডালিম গাছ (এর ভেতর আছে মিচুরিনপন্থীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হিমসহনশীল), কমলালেবু, ডুমুরের ছেচল্লিশ জাত, রবার উৎপাদক চারা (প্রধানত ক্রিম-সাগিজ), চির-সবুজ আলেক্সান্দ্রীয় গুল্ম, ইউজেনল তুলসী, ডালমেশিয়া কীটপুষ্প ও ভারতীয় ঘাস বিশেষ।

দেনাউ ও তেরমেজের বাজারে যৌথখামারীরা এখন মিষ্টি আলু বিক্রি করে। এ হল উপগ্রীষ্মমণ্ডলের ফলমূল। এই সব উপত্যকায় এখন ব্যাপকভাবে মসুরের চাষও হচ্ছে। এই অঞ্চলে নূতন, ওষুধের গাছ সেনার চাষও চলেছে। যে কোন যৌথখামারের ফলের বাগানে গেলে দেখা যাবে পারসিমন গাছের উজ্জ্বল কমলা রঙের ফল খেজুর। এদের মিষ্টি স্বাদ অপূর্ব।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কখনও আক জন্মাত না। মনে হত কখনই জন্মানো সম্ভব নয়, কিন্তু এখন শুধু আঞ্চলিক কেন্দ্রেই নয় 'হোজারবাগ' রাষ্ট্রীয় খামারে এর চাষ হচ্ছে। ৭৫০ একরেরও বেশী জমিতে এদের লাগানো হয়েছে। কাছেই চালু হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব প্রথম রাম্ কারখানা।

দেনাউ কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মীরা এখন নিজেদের পরীক্ষামূলক বাগানের চা খুশিতে

খায়। এর অর্থ হল কিছুদিনের ভেতরেই উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় যৌথখামারের চা বাগান বসবে।

পেকানের সঙ্গে আখরোটের জোড় করে সুরখান দরিয়ার গবেষকরা এমন এক জাতের নাট বানিয়েছেন যা আগে কখনো দেখা যায়নি। আখরোটের মত বড় ফল অথচ পেকানের মত তেলের পরিমাণ আছে এর ভিতর। বাইসুন পাহাড়ের নাট বনে এ'রা এমন এক আখরোটের সন্ধান পেয়েছেন যা পোঁতবার তিন চার বছরের ভেতরেই ফল দিতে সুরু করে, অর্থাৎ সাধারণ গাছের চাইতে এদের ফলন চারগুণ বেশী। এর সঙ্গে বড় ফলগাছের জোড় করে এ'রা বানিয়েছেন তাড়াতাড়ি পাকে এমন জাতের আখরোট।

উজবেকিস্তানের মিচুরিনপন্থীরা কেবল ফলের বাগানেই প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাচ্ছেন না, বুনো ফল ও নাট বনের ক্ষেত্রেও এই কাজ করছেন। যেমন বাবাতাগ পর্বতমালায় (পূবে সুরখান দরিয়া উপত্যকার পাশে অবস্থিত) বুনো পেস্তাগাছের বন আছে কয়েক শ'একর জুড়ে। এখানে ও'রা বুনো পেস্তাগাছে তেলভর্তি পরিশীলিত কলমের গাছ লাগান। আজ এই উন্নত ধরনের গাছের ফল আপনা থেকেই মেলে যায়, পরিশীলিত পেস্তার এই হল সব চেয়ে মূল্যবান বৈশিষ্ট্য।

সুরখান দরিয়া উপত্যকা থেকে খোজা পিরিয়াখের বরফ-ঢাকা চূড়া দেখা যায়। এটা উজবেকিস্তানের সব চেয়ে উ'চু পাহাড়ের ভিতর দ্বিতীয়—মাথা তুলেছে বাইসুন পাহাড়ের ওপর। দেনাউয়ের ফল উৎপাদকদের প্রিয় নদী তুপালাঙ বেরিয়েছে খোজা পিরিয়াখের কাছ থেকে। যেখানে পাহাড়ের নীচ থেকে তুপালাঙ বেরিয়ে উপত্যকা বেয়ে চলে গেছে সেখানে দাসনাবাদ গ্রাম। এর কাছেই জন্মায় সেরা দুই জাতের ডালিম 'কাজাকে' আর 'কিজিলোনোর'। পর্বতমালার গভীরে যেখানে সরু সংকটের ভিতর দিয়ে ফেনিল তুপালাঙ গর্জে চলেছে তারই ঢালু অঞ্চল বুনো ডুমুর, বাদাম আর আখরোট গাছে ঢাকা।

এমনি এক আখরোট ঝোপের মাঝখানে সারিসারি শোভা পাচ্ছে নূতন সহরের সাদা বাড়িগুলি। বিখ্যাত শারগুণ কয়লা খনির শ্রমিকদের বাড়ি এগুলো। এখান থেকে তোলা হয় সেরা জাতের কোক কয়লা। শারগুণ কয়লা খনি দক্ষিণ উজবেকিস্তান ও প্রতিবেশী তাজিকিস্তানের শ্রমশিল্পকে কয়লা সরবরাহ করে।

সুরখান দরিয়া থেকে আমু দরিয়ার দিকে এগুলে পৌঁছান যায় জার কুরগান মরূদ্যানে। এখানে নূতন তেল কূপের ভার তোলার যন্ত্র বসেছে।

চমকপ্রদ অবস্থার ভিতর এই কূপের উদ্ভব। ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্দারের ঐতিহাসিক এরিয়ান লিখেছেন: 'আলেকজান্দার যখন ওক্সাস্ নদীর পারে তাঁবু গাড়েন

তাঁর তাঁবুর অদূরে একটা ঝর্ণা বেরিয়ে আসে আর তারই কাছে বার হয় তেলের একটা ছোট নদী।' তেইশ শ' বছর বাদে এই বিবরণ পড়ে সোভিয়েত ভূতত্ত্ববিদরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তেলের খোঁজ করতে করতে তাঁরা তেল আবিষ্কার করেন, প্রথমে এরিয়ান বর্ণিত জায়গায় পরে উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায়। জার কুরগানের তেল কর্মী আর সেই সঙ্গে শারগুণের খনিশ্রমিক, শিরাবাদ; শুরচা ও তেরমেজের তুলো উৎপাদনকারী এবং দেনাউ ও সারি আশিয়ার ফল উৎপাদকরা এখন সুরখান দরিয়া উপত্যকার এই চারটি প্রধান পেশার লোক।

সুরখান দরিয়া উপত্যকায় অসাধারণ ও ভয়ঙ্কর ধরনের কাজ করে আর এক দল লোক, উজবেকিস্তানের সুনামে এদেরও অবদান আছে যদিও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে কাজের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। এরা বিষাক্ত সাপ ধরে বেড়ায়। গুরজা, এচিস বা গোখরো পেলে এদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তাড়াতাড়ি ওষুধ না পড়লে এদের কামড়ে মারা যেতে হয়। একথা যেন কেউ না মনে করেন যে মেয়েদের হাতব্যাগ বা বেল্টের জন্য এরা সাপ ধরে বেড়ায়। কম বিষাক্ত বা বিষহীন সাপের চামড়া দিয়ে মেয়েদের হাতব্যাগ তৈরী হয়। শিকারীরা এদের দেখা পেলেই মেরে ফেলে। গুরজা, এচিস বা গোখরো পেলে এরা চেষ্টা করে ওদের জ্যান্ত ধরতে যাতে ক্যানভাসের থলে করে, ছেঁদা-ওয়ালা বাক্সে পুরে তাসখন্দে পাঠাতে পারে।

তাসখন্দে খাঁচার ভিতর সাপগুলোকে রাখা হয়। গবেষকরা নিয়মিতভাবে এদের বিষ বার করে নেন। সাপগুলো গ্লাসের উপর ছোবল মেরে তারই ভিতর বিষ ঢালে। তারপর বিষ শুকিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উজবেকিস্তান বা নিখিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষামূলক চিকিৎসা ইন্‌স্টিটিউটে। বিষ থেকে তৈরী লঘু দ্রব হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়। সোভিয়েত চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন গোখরোর বিষ এক চমৎকার অবেদনিক। উত্তর উজবেকিস্তানের আর এক সাপের বিষ রক্তকে ঘনীভূত করায় সাহায্য করে — এর নাম তামার মাথা। কোন কোন আবের চিকিৎসাতে গোখরোর বিষ ফলপ্রদ।

৪। সীমান্তে

দূর থেকে দেখলে নূতন তেরমেজের মরূদ্যানকে বিরাট বাগান বলে মনে হয়। অগুনতি গাছের উপর সহরের ধোঁয়া উঠছে। মরূদ্যানে ঢুকে নজরে পড়ে ডান দিকে আর বাঁ দিকে হাজার হাজার জলের উজ্জ্বল রূপোলী ধারা। মরূদ্যানের ভিতর দিয়ে

আড়াআড়িভাবে রাস্তা চলে গেছে দূর থেকে এদের মনে হয় মাথা-নোয়ানো উইলো গাছ, প্লেন-গাছ বা কারাগাছের বিচ্ছিন্ন শিকলের মত। এর ভিতর দিয়ে ধূসর ধুলোর মেঘ তুলে লরি ছুটে চলে।

তেরমেজের বাঁধানো সোজা রাস্তার পাশে লম্বার্ডি পপলারের সার থাকায় সহরের চেহারাটা ছিমছাম। সহরের চারপাশে নীচু দেয়াল। সহর প্রাচীরের ঠিক বাইরে সীমান্ত বয়ে চলেছে। 'বয়ে চলা' বলছি, কারণ সীমান্ত হল আমু দরিয়া। এর দক্ষিণ তীর সোভিয়েত অঞ্চল আর বাঁ তীর আফগানদের।

তেরমেজের দক্ষিণে দিগন্ত বরাবর ভাঙ্গাভাঙ্গা পাহাড়ের সারি। ওখানে আফগানিস্তান। এর লোকেরা পরিশ্রমী আর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা। ওদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে একটা প্রবাদ আছে: 'যে আফগান একবার খেজুর গাছ পোঁতে সে জান দেবে ত গাছ ছাড়বে না।' কোন বিদেশী আক্রমণকারী আফগানিস্তানের জনগণের লড়াইয়ের ক্ষমতা নষ্ট করতে পারেনি। এমন কি যখন মনে হয়েছে যুদ্ধে আর কোন আশা নেই, সামন্ত কর্তা আর বণিকরা যখন দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তখনও আফগানিস্তানের লোকেরা লড়াই চালিয়ে গেছে। শেষটায় জয়ীকেও সরে পড়তে হয়েছে।

আফগানিস্তানের লোকেরা সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার জাতিগুলিকে শত শত খাল, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র, কারখানা ও নূতন সহর, হাজার হাজার যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার, মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা তৈরী করতে দেখেছে।

যে কোন আফগান চাষী আমু দরিয়ার দক্ষিণ পারে জমি চাষ করে বা মাছ ধরে, যে কোন আফগান বণিক তেরমেজ সহরে আসে সেই সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা দেখতে পায়। আমরা এর ফলকে সাধারণ ও স্বাভাবিক মনে করি, কিন্তু তারা দেখে অন্যভাবে, অন্য আলোয়।

সোভিয়েত ভূমির সীমান্ত থেকে উজবেকিস্তানের দিকে চাইলে এখানকার সেই নূতন জীবনের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা প্রাত্যহিক ও সাধারণ বলে ভাবতে শিখেছি, এক সতেজ শক্তিতে ও পূর্ণতায় দেখা দেয়। যে নূতন পৃথিবী আমরা রচনা করেছি তার মূর্তিতে বিস্মিত হয়ে আমরা যখন উজবেকিস্তানের দিকে তাকাই মনে হয় কোটি কোটি চোখ আমাদের পিছনে সীমান্ত থেকে দৃষ্টি মেলে আছে। আমাদের দৃষ্টি যেদিকে ওরাও চাইছে সেদিকে: এই দৃষ্টি এমন এক প্রজাতন্ত্রের উপর যে মধ্য যুগের অন্ধকারের বহু ঊর্ধ্বে তার বিজয় পতাকা উড়িয়েছে, রাজনীতিজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সরল উক্তি ব্যবহার করে বলা চলে এই প্রজাতন্ত্রটি প্রাচ্যে সমাজতান্ত্রিক আলোকস্তম্ভ।

খেরেজম

১। পাগলা নদী

আপনার কি ভ্রমণের সখ আছে? আপনি কি রাতে স্বপ্ন দেখেন সেই শ্রমসাধ্য এবং কখনো কখনো কষ্টকর অথচ মুক্ত ও আশ্চর্য যাযাবর জীবনের?' তার কথা এত উৎসাহ নিয়ে লিখে গেছেন বিখ্যাত রুশ পর্যটক নিকলাই প্রজেভাল্‌স্কি। যদি তাই হয়, যদি লোভ জাগে পর্যটকের জীবনের অভাবিত এ্যাড্‌ভেন্‌চারের জন্য, লোভ জাগে সেই 'সব কষ্টের জন্য যা দূর হয়ে কেবল সাফল্য ও সৌভাগ্যের কথাটুকুই স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকে,' — এক কথায় ভ্রমণের নেশা যদি থাকে তাহলে আমু দরিয়া ধরে তেরমেজ থেকে খরেজ্‌ম মরূদ্যানে অবশ্য যাবেন।

তাছাড়া, আমু দরিয়ার এ্যাড্‌ভেনচারের সবটুকু উপভোগ করতে হলে একা একা দাঁড় বাওয়া নৌকো বা জাহাজে গেলে চলবে না, এতে একঘেয়ে লাগবে। তাই যেতে হবে বাষ্প বোটে নাবিকদের সঙ্গে মিলেমিশে।

খরেজ্‌ম পৌঁছতে ক'দিন লাগবে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করবেন না। ৬০০ মাইল যেতে এক সপ্তাহ, পক্ষ কাল, এক মাস অথবা—ছ'সপ্তাহও লাগতে পারে। সবটাই নির্ভর করে ভাগ্যের উপর। কারণ পৃথিবীর আর কোথাও এম্নি ধরনের পাগলা নদী নেই। এখানকার নৌ চলাচলও অদ্ভুত। একমাত্র 'হাজার দুঃখের নদী' হুয়াই আর মিসিসিপি, যার খামখেয়ালির কথা লিখে গেছেন মার্ক টোয়েন, এদের সঙ্গে 'পাগলা নদী' আমু দরিয়ার কিছুটা মিল আছে।

প্রথমেই একথা বলতে হয় যে আমু প্রতি বছর লোকজনের জমি, বাগান, তরিতরকারীর ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লোকে শুধু বলে 'আমু নিয়ে গেছে'। যে তীর বেয়ে নদী কত

দিন ধরে শান্তভাবে বয়ে চলেছে, হঠাৎ একদিন তারই উপর ছুটে আসে সে, প্রচন্ডভাবে ভাঙতে শুরু করে মাটির চাপড়া, কখনো কখনো দিনে শত শত গজ পর্যন্ত।

এই নদী কত না সহর আর গ্রাম ডুবিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে যে সব কাহিনী শোনা যায় তার ভেতর সব চেয়ে হালের আর তাই সব চেয়ে চমকপ্রদ হল আমুর সঙ্গে তুর্তকুল সহরের লড়াই। এর কথা সবাই জানে, এখন পাঠ্য পুস্তকেও স্থান পেয়েছে। আমার সে সময়কার কথা মনে আছে যখন আমুর ঘাট থেকে তুর্তকুলে যাবার জন্য একটা ছ'মাইল লম্বা ধুলোভর্তি রাস্তা ছিল। তখন কারা-কল্পক স্ব-শাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাজধানী হিসেবে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে তুর্তকুলে। হঠাৎ নদীটি এগিয়ে আসতে লাগল সহরের দিকে। প্রথমটায় কোচোয়ান ছাড়া আর সবাই খুশি হল, কারণ নদীর ঘাট এগিয়ে এলে ভারি সুবিধে। কিন্তু বছর বছর যখন নদী সহরতলীর দিকে এগিয়ে আসতে সুরু করল, ওদের ভয় হল। নদী হয়ত রাস্তাঘাটও ভাসিয়ে নেবে। সহর বাঁচাবার জন্য একটা বিশেষ বাঁধ তৈরীর সংস্থা গড়ে উঠল।

ইঞ্জিনিয়াররা সহরকে বাঁচাবার জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে লাগলেন। সোভিয়েত ভূগোলবিদ ফেদরভিচের 'মরুর মূর্তি' বই থেকে উদ্ধৃতি করে বলতে হয় যে সময় নাগাদ 'আমু এসে তুর্তকুলের বাড়িঘরের কাছে পৌঁছল, হিসেব করে দেখা গেল আমুর হাত থেকে সহর বাঁচাবার জন্য যে খরচা পড়বে তার চেয়ে সহরের মূল্য কম। এ চেষ্টা চালিয়ে লাভ কী? এই বিশ্বাসঘাতক ও দুর্দান্ত নদীর সঙ্গে অবিরাম লড়াই না করে সেই শক্তি ও অর্থ দিয়ে একটা নূতন সহর তৈরী করা কি আরও বিজ্ঞোচিত কাজ হবে না? সে সহর হবে আরও বড় ও সুন্দর, থাকবে সুবিধেজনক ও নিরাপদ জায়গায়।' কারা-কল্পক গবর্ণমেণ্ট ঠিক করল তুর্তকুল ত্যাগ করে নূতন রাজধানী গড়বে। এভাবে প্রতিষ্ঠা হল নুকুস সহরের।

আমু দিয়ে গেলে এই অসাধারণ নদীর খেয়াল আর রণচন্ডী মেজাজ দেখে অবাক হতে হয়।

চাকা দিয়ে জল তোলপাড় করে আপনার গাধাবোট এগিয়ে চলেছে। সে টেনে নিয়ে চলেছে এক জোড়া বজরাকে। আমু'র মধ্যাঞ্চলের বেশীর ভাগ তুর্কমেন প্রজাতন্ত্রে হলেও মাঝিরা সবাই খরেজ্মের উজবেক। এরা ক্যাপ্টেন, কর্ণধার ও খালাসী।

খরেজ্মের মরুভূমির ভিতর যত বেশী যাওয়া যায়, আকাশ তত বেশী নীল ও পরিষ্কার। ডানদিকে কিজিল কুমের বালু—প্রথমে হলুদ ধূসর, পরে কমলা রঙের আর বাঁ দিকে কারা কুমের ধূসর বালুরাশি। মাঝে মাঝে নজরে পড়ে তুগাই, লতা জড়িত গুল্ম

ও গাছপালার চওড়া ভূমিখণ্ড। নদীর পারের জঙ্গলে, তীর বরাবর উজ্জ্বল পাখনা ফেজাণ্টরা বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়, লোক বা জাহাজ দেখে ভয় পায় না।

মহামহিম ও আশ্চর্য নদী আমু বয়ে চলে। দুপুরে বায়ুর তাপ তরঙ্গ এর ঘোলাটে জলের উপর ঝিকমিক করে ওঠে। দূরের জিনিসের পরিলেখ ক্রমাগত বদলে যায়, যেমন তুলোর বজরা নিয়ে স্রোতে ভেসে চলেছে গাধাবোট, এক পাল কারাকুল ভেড়া নদীতে জল খাচ্ছে কিংবা যৌথখামার কায়ুকের (ছোট নৌকা) কালো চারকোণা পাল নদীর বুকে পত পত শব্দে উড়ছে।

আমু'র লালচে জলে তীরবর্তী সবুজের প্রতিবিম্ব পড়ে না। আকাশ, মেঘ বা নদীর একেবারে পার ঘেঁষা বালিয়াড়ির ছবিও জলের উপর ভেসে ওঠে না। এজন্য আরবরা এর নাম দিয়েছে 'জিহুন' বা 'কর্দমাক্ত' নদী। বন্যার সময় এর ৩৫ কিউবিক ফুট জল নিয়ে তাকে বাষ্পে পরিণত করলে ৬·৫ পাউণ্ড শুকনো পলিমাটি পড়ে থাকে। এ ছাড়া, বালুরাশিও ঐ সঙ্গে ভেসে চলে। আমু'র ঘোলাটে তরঙ্গের চূড়ায় সূর্যালোক কখন ঝলসায় না।

গাধাবোট যখন পারের কাছ দিয়ে চলে, এর তীরবর্তী নলখাগড়া আর বালিয়াড়ির বেড় এত দ্রুত সরে যায় যে মনে হয় এক্সপ্রেস ট্রেনের জানলা থেকে ওদের দেখছি। বসন্তের বন্যার সময় আমু'র স্রোতের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে চার গজ পর্যন্ত পৌঁছয়। কিন্তু চড়ায় ঠেকলেই গাধাবোটের খোল হঠাৎ থর থর করে কেঁপে ওঠে। পিছনে দ্রুত আসা খুব লম্বা গুণে টানা বজরাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বোটকে ধরে ফেলে, স্রোতের বেগ আর কর্ণধারের প্রাণপণ চেষ্টায় বজরাগুলো বোটের পাশ দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে চড়ায় ঠেকে।

বোট আর বজরার লোক যদি একটু দেরী করে ফেলে তাহলেই সর্বনাশ। কুড়ি মিনিটের কম সময়ে বজরার পিছনে এক দ্বীপ উঠতে সুরু করবে। হ্যাঁ, সত্যিকারের দ্বীপ! মাঝ নদীতে হলেও ওটা দ্রুত বাড়তে থাকবে। এর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমু হয়ত প্রায় মাইলখানেক পর্যন্ত পাশে সরে নূতন খাতের সৃষ্টি করবে। বজরাগুলো পড়ে থাকবে উঁচু শুকনো জমির উপর। আমুর মাঝিদের কাছে এ ধরনের অনেক গল্প শোনা যায়।

একবার 'মস্ক্‌ভিচ্‌কা' নামে একটা বজরা এরকম ফ্যাসাদে পড়েছিল। নদী এর পাশ থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়। বজরার অন্য ধারে, যতদূর চোখ যায়, কারা কুমের বিস্তৃত বালি। 'মস্ক্‌ভিচ্‌কা' চার্জোী থেকে খরেজ্‌মে মিষ্টিখাবার নিয়ে যাচ্ছিল। রোদের তাপে জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি খারাপ হবার সম্ভাবনা, তাই মেয়ে নাবিকরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কারা কুমে এক মিঠাইয়ের দোকান খুলে বসল। চারদিক থেকে এসে হাজির

হতে লাগল কারাকুল রাখালরা, যেন নতুন ইঁদারার দিকে ছুটছে। ছ'মাস বাদে আমু ফিরে এসে 'মস্ক্‌ভিচকাকে' ভাসিয়ে নিয়ে চলল, শেষটায় একটা গাধাবোট ওকে খুঁজে বের করল।

কিন্তু বোট যদি চড়ায় আটকে যায় তাহলে সাধারণত অন্য ব্যাপার ঘটে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে বজরাগুলোকে খুলে দেওয়া হয়। মাঝিরা হাল, লগি আর নোঙরের সাহায্যে বজরার সামনের দিকে স্রোতের মুখে ধরে রাখার চেষ্টা করে যাতে সামান্যতম বাধার সৃষ্টি হয়। এদের উদ্দেশ্য হল নদীকে তার পথ বেয়ে চলতে দেওয়া কারণ ১,৫০০ থেকে ২,০০০ গজ চওড়া হলেও নদী দুর্দান্ত এবং সামান্য একটু বাধা পেলেই এক পাশে সরবার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে চাকা দিয়ে মাটি আর বালি তুলতে তুলতে বোটটা চড়ার উপর দিয়ে বিরাট এক কচ্ছপের মত নিকটতম বজরার কাছে এগিয়ে চলে এবং তার থেকে এমন কোণে দাঁড়ায় যাতে ওর তলা থেকে ধাবমান জল বজরার নীচের মাটি ধুইয়ে নিয়ে যায়। আমু'র নৌচলাচলকে যথার্থই উভচর বলা হয়েছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনের বোট, বেশীর ভাগ সময়ই চড়ার উপর দিয়ে গুড়ি মেরে চলে। জলশূন্য চড়ার উপর দিয়েও সে চলতে পারে। বজরাগুলোকে চড়া থেকে টানতে আর তাদের যুক্ত করবার জন্য তাকে বহু ঘণ্টা ধরে যে অসংখ্য ও জটিল কসরৎ করতে হয় তা বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়। এসব করে সে আবার চলতে সুরু করে এবং তার গতি হয় এক্সপ্রেস ট্রেনেরই মত, কিন্তু ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা, এমনকি কয়েক মিনিট বাদেও আবার চড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে।

আমি অনুমান করছি পাঠকরা হয়ত অবাক হয়ে ভাবছেন, 'বোয়ারক্ষীরা কই, তাদের খবর কী?' আমু'র বোয়ারক্ষী অবশ্যই আছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তারা নদীতে ঘোরাফেরা করে, জলের মাপ নেয়, খুঁটি পোঁতে। কিন্তু আমু চলেছে এদের চাইতে জোরে। খুঁটির থেকে ওরা ৫০ গজ দূরে যেতে না যেতেই দেখা যায় নদীর ধারা ১০০ গজ দূরে সরে গেছে। আমু সব সময়েই চলাচলের পথ বদল করছে। 'এ অবস্থায় বোয়ারক্ষী কোন কাজে লাগবে?' বিভ্রান্ত পাঠকরা হয়ত এই প্রশ্ন তুলবে। বিপদের জায়গাগুলিতে বোয়ারক্ষীরা বোটের কাছে এগিয়ে না এলে ব্যাপার আরও মারাত্মক হয়ে উঠত। নদীর উপর অনবরত নজর রেখে ওরা মোটামুটি জানতে পারে কোনদিকে নদীর চলাচলের পথ সরে যাচ্ছে এবং চড়াকে এড়াবার জন্য বোটকে কোন রাস্তা ধরতে হবে। সুতরাং, এরা অন্ততঃ কিছুটা কাজে লাগে।

কিন্তু চলাচল পথ চালু রাখার জন্য নদী থেকে মাটি তোলার যন্ত্র বসান হয় না কেন? এরকম ত অন্য জায়গাতেও করা হয়, তাই নয় কি? ঠিক কথা — একবার আমু'তেও

সাকসন ড্রেজ এনে প্রধান চলাচল পথের মাঝখানে বসান হয়েছিল। এর পাইপের ভিতর দিয়ে বালু তুলে পারে ফেলা হচ্ছিল। কিন্তু যন্ত্রচালক পিছনে ফিরে হতভম্ব, মাত্র কয়েক মিনিটের ভিতর সাকসন ড্রেজের পিছনে এত বড় চড়া গজিয়েছে যে একটা খেলার মাঠ হতে পারে। ঐ বিশ্রী ড্রেজ যন্ত্রের তুলনায় আমু অনেক বেশী স্বাধীন, দ্রুত ও পরিবর্তনশীল।

এসব সত্ত্বেও জল যানবাহন কর্মীরা আমু'কে জব্দ করেছে। কঠিন জায়গায় এরা জাহাজকে দ্রুতগতিতে সাহায্য দেয়। নদী যেই জাহাজের সামনে চলাচলের পথে বাধার সৃষ্টি করে অমনি তাকে সাহায্য করার জন্য মাইন ভর্তি বোট নিয়ে বিস্ফোরণকারীর দল সেখানে ছুটে আসে। এরা চড়ার ভিতর মাইন ফেলে আর বোটের পিছনে বিরাট মোমবাতির মত জল আর বালি আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বজরা নিয়ে গাধাবোট রওনা দেয়। প্রতিটি মুহূর্তেই মূল্যবান কারণ আমু আবার রাস্তা আটকে দিতে পারে।

বিস্ফোরণকারী দল ও বোয়ারক্ষী থাকা সত্ত্বেও অন্য নদীতে অভ্যস্ত নাবিকরা আমু'তে জাহাজ চালাতে পারবে না। কারণ জলের পরিমাণজ্ঞাপক খুঁটি, নদীর মানচিত্র বা নদীর চড়ার পরিচয় নিয়ে আমু নদীর ক্যাপ্টেন পথ চলে না, তাকে নদীর হাবভাব বিচার করতে হয়। যেমন করে মরুবাসী বালুর বই পড়ে ঠিক তেমনি সে এই বিরাট বইয়ের মতো নদীকে পড়ে চলে।

কালো ও যেন বাহ্যত ভিতর-চাপা ডিম্বাকৃতি জলরাশিকে পাক খেয়ে উপরে উঠতে দেখলেই অনুমান করতে হবে নৌচলাচল পথটি বদলে যাচ্ছে। উজ্জ্বল ও মসৃণ জলের বুকে রেখা আর বৃত্ত দেখেই বুঝতে হবে একটা চড়াকে নদী ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। পাখার আকৃতি একটা ঘূর্ণির বাঁক বলে দেয় ওখান থেকে একটা চড়াকে নদী ধুইয়ে নিয়ে গেছে। জলের প্রতিটি রেখা, খাত বা কুঞ্চনকে বইয়ের প্রতিটি লাইনের মতো বিচার করে সে। প্রতি পৃষ্ঠাতেই নূতন কিছু, অন্য দিকে মন দিলেই চড়ায় ঠেকার আশঙ্কা। এ জন্যই, কেবল দিনের বেলায়, শান্ত আবহাওয়ায় আমুতে বোট চলাচল করে, কারণ রাতের অন্ধকারে নদীর সব চিহ্ন মুছে যায়, বাতাস তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ক্যাপ্টেন ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, ইঞ্জিন ঘরের সঙ্গে লাগানো কথা বলার চোঙ্গার সামনে। স্থির দৃষ্টিতে নদীর দিকে চেয়ে থাকে সে, তার হাত প্রসারিত অর্কেস্ট্রা পরিচালকের মত। এই হাতের দিকে চেয়ে থাকে হালের মাঝি চাকার উপর যার হাত ঘুরতে থাকে

ক্যাপ্টেনের আঙুল বা হাতের চেটোর প্রতিটি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে। থেকে থেকে ক্যাপ্টেন মাথার উপর হাত নাড়ে আর তা নজরে পড়া মাত্র বজরার মাঝিরা দুর্দান্তভাবে চাকা ঘুরোতে থাকে। এভাবে কখনো কখনো বোট ও তার বজরা বিভ্রান্তিকর চড়ার ভিতর দিয়ে সাপের মতো উদ্দাম গতিতে পথ কেটে যায়।

দুল দুল আতলাগান ও তুয়া মুয়ুন গিরিসংকটের কাছে খরেজ্মের পথের শেষ চিহ্ন। বেণীর মত জড়ানো আমু'র ফেনিল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ পর পর গিরিসংকট দুটো ধরে চলে গেছে। তুয়া মুয়ুনের সব চাইতে সংকীর্ণ অংশে নদীর বিস্তৃতি মাত্র ৩৮০ গজ।

তুয়া মুয়ুন পেরিয়ে জাহাজ আবার এসে হাজির হয় এক চওড়া খালের ভিতর। বাঁ দিকে শারলাউকে লবণ জেটি ও তুলোর গাঁইট পেরিয়ে মাথা তুলেছে ঘোর সবুজ গাছের সার, দুই মরুভূমির ভিতর দিয়ে অতদিন ধরে বোট চালাবার পর এই দৃশ্য অপ্রত্যাশিত। যত এগুনো যায় গাছেরা ততই ঘন হয়ে ওঠে, দিগন্তব্যাপী বিরাট বাগানের সঙ্গে মিশে গেছে ওরা। এই হল খরেজ্ম মরূদ্যান।

২। প্রাচীন খরেজ্ম সভ্যতার সন্ধানে

১৯৩৭ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক সের্গেই তলস্তভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমীর প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযাত্রী দল খরেজ্মে পৌঁছয়। এ ধরনের অভিযান এখানে ঐ সবপ্রথম। আমু দরিয়ার বিপরীত, কারা-কল্পকের পারে বর্তমান খরেজ্মের কাছাকাছি থেকে এঁরা কাজ চালান। একে বলা হত "প্রাচীন সেচ" প্রান্তর। দিগন্তে নীলাভ সুলতান-উইজ-দাগ পর্বতমালা পর্যন্ত সারা পথ অভিযাত্রী দলের সামনে বালি বালিয়াড়ি আর তাকিরের মাঝখানে শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ, প্রাসাদ, ও বাসগৃহের প্রাচীরগুলি — একটা সমগ্র প্রাচীন দেশের ধ্বংসাবশেষ।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মৃত সহর ও গ্রামের রাস্তাঘাটে ঘুরতে লাগলেন, মরুভূমির একমাত্র বাসিন্দা সাপ থেকে সতর্ক থেকে। ধ্বংসাবশেষের ভিতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাটির পাত্রের মাঝখানে পাওয়া গেল পেতলের তৈরী জিনিসের ভাঙ্গা টুকরো, ব্রোঞ্জের আস্ত গয়না বা মালা, পাথরে খোদাই করা সীল অথবা ঘোড়সওয়ার ও অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি। আইজ-কালা দুর্গে, কোন কোন মাটির ঘরে তাঁরা আবিষ্কার করলেন খৃষ্ট জন্মের প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে তৈরী প্রাচীন পথের খিলানগুলিকে, তখনও ওরা অটুট অবস্থায়। এই

অস্বাভাবিক ঘটনার কারণ এই যে পৃথিবীর অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় এখানকার বার্ষিক বারিপাত কম, এমন কি চার ইঞ্চির কম।

সে দিনের কথা অভিযাত্রী দলের বরাবর মনে থাকবে যেদিন অধ্যাপক তলস্তভের সহকারী আ. তেরেনজকিন তেসিক-কালা দুর্গের সামনে অবাক হয়ে দাঁড়ান। এই ধ্বংসাবশেষ সবপ্রথম দেখলেও তাঁর অবধারিত মনে হল তিনি এধরনের জিনিস অন্য কোথাও দেখেছেন। কোথায় দেখেছেন মনে করার জন্য মাথা ঘামাতে লাগলেন। শেষটায় তাঁর মনে পড়ে গেল এমনি জিনিষ দেখেছেন 'আনিকভস্কোয়ে প্লেটে'।

১৯০৯ সালে বিপ্লবের অনেক আগে, উত্তর উরালের মাটি খুঁড়ে একখানা গিল্টি করা রূপোর প্লেট পাওয়া যায়। এর নাম 'আনিকভস্কোয়ে প্লেট'। যে গ্রামের কাছে এটি পাওয়া গিয়েছিল তারই নামে এর নাম। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এটিকে লেনিনগ্রাদের হার্মিটেজ মিউজিয়ামের জন্য নিয়ে এলেন, এখনও সেখানেই আছে।

প্লেটের উপর সুন্দর এক দুর্গের নক্সা আঁকা। শিরস্ত্রাণ পরা সশস্ত্র যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে দুর্গের ছাদের উপর। দাঁতকাটা বুরুজে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দুটো মানুষ ঝুলছে। নীচের দিকে দ্বিতীয় তলার ছাদের উপর শিঙ্গাবাদকরা শিঙ্গা ফুঁকছে। সম্ভবতঃ কোন বীরের দেহভস্ম ভরা কলস গাম্ভীর্যের সঙ্গে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুর্গের সংলগ্ন ছোট ছোট বারান্দা থেকে মেয়েরা দেখছে ঝুঁকে পড়ে। অশ্বারোহী সৈন্যরা দুর্গ ঘিরে আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা একমত হলেন যে এটি ঔশনদ বংশের সময়কার প্রাচীন ইরানীয় পাত্র। প্লেটের নক্সা পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর ইরানীয় স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখলেন, কোন স্মৃতিচিহ্ন না রেখেই এই শিল্পের অবলুপ্তি ঘটে।

এখন হঠাৎ প্রকাশ পেল এ প্লেট ইরান থেকে আসেনি, এসেছে প্রাচীন খরেজ্‌ম্‌ থেকে। প্লেটের উপর আঁকা প্রাসাদের নীচ তলার নক্সা প্রকাশ পেল তেসিক-কালা দুর্গের বাসোপযুক্ত বুরুজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে।

সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকরা উপলব্ধি করলেন পৃথিবীর নিকট অপরিচিত এক প্রাচীন সভ্যতাকে আবিষ্কার করতে চলেছেন তাঁরা। ধ্বংসাবশেষ খুঁড়তে খুঁড়তে সত্যিই তাঁরা আবিষ্কার করলেন ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়কে।

নীল নদের বন্যা সৃষ্টি করেছে প্রাচীন মিশরকে আর আমু'র খেয়ালের ফলে উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন খরেজমের। মিশরের মতো খরেজ্‌মেও নদীমুখস্থিত ব-দ্বীপে উর্বর পলিযুক্ত জমিতে চাষের কাজে খুবই উন্নতি ঘটে। নদীর সঙ্গে সংগ্রাম করে এর আক্রমণ থেকে

বাঁচতে গিয়ে জনগণ সেচ ও চাষের এক জটিল পদ্ধতির উদ্ভব করে। সেই সুদূর অতীতে, এই 'খাভারেজমে' (আলোর রাজ্য) লিখিত হয় অগ্নি-উপাসক মাজদাইদের পবিত্র গ্রন্থ জেন্দ-আভেস্তা। অধ্যাপক তলস্তভ তাঁর লেখায় যুক্তিসহ এর প্রমাণ দিয়েছেন।

কিন্তু খরেজমের সভ্যতা শীর্ষে পৌঁছয় পরে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী ও খৃষ্ট জন্মের পরে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। সে সময় এক বিশেষ ধরনের ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় আমুর ব-দ্বীপে। সে যুগের শত শত দুর্গ, রাজ প্রাসাদ, কেল্লা এবং সুরক্ষিত জমিদারীগুলি আমাদের সময় পর্যন্ত বেঁচে আছে। এ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাত্র বিশটিকে খুঁড়েছেন। কিন্তু তাঁরা খরেজমের লিপি আবিষ্কার করেছেন, তার অক্ষরমালা উদ্ধার করেছেন। এঁরা অসংখ্য মুদ্রা, পোড়া মাটির ক্ষুদ্র মূর্তি, গৃহে ব্যবহৃত অগুনতি জিনিস, যেমন মাটির পাত্র, কাপড়, রঙ্গীন কম্বল, চিত্র করা পরদার টুকরো, চামড়ার জুতো, ব্রোঞ্জের পেরেক এবং গম, জোয়ার, আঙুর ও ফুটির বীজ আবিষ্কার করেছেন। সম্ভবতঃ 'আনিকভস্কোয়ে প্লেটের' উপর আঁকা বারান্দার উপর দাঁড়ানো কোন সুন্দরীর হাতে ছেঁড়া একখানা চেপ্টা রুটিও পাওয়া গেছে তেসিক-কালা দুর্গে। সোভিয়েত সন্ধানীদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে আজ পর্যন্ত অজানা এক প্রাচীন রাষ্ট্রের জীবন উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

খরেজমের তোপরাক-কালা সহরে অবশেষে সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকরা তিনশ ঘর-ওয়ালা একটি প্রাসাদ আবিষ্কার করেছেন। প্রাসাদে আছে খৃষ্ট জন্মের পরে তৃতীয় শতাব্দীর প্রাচীর চিত্র। এগুলি এত বৈশিষ্ট্যময় যে সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন শিল্প ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এর মধ্যে একটি প্যানেল আছে। হাল্কা নীল পটভূমিতে কালো ঢেউ আর তার ভিতর সাঁতার কাটছে সাদা-লাল মাছেরা, প্যানেলের উপরে কালো বা লাল পটভূমিতে আঁকা মানুষ ও প্রাণী মূর্তি এবং আঙুরগুচ্ছ ও পাতা। আর একটি প্যানেলের নীল-ধূসর পটভূমিতে কালো প্লেটের বর্ম এবং ঘোর লাল পটভূমিতে ঘোড়সওয়ারের দল। তিন নম্বর প্যানেলে দেখা যায় নীল পটভূমির উপর পাটল বর্ণের মানুষের মুখ, এটা বাস্তবধর্মী কায়দায় আঁকা। অন্যান্য প্যানেলের কোনটায় ধূসর বর্ণের ফেজাণ্ট ও বাঘ শিকারের, কোনটায় বা ফল পাড়ার সুন্দর দৃশ্য। একটি হলঘর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁড়ে বার করেছেন খরেজম্ রাজাদের প্রতিমূর্তি, এগুলো বিভিন্ন রঙ দেওয়া মাটির তৈরী।

আশ্চর্য এই, ঐ রাজত্বের স্মৃতিচিহ্নের উপর কালের হাত বিশেষ পড়েনি। ১৯৪৮ সালে কাঠ, চামড়া ও কাগজের তৈরী খরেজমের প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অধুনা

পৃথিবীময় যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলেছে তার মধ্যে প্রাচীন খরেজ্‌মের এই খনন কাজ সম্ভবত সব চাইতে চমকপ্রদ।

খরেজ্‌মের প্রত্নতাত্ত্বিকরা কেবল অতীতের দিকেই তাকায় না। সমস্ত সোভিয়েত মানুষের মতো তাঁদেরও অগাধ উৎসাহ বর্তমানকে নিয়ে, ঐ সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকেও তাঁরা চোখ রাখেন। তাই তাঁরা প্রাচীন সেচ খালের তলদেশকে খুঁটিনাটিভাবে অনুসন্ধান করে তার নক্সা ও মানচিত্র বানান যাতে এগুলিকে আবার গড়ে তুলে মরুভূমি অঞ্চলে প্রাণ ফিরিয়ে আনা যায়।

এঁদের পর্যবেক্ষণের ফলে, খুব বেশী দিনের কথা নয়, একটি প্রাচীন খালকে আবার গড়ে তোলা হয়েছে। এর থেকে জল যাচ্ছে প্রাচীন সেচের কির্ক-কিজ জমিতে। ওখানে যৌথখামারীরা গ্রাম তৈরী করেছে, তুলো লাগিয়েছে। চালু হয়েছে একটা নূতন তুলো কারখানা। মরুভূমিতে জীবন এনেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

৩। উরগঞ্চ

১৯৪৮ সালের গ্রীষ্মের একটি দিনে উরগঞ্চে আমার হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। (উরগঞ্চ খরেজ্‌ম অঞ্চলের বর্তমান রাজধানী।) আকাশের পটভূমিতে ছায়ামূর্তির মত দাঁড়ানো গাছগুলিকে এত কালো যে মনে হল ওরা অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। তাদের ভিতর দিয়ে বাড়ির মাটির ছাদগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল কমলা রঙে। নূতন বাড়িগুলি দূরে অন্ধকারে অস্পষ্ট, তাদের জানালাগুলো রক্তের মতো লাল। হঠাৎ মিলিয়ে যাবার আগে সমস্ত দৃশ্যপটটি বিরাট কয়লা স্তূপের মত জ্বলে উঠল। যেখানে মাটি ছিল সেখানে দেখতে পেলাম মার্বেল পাথর আর সোনা, মনে হল আমি এমন একটি আশ্চর্য রাজ্যে ভেসে গিয়েছি যা কেবল রূপকথায় আছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার দূর সীমানায় এক উটবাহী দলের মাথা ভেসে উঠল।

উটের দল যখন হোটেলে পেঁছিল রাত হয়ে গেছে। উটের দু'পাশে সাদা গাঁইট ঝুলছে।

'মা! মা!' কাছ থেকেই একটা বাচ্চার গলা শোনা গেল, 'ঐ যে স্কুলের বই এসে গেছে!'

ও, তাহলে এই ব্যাপার! আমি জনশিক্ষা বিভাগে গতকাল এই উটবাহী দলের কথাই বলতে শুনেছিলাম। জনৈকা শিক্ষিকা উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করছিলেন স্কুল যে খোলা হবে, উটবাহীরা যথাসময়ে এসে পেঁছিবে ত। 'উটের দল স্কুলের বই নিয়ে আসছে?'

পাঠকরা বোধ হয় অবাক বোধ করছেন। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। 'এই যুগে, আজকের দিনে?' হ্যাঁ, আজকের এই টেলিভিশন, জেট বিমান ও পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের যুগে।

মধ্য এশিয়ায় একটি প্রবাদ আছে, 'যদি জুতোর জন্য চলতেই না পারলে পৃথিবী বড় হলেই বা লাভ কী?' মাত্র সেদিন পর্যন্ত খরেজ্মের অবস্থা ছিল এমনি: যানবাহনের ব্যবস্থা শোচনীয়। উরগঞ্চের সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন ছিল চারজো, প্রায় ৩০০ মাইল দূরে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্রুত গড়ে ওঠা এই অঞ্চলের যা প্রয়োজন তার অর্ধেক জিনিসও নাবিকরা 'পাগলা' আমু'র সঙ্গে অবিরাম লড়াই করে নিয়ে যেতে পারত না। এমন কি খরেজ্ম থেকে তুলো পর্যন্ত বিমানে করে নিতে হত। পেট্রোলও পৌঁছে দিতে হত তাই। এর মানে কী দাঁড়ায় তা বোঝার জন্য অর্থনীতিজ্ঞ হবার দরকার নেই। যে বিমান দেড় টন পেট্রোল পৌঁছে দিত তার যাতায়াতে খরচা হত ওর অর্ধেক পরিমাণ।

ঐ পরিমাণ পেট্রোল খরচা হত লরির বেলাতেও, এরা কারা কুমের 'নীল বালু' পেরিয়ে খরেজ্মে পৌঁছত। ড্রাইভাররা নীল চশমা চোখে দিত বলে কারা কুমকে রসিকতা করে নাম দিয়েছিল 'নীল বালু'। পেট্রোল ছাড়াও মরুভূমির ঝলসানো রোদে প্রচুর জলের দরকার হত, বিশেষ করে পিছন দিক থেকে বাতাস বইলে। এ রকম বাতাসে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হয় না, রেডিয়েটর যেমন টগবগ করতে থাকে ড্রাইভাররা অভিশাপ দিতে শুরু করে। প্রচুর জল লাগে রেডিয়েটরে। এ জন্য খরেজ্ম অঞ্চলে কিছুদিন আগে পর্যন্তও লরির চাইতে উটকেই বেশী সুবিধেজনক মনে করা হত, কারণ উটরা জল ছাড়া এক হপ্তা পর্যন্ত চলতে পারে যদিও বইতে লেখে ওরা এমনিভাবে যেতে পারে পনের দিন পর্যন্ত।

উরগঞ্চে প্রায়ই লোকদের বলতে শুনতাম: 'বেতারে খবর পাওয়া গেছে উটের দল রঙ লাগানোর তেল নিয়ে আজ সকালে কশ্‌ক-কুদুক কূপ পেরিয়ে এসেছে...' 'বাড়ি যাবার পথে ডাক্তারখানা থেকে এক বোতল বারজোম নিয়ে যেও, ওষুধ দপ্তরের একটা বিমান এসেছে...' 'বজরায় করে মদ যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছে গৃহপ্রবেশের উৎসব বন্ধ রাখ।'

যারা রেলের পাশে সহরে বাস করে, তাদের কাছে এসব কথা অদ্ভুত শোনায়। প্রতি ঘণ্টায় তাদের স্টেশনে যে মাল এসে পৌঁছচ্ছে তা তারা খেয়ালও করে না, কারণ এটা তাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু খরেজ্মে মাত্র কিছুদিন আগেও যানবাহন সমস্যা ছিল কঠিন — গুরুতর রকমের কঠিন!

এটা জানা থাকলে বিশেষ একটা ভাব নিয়ে উরগঞ্চকে দেখতে হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সমাজতন্ত্রী উজবেকিস্তানের অন্যান্য জায়গার তুলনায় উরগঞ্চ পিছিয়ে আছে।

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে ছ'টা বড় তুলো-কারখানার জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি উট আর বজরা করে খরেজ্মে আনতে হয়েছে। ছাদের জন্য লোহার পাত এসেছে বিমানে। তারা কতটুকু করতে পেরেছে না দেখে, কতখানি করে ফেলেছে তা দেখে সত্যি অবাক হতে হয়।

বাড়ির জানালায় কাচ লাগান হয়েছে। কিছুদিন আগেও এ জিনিস সেখানে ছিল না। শাভাত জলবিদ্যুৎ স্টেশন নির্মাণ করে সহরে ইলেক্ট্রিক আলো জুগিয়েছে। জলের পাইপ বসিয়েছে, সহরের রাস্তা বাঁধিয়েছে, তার পাশে গাছের সার করেছে। লম্বা লম্বা গাছ দিয়ে পার্ক বানিয়েছে, গড়ে তুলেছে বহু আধুনিক কারখানা ও বসবাসের বাড়ি, হাসপাতাল আর স্কুল। মাত্র কিছুদিন আগেও বইয়ের দোকানের জানালায় ছায়া পড়ত উটের (বই বোঝাই গাঁইটগুলো ওদের পিঠ থেকে নাবাবার সময় ওরা গোল লালচে ধূসর কান দুটোকে মুড়ে রাখত), আজও সহরের ভিতর দিয়ে যাওয়া শাভাত খালে মোটর বোটের সঙ্গে দেখা যাবে সেকেলে কায়ুক, এদের পাল কালো রঙের, সামনে একখানা ছোট আয়না বসানো। (কায়ুকের খোলে যৌথখামারীরা তরিতরকারী নিয়ে বাজারে যায়।) উরগঞ্চের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মীরা এখনো তাদের বাপ ঠাকুর্দার তৈরী বাড়িতে বাস করে। এক কথায় উরগঞ্চ হল বৈসাদৃশ্যের সহর। দিন দিন তবু নতুনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে — এই হল সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, যা প্রতিটি সোভিয়েত নরনারীর প্রিয় ও পরিচিত।

উরগঞ্চ শিক্ষকদের ইনস্টিটিউটে যাওয়া যাক। এই দোতলা ভবনের বারান্দায় বসে একদল উজবেক তরুণ তরুণী সোভিয়েত কৃত্রিম স্পুৎনিক আর সাইবেরিয়ায় নূতন খনি ও কলকারখানার নির্মাণ কার্য নিয়ে জোর আলোচনা চালাচ্ছে কিংবা বলাবলি করছে কি ভাবে তাদেরই এক সহপাঠি গত রাতে শর্ট ওয়েভে কুমেরুতে সোভিয়েত তিমিধরা নৌবহর 'স্লাভা'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এক কথায় এরা পৃথিবীর সব রকম ব্যাপারেই উৎসাহী। প্রজাতন্ত্রে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা হচ্ছে। দশ বাৎসরিক স্কুলও বছর বছর বেড়ে চলেছে। এর থেকেই অনুমান করা যায় শিক্ষকের কত দরকার এবং এ জন্যই উজবেকিস্তানের প্রতিটি আঞ্চলিক রাজধানীতে একটি করে শিক্ষক কলেজ আছে। উরগঞ্চ শিক্ষক ইনস্টিটিউট এদের অন্যতম।

এর পর দেখা যাক উরগঞ্চ আঞ্চলিক হাসপাতালটিকে। এখানে সবকিছুই চকচকে পরিষ্কার। অস্ত্র চিকিৎসার ঘরে বাতির আলো এসে পড়ছে কাচের টেবিলে সুন্দর করে সাজানো বিশুদ্ধ পাত্রে আর অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির উপর। ঘর এত উজ্জ্বল যে ডাক্তারদের সাদা এ্যাপ্রন আর বায়ু চলাচলের ছিদ্র-ঢাকা গজও চকচক করছে।

সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্রুত মধ্য এশিয়ার লোকদের প্রিয়ই হয়ে ওঠে। সোভিয়েত শাসনের প্রথম দিকে ডাক্তারদের মাধ্যমে প্রায়ই সুদূরবর্তী কিশলাকে সমাজতান্ত্রিক ভাব ধারণা প্রচারিত হয়। সে সময় ডাক্তারের অভাব ছিল, গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা ছিল নগণ্য। উজবেকিস্তানে ঘুরে বেড়াতে হত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যরক্ষী দলগুলিকে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দিত। চক্ষু বিশেষজ্ঞেরা জটিল অস্ত্রোপচার করে হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। এদের ছানি, ট্রকোমা, গ্লকোমা ও অন্যান্য বহু ধরনের চোখের রোগ ছিল। অন্ধ মানুষ দৃষ্টি ফিরে পেলে যে ডাক্তার তাকে ভাল করেছে তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। সে সময় ডাক্তারদের বিশেষ করে সার্জনদের মনে করা হত যাদুকর।

ক্রমশ চিকিৎসা বিজ্ঞান উজবেক জনগণের নিত্য জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াল। মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, তাসখন্দ ও সমরকন্দে মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট পাশ করা হাজার হাজার উজবেক ডাক্তার সহর ও গ্রাম্যাঞ্চলের হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ছড়িয়ে পড়ল। এর সবগুলিই বিনামূল্যে' চিকিৎসালয়। এরা কলেরা ও বসন্ত মহামারিকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করেছে। বিপ্লবের আগে উজবেকিস্তানে এদের ছিল প্রচণ্ড প্রকোপ। প্রজাতন্ত্রে যক্ষ্মা রোগকে এরা অর্ধেক সারিয়ে ফেলেছে। ম্যালেরিয়া বা বৃত্তিগত ব্যাধিকেও বহু পরিমাণে কমিয়ে এনেছে এবং মধ্য এশিয়ার বিশেষ সব ব্যাধি পাপ্পাটাচি, লেইসমানিয়াসিস, ব্রুসেল্লসিস ও ড্রেকুনকুলোসিসের চিকিৎসা করতে শিখেছে।

আজ উজবেকিস্তানে ১৮৬ জন লোক পিছু হাসপাতালে একটি বিছানা। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন উজবেকিস্তানে হাসপাতালের জন্য কারও পয়সা লাগে না। সোভিয়েত ডাক্তার পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধুনাতম অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত, যে কোন বড়ো সহরে এরা নিজেদের শিক্ষা উন্নত করার জন্য বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত পাঠ নেয়। এ ছাড়া, প্রতি হাসপাতালে ডাক্তারদের বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বসে, সেখানে তারা অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত খরেজ্‌ম মরূদ্যানের এক বৈশিষ্ট্য ছিল পত্র মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য, এর কারণ মরূদ্যান রেল থেকে বহু দূরে। এই ছাত্ররা হল কারখানা ও অফিসকর্মী এবং যৌথখামারী। এরা দূরের বিভিন্ন টেকনিক্যাল কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পত্র মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করত। আজও বিমানে করে উরগঞ্চ থেকে আসার পথে প্রায়ই সাক্ষাৎ মিলবে এ ধরনের দু'একজন ছাত্রের যারা চলেছে তাসখন্দ বা মস্কোতে তাদের শেষ পরীক্ষা দিতে। বর্তমানে লোকেরা এমন এক বিষয় নিয়ে পত্রযোগে

অধ্যয়ন করছে যার সঙ্গে খরেজ্‌মের কদাচিৎ কোন সম্পর্ক ছিল। এটা হল রেল যানবাহন সংক্রান্ত স্কুল ও ইন্‌স্টিটিউট।

১৯৪৭ সালের শীতকালের শেষে এই উদ্দীপনাময় সংবাদ সমস্ত খরেজ্‌মে ছড়িয়ে পড়ল যে ওখানে রেলপথ তৈরী হবে। এটি যাবে সমগ্র খরেজ্‌মের ভিতর দিয়ে এবং যুক্ত হবে আশ্‌হাবাদ রেলের সঙ্গে (চারজোতে), পরে সব চাইতে সংক্ষিপ্ত রাস্তায় (আলেক্সান্দ্রভ-গাই ও সারাতভ হয়ে) সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সঙ্গে মিলবে।

সেই স্মরণীয় বসন্তের দিনগুলিতে অনুসন্ধানীরা যখন কোথায় রেল লাইন বসবে তার খোঁজে বেরোল, বিমান যখন তাদের থাম, খুঁটি ও যন্ত্রপাতি জুগিয়ে দিতে লাগল, খরেজ্‌মের প্রতিটি যৌথখামার তখন তাদের পরিকল্পিত অংশের চাইতেও বেশী করে ফসল বুনতে লাগল ভবিষ্যৎ রেলনির্মাতাদের উপহার হিসেবে।

গ্রীষ্মের শেষ দিকে ৬০ হাজারেরও বেশী উজবেক, তুর্কমেন ও কারা-কল্পক কাজে লাগল। এক মাসে তারা রেলের দক্ষিণ অংশের ৩৮৫ মাইল লম্বা রাস্তা তৈরী করে ফেলল, দেশ জুড়ে এদের নাম ছড়িয়ে পড়ল। এই পথ চারজো থেকে কুন্‌গ্রাত পর্যন্ত বিস্তৃত।

তাসখন্দ, আশ্‌হাবাদ ও অন্যান্য সহরের লোকেরা বহু ভাবে নির্মাতাদের সাহায্য করল। তারা বিমানে করে নির্মাণ ক্ষেত্রের কেবলমাত্র উজবেক অঞ্চলেই সাজসরঞ্জামসুদ্ধ ৪০টি অবসর বিনোদন কেন্দ্র, ২৩টি বেতার কেন্দ্র, ৫টি দাঁত চিকিৎসার ঘর, ২০টি হাসপাতাল, সবাক চিত্রের বহু প্রজেক্টর, ডাক ও তার অফিস এবং দোকান পাঠাল। গাইয়ে বাজিয়ের দল আর সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও ছাপা বিভাগের লোকও পাঠিয়ে দিল।

রেল রাস্তা তৈরী হবার পর কর্মীরা আবার ফিরে গেল তাদের তুলোর ক্ষেতে, লেদ যন্ত্রে বা অফিসে। তখন চারজোর প্রান্তে প্রথম লাইনপাতা গাড়ি কাজ চালাতে লাগল। তৈরী হতে লাগল পুল আর স্টেশন, বসতে লাগল যাবতীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি।

খরেজ্‌মের বালু পেরিয়ে রেলের লোকেরা ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ডিজেল-চালিত রেলগাড়ির তীক্ষ্ম হুইসিল বেজে উঠল উরগঞ্চ স্টেশনে। সবাই জানল রেল পেঁাছে গেছে খরেজ্‌মে। সেখান থেকে লাইনপাতা গাড়ি এগিয়ে চলল বাড়ি, ফলের বাগান ও মাঠের ভিতর দিয়ে তাহিয়া-তাসে। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চেয়ে নূতন

সহর। পরে রেল লাইন মরুভূমির বিশাল অধিত্যকা উস্ত-উর্ত পেরুবে, কাজাখ স্তেপ পার হয়ে আলেক্সান্দ্রভ-গাইয়ে পৌঁছবে।

এটা হলে খরেজ্ম আর দূরবর্তী অঞ্চল থাকবে না, হবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক মধ্য এশিয়ার প্রবেশ দ্বার। কারা কুম রেলওয়ে তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিয়ার বহু সহর থেকে মস্কোর দূরত্বকে ৭৫০ মাইল কমিয়ে দেবে।

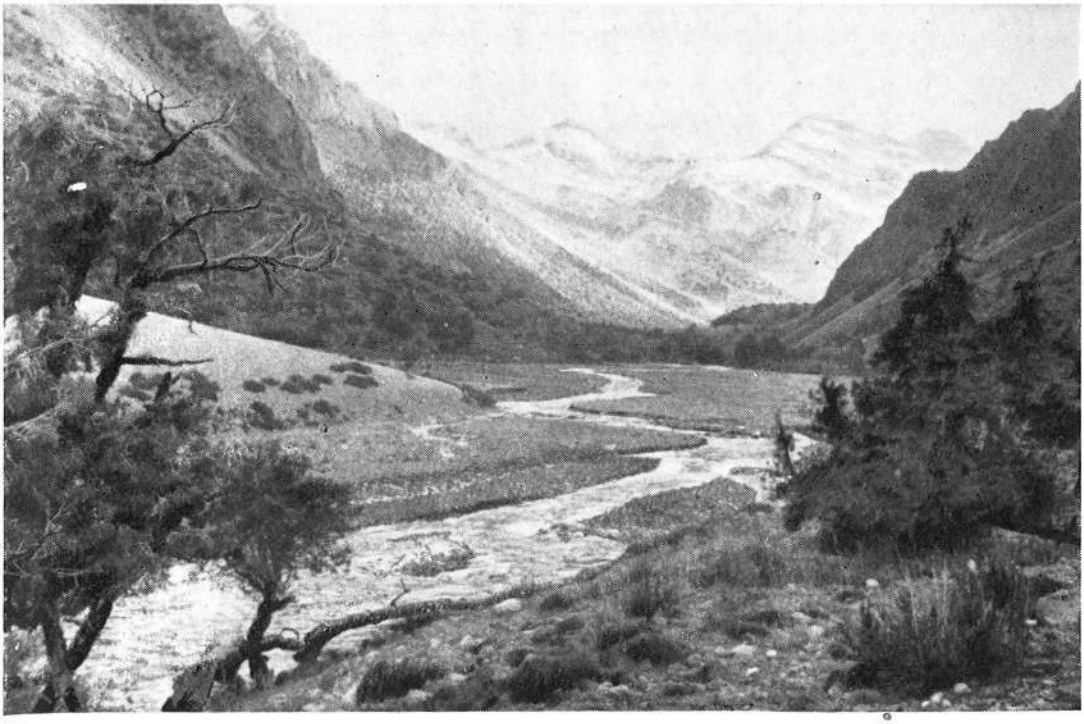
আজ থেকে কয়েক বছরের মধ্যে কেউ যদি নূতন রেলে চড়ে খরেজ্মে যায় তা হলে সে যেন একবার উরগঞ্চে নাবে, স্টেশনের হৈ চৈ মাল ঘর আর জলখাবার ঘর পার হয়ে পা দেয় একবার রাস্তায়। কী সহরে বা সহরের বাইরে এখনকার চাইতে অনেক বেশী পষ্ট হয়ে সর্বত্রই নজরে পড়বে জীবন সময়কে কী করে ধরে ফেলছে, কি ভাবে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে মিলিয়ে যাচ্ছে খরেজ্মের বৈসাদৃশ্য।

৪। লোক শিল্পী ও কারিগরদের সহর

প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য সহরের মত উরগঞ্চের আঞ্চলিক থিয়েটারে দেখা যাবে রুশ ক্লাসিক বা সমসাময়িক বিষয়বস্তুর উপর লেখা উজবেক নাটক। কিন্তু এখানকার নাটক বা সঙ্গীতানুষ্ঠানে এমন জিনিসও দেখা যাবে যা অন্য কোথাও নেই। এ হল খরেজ্মের সজীব লোক নৃত্য। উজবেক মরূদ্যানের অন্যান্য অধিবাসীদের মত লীলায়িত নৃত্য ভঙ্গী নয়। খরেজ্মের তামবুর ও চাঙ বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে খরেজ্মের সঙ্গীতও শোনা যাবে। অভিনেতা ও দর্শক উভয়ের পোষাকেই খরেজ্মের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য।

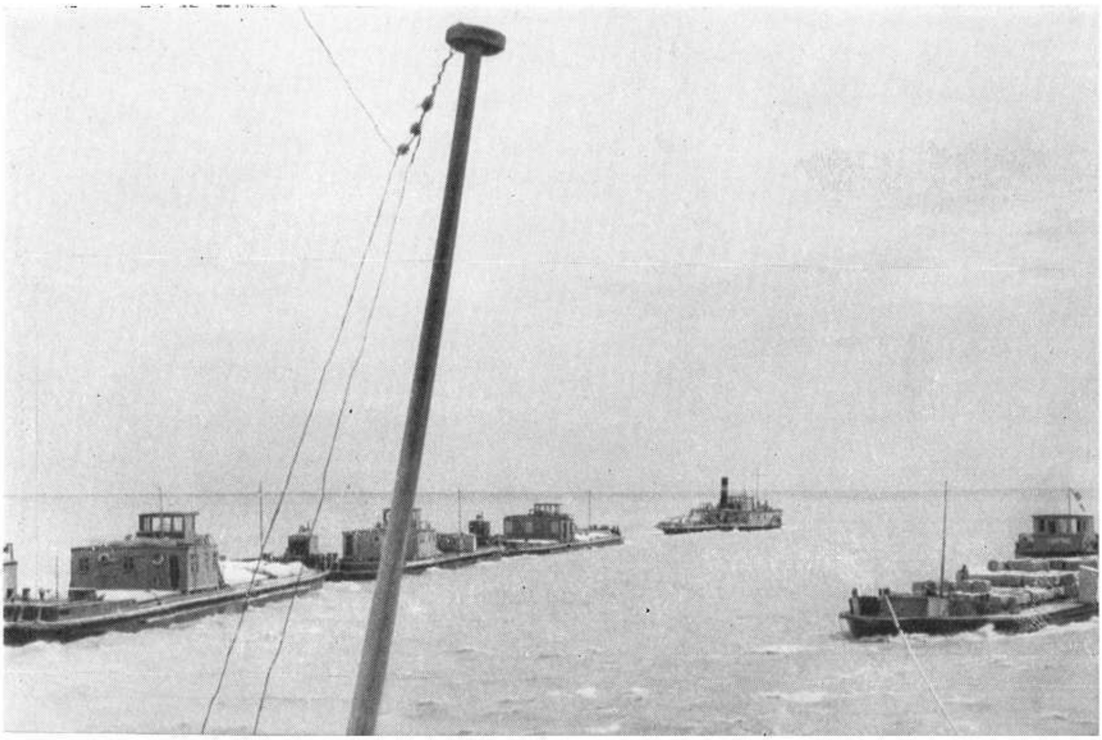
যে সব মেয়েরা অভিনয় দেখে তাদের অনেকের মাথাতেই মনোরম তুবেতেইকা। এগুলো তৈরী বিভিন্ন রঙের গুটি ও গাঢ় লাল মদের (ক্ল্যারেট) মতো রঙের ভেলভেটের উপর সিল্কের সুতো দিয়ে। থিয়েটারে জেলা থেকে আসা অনেক যৌথখামারীর গায়ে গাঢ় লাল আলখাল্লা! এই পোষাক, উরগঞ্চ থিয়েটারে এবং অন্যান্য নূতন পৌর বাড়িতে প্ল্যাস্টারের কাজ, বৈশিষ্ট্যময় স্থানীয় কম্বল, কুমগান, বাসনপত্তর এবং অন্যান্য হাতের কাজ — যা প্রায় প্রত্যেক উরগঞ্চের বাড়িতে দেখা যায় — এ সবই তৈরী খিবার শিল্পীদের। এটি খরেজমের সব চাইতে বড় সহরের মধ্যে দ্বিতীয় এবং আগেকার খানদের রাজধানী।

খিবা থেকে উরগঞ্চ ২০ মাইল। দুই সহরের মাঝখানে একটি বাস লাইন আছে। খিবাতে একটা নূতন চাখানার সামনে বাস থামে। চাখানাটি সহরের ফটকের মুখে।



হিসার পর্বতমালার একটি দৃশ্য।

আরাল সাগরে বজরার দল।

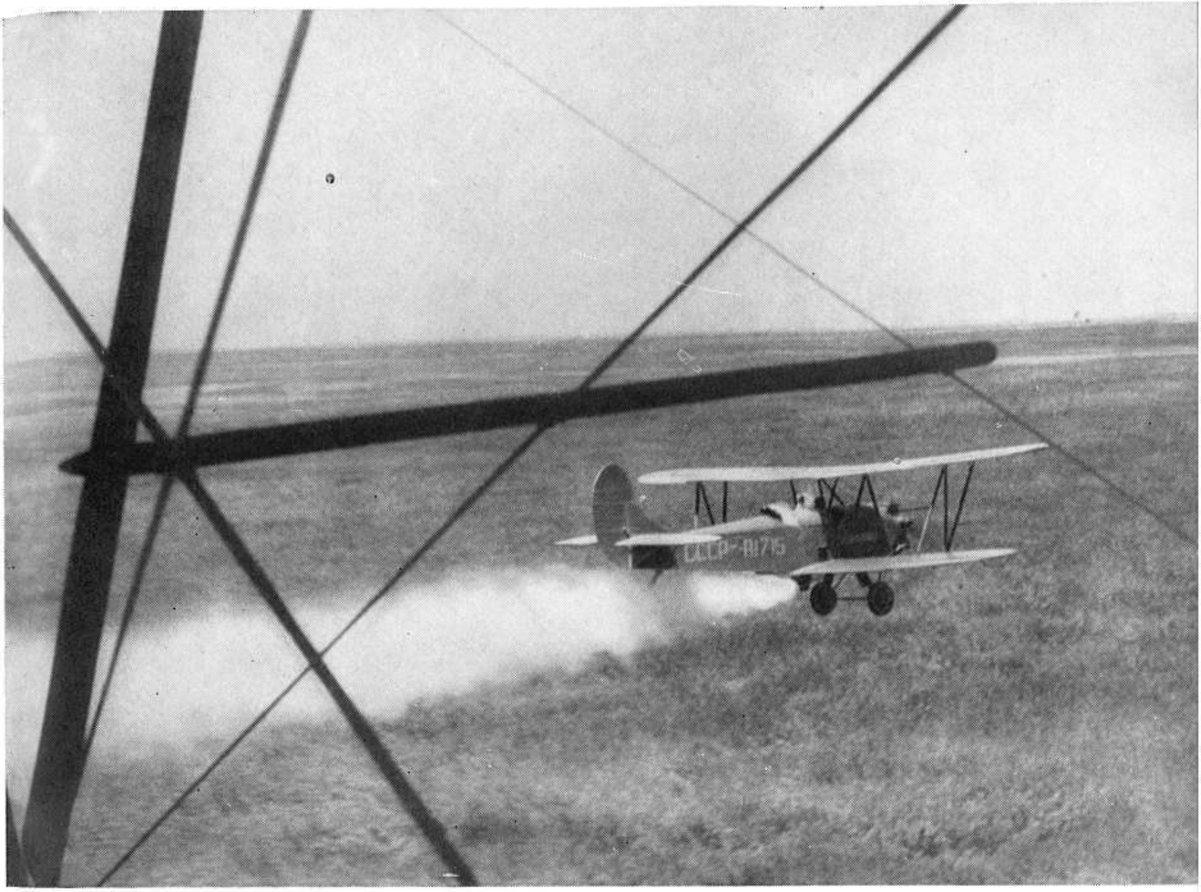




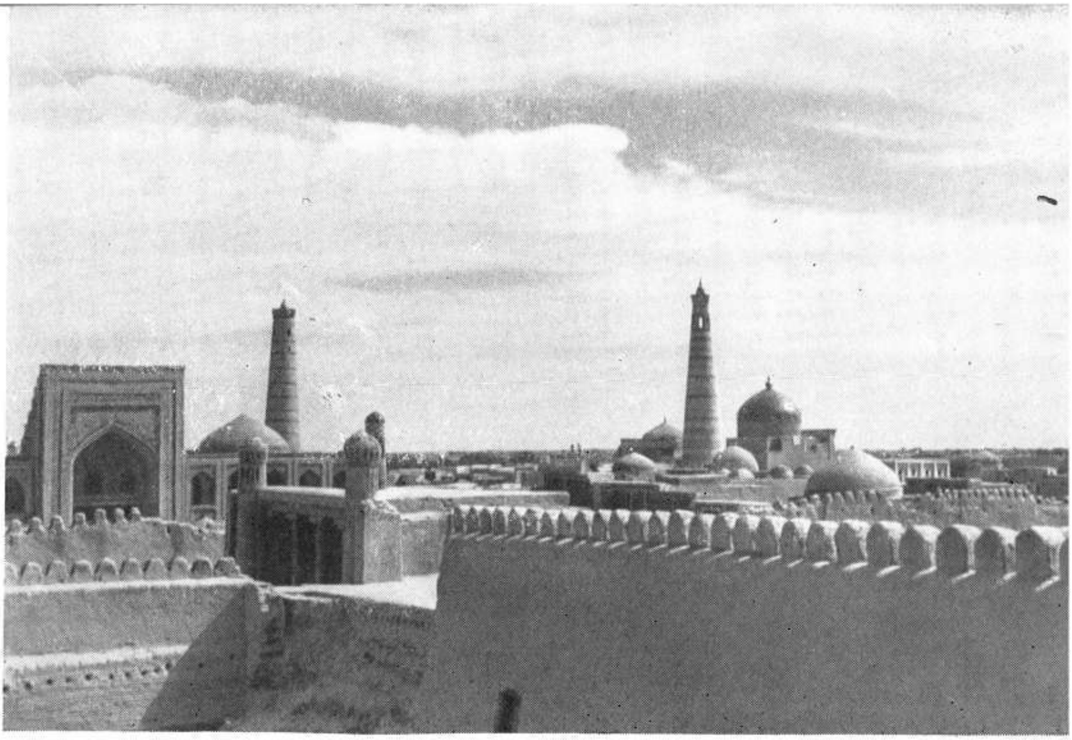
একটি যৌথখামারের বেতার কেন্দ্র।

'লাল উজবেকিস্তান' তুলো উৎপাদনকারী যৌথখামারের কিন্ডারগার্টেনে প্রাতরাশের সময়।





কারা-কল্পকীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র। আমু দরিয়ার
ব-দ্বীপে নলখাগড়ার উপর বিমান থেকে ম্যালেরিয়া
নিবারক ঔষধ বর্ষণ।



খিবা সহর।

আমু দরিয়া হয়ে তুলো চালান।



চাখানার সামনেই সহরের ধূসর মাটির দেয়াল এত চওড়া যে তার উপর দিয়ে আরাবা চলে যেতে পারে এবং এরই দু'পাশে ঐ মাটিরই তৈরী বড় বুরুজ। ফটকের উপর খোদাই করা কাঠের তৈরী পাতা ভারি কালো ধাতুর প্লেট দিয়ে আঁটা। দেয়ালের পিছনে খিবার প্রাচীন দুর্গ। তার নাম ইচানকালা। তাতে খরেজ্‌ম্‌ লোক শিল্প ও স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন।

ইচানকালায় দাঁড়িয়ে আছে অসমাপ্ত কালতা-মিনার। অত্যন্ত চওড়া ও মনোরম, ঘন সবুজ ও নীল টাইলের বেড় দিয়ে ঘেরা। রোদে এটা ঝিকমিক করে, মাথা তুলেছে ধূসর বাড়িগুলির উপর রূপকথার প্রকান্ড এক চোঙ্গার মত। সারা ইচানকালার উপর দিয়ে কালতা-মিনার ও অন্যান্য ছোটখাট চূড়া ছাড়িয়ে, মসজিদ ও সমাধিমন্দিরের নীল গম্বুজ, প্রাসাদের ছাদ আর বাজারের থামের উপর দিয়ে, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কবরখানা পেরিয়ে, রাস্তা ও কানা গলির জটিল জটলার উপর দিয়ে বাজ উড়ে চলে অশ্রান্ত। কয়েকটি গলি এত ছোট যে দুটো গাধাও পাশাপাশি যেতে পারে না।

সম্ভবত প্রাচ্য জগতের অন্য কোনও সহর ইচানকালার মতো মধ্যযুগীয় চেহারা এতটা ধরে রাখেনি। কারণটা এই—বিপ্লবের ঠিক পরে ইচানকালার সৌধগুলির প্রায় অর্ধেককে যাদুঘরের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। খরেজ্‌ম্‌ মরূদ্যান বহুদূর বিস্তৃত মরুভূমির দ্বারা দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং রেলওয়ে থেকে দূরে বলে উজবেকিস্তানের অন্যান্য মরূদ্যানের চাইতে এর উন্নতি ঘটে ধীরে ধীরে। তা ছাড়া, সবকিছু ছেয়ে, সবকিছুকে জয় করার বাসনা নিয়ে যখন নূতন জীবন উৎসারিত হল খিবায় তার প্রথম কাজ হল সহরের বাইরেকার দেয়াল ধূলিসাৎ করে সেখানে নূতন রাস্তা নির্মাণ। ইচানকালার চারদিকে বড়ো মহল্লায় খিবার লোকরা গড়ে তুলল তেলের আর তুলোর কল, কারিগরি বিদ্যালয়, ক্লিনিক, স্ট্যাডিয়াম, ক্লাব, স্কুল এবং খিবার বিখ্যাত হস্তশিল্প সমবায়ের জন্য নূতন বাড়ি।

রুশ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে যেমন পালেখ, উজবেকিস্তানের তেমনি সব চাইতে বড় হস্তশিল্প কেন্দ্র হয়ে উঠল খিবা। এ জন্য চতুর্থ পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় উজবেকীয় প্রজাতন্ত্র খিবার লোক শিল্পীদের কাজের উপর খুব বেশী নজর দিল যাতে সহরের শিল্প ও হাতের কাজের উন্নতি ঘটে। 'উমিদ', 'গুলিস্তান', 'উচকুন' ও অন্যান্য সমবায়ে খুব ওস্তাদ কাঠ ও পাথর খোদাইকারী, গান্‌চ-খোদক ও মডেলশিল্পী, অলঙ্কার নির্মাতা, অঙ্কন শিল্পী, কম্বল কারিগর, সিল্ক ও ভেলভেটের সূচীশিল্পী এবং সুচারু ধাতু ও মৃৎশিল্পীরা কাজ করে থাকে।

খরেজ্‌ম্‌ অলংকারের ওস্তাদ রুজমত মাশারিপভ বা দক্ষ তুর্কমেন কম্বল কারিগর বিবিজান জুমাবায়েভা। ইনি কাছের তাশাউজ থেকে খিবায় এসে বহু উজবেক নারীকে কম্বল শিল্প শিক্ষা দিয়েছেন, এবং গান্‌চ্‌-খোদক নুর্‌মেতভ উস্তা বা এ ধরনের কারও সঙ্গে ইচানকালায় ঘুরলে খিবার দুর্গের সত্যিকারের পরিচয়, অর্থাৎ এর শিল্প বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে। দেখতে পাওয়া যাবে খিবার রাজপ্রাসাদ, মসজিদ ও সমাধিমন্দিরে রঙীন টাইলের কাজ, যার রঙ এখনো অটুট। এ ছাড়া দেখা যাবে জালির জটিল কারুকাজ করা কাঠের থাম ও দরজা এবং নক্সা-কাটা ঝাঁঝরি ও সুনিপুণভাবে ছবি-আঁকা বাড়ির ছাদ। এ সবকিছুই হাজার হাজার বছরের আগেকার শিল্পকাজের অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু কারা এই সৌধ তুলেছে এবং একে এমন করে সাজিয়েছে একথা জিজ্ঞেস করলে, গাইডও হয়ত খুব বেশী হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর উস্তা আবদুল্লার নাম করবে। অসাধারণ শিল্প প্রতিভার জন্য এ'র ডাক নাম হয়েছিল জিন্না। অন্যান্য শিল্পীদের নাম কারও মনে নেই, এমন কি তাদের জীবিতকালেও এদের নাম অনেকে জানত না।

খিবার এক মহল্লার নাম গাদাইলার। বিপ্লবের আগে এখানে থাকত ভিখিরির দল। এরা পয়সাওয়ালা ভিখিরি—ভিক্ষা করে টাকা বানাত। প্রাক-বিপ্লব খিবাতে এদের মধ্যে সবচাইতে ধনী লোকটির খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মের দিক থেকে শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র মনে করা হত। শ্রমকে কেউ সম্মান দিত না। আজ সহরের অন্যান্য জায়গায় যেমন, গাদাইলারেও মেহনতী জনতা বাস করে। খিবার কারিগররা খিবা ও উরগঞ্চের শ্রমিক ও ডাক্তার, শিক্ষক ও ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বাড়ি বানায়, সুন্দর ওঙ-আইভান — বিশেষ বারান্দা তৈরী করে — যার ছাদ এমন যে গুমট্‌ গরমের দিনে স্নিগ্ধ বাতাস ধরা পড়ে স্রোতের মত নীচে নেবে আসে। খিবার কাঠ খোদাইকারীরা ওঙ-আইভানকে সাজায় কাঠের থাম দিয়ে, নীচটা বলাকৃতি, উঁচুতে ফেসটুন সদৃশ বড় বড় মূর্তি আর ওপরে গোলাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের জোড়।

খিবার মালিকরা এখন মেহনতী মানুষ। সহরের সব চেয়ে নামী ব্যক্তি যারা, তারা হল লোক শিল্পী। খিবার হস্তশিল্পীদের নাম সারা খরেজ্‌ম মরূদ্যানে পরিচিত। বিখ্যাত শিল্পী তাসখন্দ অপেরা ভবনে জালির কাজ-করা দরজা বানান। এ'র নাম আতা পালভানভ। সূক্ষ্ম অলংকরণে বিশেষজ্ঞ আবদুল্লা বালতাইয়েভ অপেরা ভবনের হলঘরকে চিত্রিত করেন। ঐ হলে একটি অত্যাশ্চর্য পাথরে ভাস্কর্যের কাজ করেন সুদক্ষ পাথর-খোদক খুদাইবারগেনভ। এ'দের প্রত্যেকের নাম প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র পরিচিত।

৫। আমু'র দমন

কল্পনা করা যাক এক পাশে ঝোলা-কুঁজ আর জটা-চুল একটা উট। দুটো পুরোনো তুবেতেইকা দিয়ে চোখ দুটো আটকানো, তুবেতেইকার উপর মাথায় একটা ছেঁড়া কাপড় জড়ানো যাতে কিছুই না দেখতে পায়। ঝোলা ঠোঁট আর হাড়-সর্বস্ব পা নিয়ে সমান্তরালভাবে আটকানো একটা বড় কাঠের চাকাকে ঘুরিয়ে উটটা চক্কর দিচ্ছে। মাঝে মাঝে উট চালক ক্লান্ত পশুটাকে তাগিদ দেওয়ার জন্য চাবুক হাঁকাচ্ছে। কাঠের চাকার এই সেকেলে পদ্ধতিতে খাল থেকে জল তোলা হচ্ছে, জল এসে জমছে একটা লম্বা পাত্রে। কাদাভর্তি জল লম্বা পাত্র থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে একটা আরিকের ভিতর, সেখান থেকে কাছাকাছি মাঠের মধ্যে। এই হল মধ্য এশিয়ার চিগিরের কাজ।

আজ খরেজ্‌ম্ মরূদ্যানে কদাচিৎ এ ধরনের জিনিস নজরে পড়বে। এখন এর বদলে বসেছে তাসখন্দে তৈরী মধ্য এশিয়া সেচ গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটের কর্মীদের নক্সা করা সমান্তরাল পাম্প-যন্ত্র। কিন্তু মাত্র পনের বিশ বছর আগেও এখানে ছিল চল্লিশ হাজার চিগির। শোনা যেত এর দীর্ঘস্থায়ী বিষণ্ণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, অনেকটা খরেজ্‌মের নিজস্ব আওয়াজের মতো।

খরেজ্‌মের লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে 'পাগলা' আমু'র সঙ্গে যা দিয়ে কঠোর সংগ্রাম করেছে সেই সব অস্ত্রের একটি হল এই চিগির। শুকনোর সময়ে খরেজ্‌ম্ মরূদ্যানের চাইতে আমু নীচে নেবে যেত, মরূদ্যানকে মনে হত মালভূমির মতো। নীচ থেকে তখন জল তুলে মাঠে দিতে হত। অন্য সময় নদীর প্লাবন কিংবা শীতকালে নদীর গতি যখন রুদ্ধ তখন খরেজ্‌ম্ মরূদ্যান মধ্য এশিয়ার এই প্রচণ্ড নদীর অনেক নীচে পড়ে থাকে, মনে হয় গর্তের মধ্যে। আমু হয়ত সমগ্র খরেজ্‌ম্‌কেই বহু দিন আগে ভাসিয়ে নিত, কিন্তু আগেকার দিনের লোকেরা প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়ে একে আটকে ফেলেছিল। এর চারপাশের সব প্রধান খাল বরাবর গড়েছিল মাটির বাঁধ। সব সুদ্ধ ঐ প্রাচীর এবং বাঁধ ২৫০ মাইলের চাইতেও লম্বা।

সেই আগের দিনের মতো, পাহারাওয়ালারা এই বিরাট 'দুর্গের' প্রাচীরের উপর পায়চারি করত, তীক্ষ্ণ নজর রাখত নদীর বেখাপ্পা ভাবগতির দিকে। এ ছাড়া বাঁধের মধ্যে গর্ত খোঁড়া সুসলিক ও অন্যান্য জন্তুকে মারবার জন্য এর গাছপালার মধ্যে বিষ ছড়িয়ে দিত। বাঁধে চির ধরবার বিপদ দেখা দিয়েছে, বিপদের সঙ্কেত দিলেই হাজার হাজার লোক—কৃষিবিদ ও যৌথখামারী—তাদের কাজকর্ম ফেলে নলখাগড়ার তৈরী মাদুর,

কেতমেন আর কোদাল নিয়ে নদীর কাছে ছুটে আসত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরা আমুকে রুখতে সমর্থ হয়।

কখনও কখনও, অবশ্য, এর পাগলা জল মরূদ্যানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বহু বছর আগে আমু কি ভাবে গুরলেন জেলাকে আক্রমণ করেছিল একথা খরেজ্মের সকলকারই মনে আছে। সবাইকে একজোট করা হয় নদীর সঙ্গে লড়াই করতে। উদ্দাম জলরাশির মধ্যে কাজ করে লোকেরা (অগুনতি তাদের সংখ্যা) শেষ পর্যন্ত নদীর ভাঙন রোধ করে বাঁধ ঠিক করে ফেলল।

এমন কি বান ডাকার সাধারণ দিনগুলিতে যখন হঠাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না, যখন বাঁধে বসানো কাঠের চোঙ্গার ভিতর দিয়ে খরেজ্মের খাল থেকে স্বচ্ছন্দে আরিকে জল ঢোকে (মাঠের সেচ কাজ হয়ে গেলে চোঙ্গার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়), সেই স্বাভাবিক অবস্থাতেও স্থানীয় লোকেরা আমু'র সঙ্গে কঠিন লড়াই চালিয়ে যায়।

কবরখানাগুলোর দিকে লক্ষ্য করা যাক। চওড়া করে বানানো কবরের উপর বড় বড় পাথরের চাপ কেন? দেখে অবাক হতে হয় এত উঁচু করেই বা ওগুলো গাঁথা কেন? এর কারণ খরেজ্মে মৃত দেহকে মাটির ভিতর কবর দেওয়া হয় না, ওদের কবর পাথরের ভিত্তির উপর। এর কারণও ঐ আমু। আমু'র জলের লেভেল যখন বাড়ে তখন মরূদ্যানের ভূজলও বেড়ে যায়। যারা মৃত দেহকে কবর দিতে চায় তারাও বাধ্য হয় ওকে জলের ভিতর নাবিয়ে দিতে।

প্রশ্নটা কেবল কবর নিয়ে হলে তত খারাপ ছিল না। আরও ভয়ের কথা এই যে ভূজল উপরকার জমিতে লবণ নিয়ে আসে, ফলে, জমিতে অনবরত ক্ষার জমা হয়। আগেকার দিনে এ বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য খরেজ্মের লোকেরা এই ক্ষার যুক্ত উপরকার মাটি তুলে স্তূপ করে ফেলত। বৃষ্টি একটু একটু করে এই স্তূপের মাটি ধুইয়ে নিয়ে যেত। তারপর গোবর মেশানো বালি ছড়িয়ে দিত জমির উপর। এই মাটি তারা তুলে নেওয়া উপরকার মাটির স্তরের জায়গায় বিছিয়ে দিত। এভাবে প্রতি দু'তিন বছর অন্তর তাদের মাঠের সমস্ত জমিকেই তারা বদলে ফেলত।

আজকের খরেজ্মবাসীরা হেসে সেই দানবীয় শ্রমের কথা স্মরণ করে। তাদের মনে হয় ওটা কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। আজকাল জলনির্গম প্রণালী ও জমি উদ্ধারের অন্যান্য আধুনিক প্রথায় ঐ জমি ধুয়ে যায়। এ জন্য স্বভাবতই তাদের শ্রমসাধ্য কাজ করতে হয় অবশ্য আগেকার মত নয়।

তবু বছরের পর বছর বিখ্যাত কাজু বা 'পালিয়ে-যাওয়া নদীর খোঁজ করার জন্য'

কিছুদিন আগে পর্যন্তও এখানকার লোকদের যে কঠোর পরিশ্রম করতে হত তার তুলনায় এই নালি কাটা বা কর্ষিত জমির স্তরের পরিবর্তনের জন্য আগেকার পদ্ধতির কোনই তুলনা চলে না। তখন জারচি বা বিশেষ ঘোষকরা কাজুর কথা জানালে সঙ্গে সঙ্গে মরূদ্যানের সমস্ত পুরুষেরা কেতমেন নিয়ে বিচিত্র রঙের বাহিনীতে তাদের প্রধান খালগুলোর মুখের দিকে ছুটে যেত।

অতীত কাল থেকে খরেজ্‌মের প্রতিটি খালের—যেমন হাজাভাত, পাল্‌ভান, শাভাতের অনেকগুলি করে মুখ ছিল। এর কারণ আমু'র ক্রমাগত দিক পরিবর্তন, কখনও আমু আসত খরেজ্‌মের কাছে, কখনও যেত দূরে সরে। পলাতক উটের মত সরে-যাওয়া নদীর চিহ্নকে খুঁজে বার করা যায় কিন্তু নদীকে ফিরিয়ে আনা চলে না। এ জন্য 'পাগলা' আমু'কে ধরবার জন্য খরেজ্‌মের লোকদের কৌশল করতে হত আর এই কৌশল হল প্রতিটি খালের অনেকগুলি করে মুখ বানানো। তারা সহজ হিসাব করত যে, নদী যদি বা এক জায়গা থেকে সরে যায় আর এক জায়গায় হয়ত এগিয়ে আসবে, তাদের কাছে ধরা দেবে। খালের মুখের কাছে মাটির বাঁধের উপর অসংখ্য কেতমেন মাটি কেটে চলেছে, বাঁধকে কেটে ফেলতেই হুহু শব্দে খালের ভিতর দিয়ে জল ঢুকতে লাগল। কিন্তু ঘণ্টা কয়েক পরে বা দু' চারদিনের মধ্যে আমু গেল সরে। তখন খরেজ্‌মের লোকেরা ছুটল আমু'কে খালের আর এক মাথায় ধরার জন্য। এই ভাবে বিশৃঙ্খল নদীকে ধরার জন্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত।

কিন্তু ক্ষেতে জল দেওয়া আর খাল শুকোনর পরেও অনেক কাজ বাকি থাকত, যেমন খাল থেকে পলিমাটি সাফ করা। বিরাট ফেরঘানা খাল নির্মাতাদের চাইতেও প্রতি বছর খরেজ্‌মের লোকদের বেশী মাটি সরাতে হত। এমনকি বছর দশেক আগেও একজন যৌথখামারীকে বছরে একশ'রও বেশী শ্রমদিন শুধু সেচ খালে পরিষ্কার আর মেরামতের কাজ করতে হয়েছে। মানুষের অর্ধেক জীবন কাটত নদীর সঙ্গে লড়াই করে। সুতরাং, সোভিয়েত রাষ্ট্রকে খরেজ্‌মের লোকদের শুধু খাঁ বা বাইদের হাত থেকেই মুক্তি দিতে হয়নি আমু'র হাত থেকেও রক্ষা করতে হয়েছে।

তিনটি সবচেয়ে বড় খাল—হাজাভাত, পাল্‌ভান ও শাভাতের গোটা পনের লকগেটের বদলে করা হল সব চেয়ে বড়ো লকগেটগুলির একটি মাত্র মিলিত পদ্ধতি, যার নাম তাশসাকা। এভাবে 'পলাতক নদীর অন্বেষণ' চিরদিনের মতো শেষ হল। কেতমেন আমু'কে ফিরিয়ে আনতে পারেনি, কিন্তু বিস্ফোরক দল ও শক্তিশালী সাকসন-ড্রেজ লকগেটের কাছে কাজ করে নদী যেমনি সরে যাবার চেষ্টা করে অমনি তাকে ধরে ফেলে। খরেজ্‌মের

বাকি খালগুলিকে — বজসু, কিপচাক-আরনা, ক্লিচ-নিয়াজবাই, সোভিয়েত-ইয়াব ও মাঙ্গিত-আরনা প্রভৃতিকে দুইটি নূতন সেচ খালের পদ্ধতিতেও যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা সেচ খালগুলিকে নূতন করে তৈরী করলেন, খুঁড়লেন নূতন স্পিলওয়ে, কারা কুম বালুর হাত থেকে খরেজম্ মরূদ্যান রক্ষা করা হয় পর পর কয়েকটি হ্রদে।

কিন্তু আমু'র হাত থেকে যৌথখামারীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য শুধু এইটুকুই করা হল না। ইঞ্জিনিয়াররা খরেজমে এক্সকাভেটর কেন্দ্র স্থাপন করলেন, এক্সকাভেটরের দাঁতওয়ালা মুখ প্রধান খালগুলিকে সাফ করতে লাগল।

এও কিন্তু সব নয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করলেন খরেজম্ মরূদ্যানের নীচে এক বাঁধ দিলে মানুষের কাছে নদী পরাস্ত হয়ে তারই বশীভূত হবে। বাঁধ দুরন্ত আমুকে শান্ত করবে এবং সে একই লেভেলে ও স্থায়ী নদীগর্ভে বয়ে চলবে। তখন আর খরেজমবাসীদের বার বার জমি ধুইয়ে দিতে হবে না। বন্যার হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে, উটকে আর চিগির টানতে হবে না, এমন কি মাঠে জল-তোলার সমান্তরাল পাম্পেরও দরকার থাকবে না।

এই বাঁধের ফলে আমুর অনেকখানি জায়গা জুড়ে নৌচলাচলেরও সুবিধে হবে। আর মধ্য এশিয়ার এই শক্তিশালী নদীতে নৌচলাচলের যে মোটামুটি সমস্যা তার সমাধান হবে পরে যখন সোভিয়েত মানুষ খরেজমের ৬০০ মাইল উপরে কারশি স্তেপকে জল দেওয়ার জন্য জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান লকগেট শেষ করবে। এই সেচ ব্যবস্থায় যে দুইটি জলাধার তৈরী করা হচ্ছে তা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের দুটি নূতন সমুদ্র। তখন আমু বিজ্ঞানীদের হিসাব মতো বাগ মানাবে। লকগেটের নিয়ন্ত্রণকরা স্থায়ী সরু নদীগর্ভে শান্তভাবে বয়ে যাবার জন্য যতটুকু জল দরকার কেবল ততটুকু জল দেবে আমু'কে। কারশি স্তেপের ভাবী জলাশয়ের দুটি স্পিলওয়ের কর্মীরা 'পাগলা' আমু'র মাঝের স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আমু তখন হবে বাধ্য ও শান্ত। তখন এর থাকবে একটিমাত্র স্থায়ী চলাচল পথ, তা রাতের বেলা ধরা পড়বে বোয়ার আলোয়।

এখনও জমিতে ঊষর জল দেওয়ার সমস্যারও হবে সমাধান। সে সময় আর দূরে নেই যখন খরেজমের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে মরুভূমির ছিনিয়ে-নেওয়া জমি ফিরে পাবে।

তা ছাড়া জল আর আমু'র উর্বর পলিমাটি গড়ে তুলবে মরুভূমির বুকে নূতন চাষের

জমি। আজ যেখানে মরুভূমির তপ্ত বালুতে রাখালের কুকুর গা লাগাতে ভয় পায়, মাটি খুঁড়ে ঠাণ্ডা জায়গা খোঁজে সেখানে জাগবে জলের মুখর খরস্রোত, যে গাছ ও গুল্মের জন্য খরেজ্‌ম্‌ বিখ্যাত মরুভূমির বুকে শোনা যাবে তাদের পাতার মর্মরধ্বনি।

অন্যান্য ফসলের কথা ছেড়ে দিলেও আমু'র ভাটিতে লক্ষ লক্ষ একর জমি জুড়ে চলবে তুলোর চাষ। পাঠকদের স্মরণে আছে উজবেকদের কাছে তুলোর চাষ কত প্রিয়। এ হল তাদের রাজনীতি আর কবিতা, সাম্যবাদ গঠনে তাদের অন্যতম অবদান। উজবেকীয় প্রজাতন্ত্রের চতুর্থ পাঁচ-সালা পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইনে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে বলা হয়েছে: 'উজবেক ও তাদের বড় ভাই রুশ জনগণ তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য ও অমর বন্ধনের বাস্তব সাক্ষ্য হল তুলো।'

'বন্ধুত্বের বাস্তব সাক্ষ্য' কথাটি কাব্য রসের দিক থেকে যেমন শক্তিশালী তাৎপর্যের দিক থেকেও তেমনি যথার্থ। এ কথা প্রতিটি সোভিয়েত নরনারীর কাছে স্পষ্ট যে এরকম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যে বন্ধুত্ব স্থাপিত তা চিরকাল থাকবে অটুট।

কারা-কল্পকদের দেশে

১। নুকুস

স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক কারা-কল্পকীয় প্রজাতন্ত্র যারা দেখেছে বা সেখানে বাস করেছে তাদের এর রাজধানী নুকুস সম্পর্কে প্রথমেই কী ধারণা জন্মেছে জিজ্ঞেস করলে তারা মোটামুটি এই ধরনের উত্তর দেবে: আলো, বাতাস ও জায়গার কোন অভাব নেই। বিমানের অনেক অনেক নীচে (নুকুসে যেতে হলে বিমানে চাপতে হয়) হলুদ ও গর্ত-ওয়ালা মাটির উপর নজরে পড়ে সবুজ রাস্তার ছোট জালি ও খেলনার মত ঘরের সারি।

সহরের ভিতর চলাফেরা করলেও একে খুব ছোট বলেই মনে হবে। এর কারণ নুকুস নূতন সহর এবং এখনও তৈরী শেষ হয়নি। মহান স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের মাত্র কিছুদিন আগে রৌদ্রালোকিত তপ্ত স্তেপের মাঝখানে সহরের প্রথম বাড়ির পত্তন হয়।

নুকুসের রাস্তা ধরে হাঁটলে মাঝে মধ্যে নজরে পড়বে পাথর বাঁধানো পথের উপর দিয়ে সশব্দে ছুটে চলেছে মোটর সাইকেল বা লরি কিংবা গাড়ি টেনে ধীরে ধীরে চলেছে একটা উট। রাস্তার দু'পাশে কম্পমান গাছের সারি—তাদের ছায়া পড়েছে এ্যাসফল্ট বাঁধানো ফুটপাথের উপর। একতলা বা দোতলা বাড়ির মাঝখানে খালি জায়গার ধূসর টুকরো। সেখান থেকে ভেসে আসছে স্তেপের ঘাসের উগ্র গন্ধ। মাঝে মধ্যে ঐ ধূসর জায়গা থেকে এক একটা গিরগিটি তীরবেগে রাস্তা বেয়ে ছুটে চলে, মনে হয় তপ্ত পাথরে ওর পা পুড়ে যাচ্ছে, তড়রড় করে একটা টেলিগ্রাফের থাম বেয়ে উপরে উঠে ছায়ার দিকটায় বিশ্রাম নেয়, মুখটা হাঁ করে।

নুকুসের চারপাশে যে বন ও পার্কের বেষ্টনী তা এখনও এত ক্ষুদ্র যে কিজিল কুমের বালু-ঝড়ের হাত থেকে তাতে বিশেষ কোন আশ্রয় মেলে না। গরমের সময় রোজই মরুভূমি

থেকে প্রায় একই সময়ে একটা গরম ঘূর্ণিঝড় ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সহরের রাস্তাঘাট খালি, জানলাগুলো শক্ত করে এ'টে দেওয়া হয়। ধুলো আর উড়ন্ত বালুতে চারদিক অন্ধকার। ঘূর্ণিঝড় আধঘণ্টা মত বয়ে চলে—যেমনি হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে যায়। আবার দরজা খুলে যায়, মেয়েরা জানলার তাক পরিষ্কার করতে সুরু করে।

সহর তৈরী এখনও শেষ হয়নি বলে এতে সব রকমের সুযোগ সুবিধে নেই। কিন্তু এটা আদৌ সাধারণ সহর নয়। এটা এমন একটি জাতির রাজধানী যাদের সামান্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত সহর বলে কিছুই ছিল না।

কারা-কল্পক দেশের লোকেরা এর আগে ছড়িয়ে ছিল স্তেপের চারপাশে। থাকত শোচনীয় মাটির ঘরে বা বায়ুতাড়িত ইয়ুর্‌তগুলিতে যার 'জানলা বলতে ছিল ষাট ছে'দা মাত্র'। এই ভাবে ওরা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। পৃথিবীর বুক থেকে তারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হত যদি না ঘটত মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এর প্রথম ফল লোকেরা এই চমৎকার কথার ভিতর দিয়ে তখুনি সংক্ষেপে প্রকাশ করল: 'যারা মরবে বলে লোকে ভেবেছিল তারা মরেনি। মরল শুধু বড় লোকের দল।' বিপ্লব অবলুপ্তির হাত থেকে কারা-কল্পকদের বাঁচাল। কারা-কল্পকীয় স্তেপে গ্রাম ও সহর গড়ে উঠল। সমগ্র জনতা 'ষাট জানলাওয়ালা ইয়ুর্‌ত' আর ধ্বসে পড়া মাটির ঘর ছেড়ে এল নূতন ও আধুনিক বাড়িতে।

স্তেপের মাঝখানে গড়ে-ওঠা প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য সহরের মত নুকুসে এখনও চোখে পড়ে কোন বাড়ির উঠনে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো আমলের ইয়ুরত। এটা হল বৃদ্ধ বাপ মায়ের অভ্যাসের সম্মান স্বরূপ, দীর্ঘ জীবন যাদের কেটে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নূতন বাড়িতেও ইয়ুরতের পরিচয় মিলত। একটা বিরাট সিন্দুক বাড়িটার অনেক সেরা জায়গায় থাকত। মেঝের উপর বিছানো পুরু ফেল্টের নক্সা-আঁকা কোসমা সোফার কাজ করত কিংবা টেবিলটা এমনভাবে রাখা যেন ওটাকে যে কোন সময়েই সরিয়ে নেওয়া হবে। সুরুতে গৃহস্থালীর নূতন আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখা হত না, ফলে ঘরের চেহারাও হত অদ্ভুত। কিন্তু নূতন বাড়িতে থেকে থেকে কারা-কল্পকদের ধীরে ধীরে নূতন সৌন্দর্যবোধ ও অভ্যাসের সৃষ্টি হল। তারা একদিকে সহর গড়তে লাগল আর সহর আবার পাল্টা গড়ে তুলল ডাক্তার, শিক্ষক, লেখক ও শিল্পীদের।

কারা-কল্পকরা যে মরুভূমির বুকে সহরই গড়ে তুলছিল তাই নয়, তারা একই সঙ্গে নূতন জীবন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করছিল। মরূদ্যানে, গ্রামে এবং যে মাটির উপর গ্রাম তৈরী করছিল তাতেও এর প্রতিষ্ঠা।

মনে হয়েছিল ঐ জমিকে কোন দিনই তারা উর্বরা করে তুলতে পারবে না। এখানে এ

সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিই। সবাই জানেন যে সাধারণ কেঁচো মাটি উর্বর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এরা মাটি খেয়ে তাকে আবার পরিবর্তিত ও সারযুক্ত আকারে বের করে দেয়। কিন্তু কারা-কল্পাকিয়াতে কেঁচো নেই। ওখানকার ক্ষারযুক্ত মাটিতে কেঁচো বাঁচতে পারে না। তরুণ কারা-কল্পকীয় গবেষকরা মস্কো ও লেনিনগ্রাদের সঙ্গীদের সঙ্গে একত্রে বহু গবেষণার পর একধরনের শূককীট বার করেন যারা কেঁচোর কাজ করতে সমর্থ। এই ধরনের লক্ষ লক্ষ শূককীট ও অন্যান্য জাতের পোকা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিমানে করে কারা-কল্পাকিয়াতে আনা হল লোকেরা যাতে ওখানকার জমি বানাতে পারে।

নূতন সহরগুলিতে ফলের গাছ লাগানো হল, প্রথমে সে সব গাছে কোন ফল ধরত না। সেখানে ফুলের পরাগযোগ করার মতো কোন পতঙ্গই ছিল না। বিমানে করে মৌমাছি আনা হল। ফলের বাগানে গড়ে উঠল মৌচাক আর কিছুদিনের মধ্যেই গাছের শাখা আপেল, পিয়ার, খুবানি এবং বিভিন্ন ধরনের প্লামে ভরে উঠল। এই ভাবে মৌমাছিরাও সাহায্য করল জমি গড়তে।

কারা-কল্পাকিয়াতে মৌমাছি পালন বিশেষ অর্থকরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে সব চেয়ে বেশী যে গাছ জন্মায় তা হল ইয়ান্‌তাক বা উট কাঁটা। এই কাঁটাযুক্ত গুল্মকে একমাত্র উটেরাই খেতে পারে। কিন্তু এই গাছ থেকেই পাওয়া যায় চমৎকার মধু। এখন মৌমাছিরাও এই গাছের ফুল থেকে মধু আহরণ করে থাকে।

মরূদ্যান ও সহর গড়ে তোলার জন্য অবশ্য কারা-কল্পকদের সব চাইতে বেশী দরকার জলের। 'ওর নিজের কোন জল নেই,' মধ্য এশিয়ার এই প্রবাদের অর্থই হল প্রচণ্ড দারিদ্র্য। কারা-কল্পকদের নিজস্ব কোন জল ছিল না। তাই তারা বড় বড় সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে লাগল: এর মধ্যে আছে আমু'র দক্ষিণ ও বাঁ দিকে প্রসারিত বিশাল কিজ-কেতকেন ও লেনিন খাল এবং আরও বহু ছোট ছোট খাল। কারা-কল্পাকিয়ার পরিচয় দেবার সময় আমি এদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটিভাবে শোনাব। এখন শুধু এইটুকুই বলব যে এই ব্যাপক সংগঠনমূলক কাজের কেন্দ্র হল কারা-কল্পকদের নূতন রাজধানী নুকুস। রৌদ্রালোকিত বিশাল স্তেপের চারদিক থেকে লোকেরা এখানে এসে হাজির হয় নূতন পেশা ও কাজকর্ম শেখবার জন্য।

যাদের রাজধানী এ সহর তাদের আগে নিজের সহর ও শ্রমশিল্প বলতে কিছুই ছিল না। আজ এখানে গড়ে উঠেছে লুসার্ন পরিষ্কার করার কারখানা (আমু'র ভাটির দিকে, অর্থাৎ কারা-কল্পাকিয়া ও খরেজ্‌মে বোনা লুসার্ন বীজকে পরিষ্কার করা হয় এখানে),

গড়ে উঠেছে একটি যন্ত্র আর একটি মোটর মেরামতের কারখানা, তৈরী হচ্ছে একটি কাপড়ের কল। এগ্‌নুলি হল কেবল বৃহৎ শিল্প সংস্থা। এ ছাড়া সহর বলতে যা ব্‌ঝি তেমন অন্যান্য শ্রমশিল্পও চাল্‌ন হয়েছে বা হতে চলেছে, যেমন পোষাক ও জ্‌তা তৈরীর কারখানা, দ্‌ধ-জাত জিনিসের কারখানা, ইঁট ও টাইলের ভাটি, বিয়ার কারখানা, র্‌টির কারখানা প্রভৃতি। অন্যান্য সহরে এগ্‌নলি যেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, ন্‌কুসে এগ্‌নলিকে তৈরী করতে হয়েছে একই সঙ্গে। এখানকার অধিবাসীরা সগর্বে তাদের এই সংস্থাগ্‌নলিকে আগন্তুকদের দেখিয়ে থাকে।

ন্‌কুসবাসীদের প্রকৃতপক্ষে লিখিত ভাষা বলে কিছ্‌ন ছিল না। বিখ্যাত কবি বেরদাখ এবং কয়েকটি লেখাপড়া জানা লোক আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করে মাতৃ ভাষায় কবিতা লিখতেন কিংবা দলিলপত্র রচনা করতেন। বহ্‌ন শতাব্দী ধরে কারা-কল্পকদের স্‌জনী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল ম্‌খের ভাষার মাধ্যমে। এই ভাবে রচিত হয়েছিল র্‌পকথা, গান ও মহাকাব্যের অত্যাশ্চর্য সম্পদ। প্রকৃতিজয়ী, স্বাধীন ও শক্তিশালী মান্‌ষের যে স্বপ্ন তাদের ছিল তার প্রকাশ ঘটেছে যাদ্‌ঘটিত কাহিনী ও বিখ্যাত মহাকাব্য 'কিরক্‌-কিজ্‌'।

শব্দের শক্তি কত প্রচণ্ড কারা-কল্পকবাসীদের সেই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রবাদবাক্যে: 'মান্‌ষের রসনা পাথর বিদীর্ণ করতে পারে।' তাই ন্‌তন রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে কারা-কল্পকদের যে প্রথম বাড়িগ্‌নলি তৈরী হয় তার মধ্যে একটি হল বড় ছাপাখানা। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা, পাঠ্য প্‌স্তক, কারা-কল্পক ভাষায় অন্‌দিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্লাসিক্‌স্‌, মহান লেখক এবং কারা-কল্পকের তর্‌ণ লেখকদের রচনাবলী এখানে ছাপা হয়ে সমগ্র কারা-কল্পক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ন্‌কুসের শিক্ষক শিক্ষণ উচ্চ বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কলেজ থেকে হাজার হাজার স্নাতক ন্‌তন-স্‌ষ্ট কারা-কল্পক লেখ্য ভাষাকে প্রচার করার জন্য স্তেপের ব্‌কে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র স্তেপ র্‌পান্তরিত হয় এক বিরাট বিদ্যালয় ও গবেষণাগারে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লোকশিল্পও গ্‌র্‌ত্বপ্‌র্ণ ভূমিকা নেয়। অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত কারা-কল্পক ইন্‌স্টিটিউটের (উজবেক বিজ্ঞান আকাদমীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) কর্মীরা কারা-কল্পক বর্ণমালার উদ্ভব করেন এবং তাঁরা লোক কাব্য, কাহিনী ও সঙ্গীতের অন্‌শীলন ও রেকর্ড করতে স্‌র্‌ করেন। স্তানিস্লাভ্‌স্কির নামে জাতীয় সঙ্গীত-নাটক থিয়েটার এবং তর্‌ণ দর্শকের থিয়েটারের ভিত্তিই হল কারা-কল্পক লোক গাথা ও

রুশ চিরায়ত নাটক। প্রখ্যাত লোক গায়ক, বাজিয়ে ও গল্প বলিয়েরা নুকুস সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

বেশী দিনের কথা নয় যখন লোক গায়ক গাইত জীবন এত সংকীর্ণ যে 'স্তেপের বদলে তাদের সম্বল ছোট্ট একটা বিছানা আর দোমরার বদলে একখানা ছোট লাঠি'। আজ তাদের কণ্ঠে সেচ কর্মীদের প্রশস্তি, কেননা 'মেঘ নিংড়ে জল নিয়ে আসা বাহাদুরের' বিষয়ে মানুষের বলিষ্ঠ স্বপ্নকে তারা সত্য করেছে। প্রশংসা করে সেই সব শিল্প কর্মীদের যারা প্রজাতন্ত্রের বুকে বায়ুচালিত মোটর বসিয়ে রূপ দিয়েছে রূপকথার সেই 'বাহাদুরকে যার ফুৎকারে শত্রু সৈন্য রণে ভঙ্গ দেয়'। কিন্তু সব চেয়ে বেশী প্রশংসা জানায় তারা সেই কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে যারা বন্ধ্যা স্তেপের মাঝখানে ফসলের জমি গড়তে তাদের সাহায্য করে, যারা সেই রূপকথার বাহাদুরের মত 'এই জমির বুকে রাতারাতি নূতন ফলের বাগান, প্রাসাদ আর সহর গড়ে তুলেছে'।

২। কারা-কল্পাকিয়ার বিমান-পথ

কারা-কল্পাকিয়াতে এমন একটি জায়গা আছে যার কথা প্রজাতন্ত্রের সবাই জানে। এখানে মানুষের আলাপ পরিচয় হয়, বন্ধুদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়, পরস্পরের কাছ থেকে তারা বিদায় নেয়। এখানে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা বললে কারা-কল্পকীয় প্রজাতন্ত্রে কোথায় কী ঘটছে তার একটা ধারণা পাওয়া যায় যদিও প্রজাতন্ত্রটি এত বড় যে উজবেকিস্তানের প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে আছে। এটি হল নুকুস বিমানবন্দর।

কারা-কল্পাকিয়া বিমান চলাচলের অঞ্চল। অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে এখানে বিমানভ্রমণ পরিমাণে অনেক বেশী। এখানকার যোগাযোগের সাধারণ ব্যবস্থাই হল বিমান।

বিমানে করে নুকুসে কারা আসে? কোন যৌথখামারী এল পশু উৎপাদনকারীদের সম্মেলনে যোগ দিতে; জনৈক ছাত্র হয়ত মে দিবসের উৎসবের ছুটি কাটাবার জন্য আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফিরে এল, নুকুসে কাজ-করা তার ছেলেকে দেখার জন্য এল কোন বৃদ্ধা, তরুণ পাইওনিয়র এল তার দলের জন্য শিঙ্গা কিনতে, ইয়াঙ্গি য়ুলের যৌথখামারী এল কারা-কল্পকীয় যৌথখামারীকে তুলো উৎপাদনের সুক্ষ্ম কৌশল শেখাতে। মস্কোর কোন ভূতত্ত্বের অধ্যাপক তার গবেষণা কাজের জন্য প্রতি বছর হাজির হন এখানে—তাঁর মন এখানেই পড়ে থাকে, কিংবা এসে উপস্থিত হল মিঠাই তৈরীর কারখানার নক্সার ভারপ্রাপ্ত তাসখন্দের একজন ইঞ্জিনিয়ার ...

বহির্গামী বিমানে চলেছে একজন তরুণ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রজাতন্ত্রের কোন জেলায় বৃহৎ তেল উৎপাদন কেন্দ্রের গঠন কাজে নিযুক্ত হয়ে, অথবা কিজিল কুমে প্রাচীন খরেজ্‌ম্ সভ্যতার নূতন স্মৃতিচিহ্ন খোঁজা কোন প্রত্নতাত্ত্বিক। কোন অসুস্থ লোক চলেছে কেগেইলিতে নিরাময়কারী কাদা চিকিৎসার জন্য বা অপর একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাখতা কুপিরে। এখানে কুমিসের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বেতারে রাখালের সাংঘাতিক অসুখের খবর পেয়ে ডাক্তার ছুটেছে তাকে দেখতে...

কারা-কল্পাকিয়ার সবাই ডাক্তার উরাজমেত খালমুরাতভের নাম জানে। ইনি একজন সার্জন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্য, 'আকাশচারী' ডাক্তার হিসেবে ইনি হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কারা-কল্পাকিয়ার সব ডাক্তাররাই আকাশচারী। প্রায় প্রত্যেক কারা-কল্পক জানে আকাশ থেকে তাদের দেশকে কেমন দেখায়। এর মাঝখান দিয়ে ধমনীর মত বয়ে চলেছে বাদামী রঙের দুর্দান্ত আমু দরিয়া, খজেইলি জেটির সামান্য নীচে এই নদী বিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে ঘন নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে আরাল সাগরে মিশেছে। খজেইলির উপর দিকে আমু'র দুই তীর ঘেঁষে চলে গেছে সবুজ গাছপালা-ছাওয়া সংকীর্ণ জমির ফালি আর এরই পরে সমুদ্রের মত বিশাল ধূসর স্তেপ আর হলুদ ও লাল বালি।

বিমানে করে নুকুস থেকে দক্ষিণে গেলে বালুর মধ্যে রেখার মত আমু'কে সমস্ত পথ ধরে দেখতে পাওয়া যায়। আকাদেমিশ্যান আলেক্সান্দ্র ফের্সমান আমু'র উপর দিয়ে ১৯২৯ সালে সবপ্রথম বিমানে করে যান। তিনি এরকম বর্ণনা দিয়েছেন: 'দু'পারে খাড়া তীরের মাঝখানে কখনও বা এটা রক্তের মত ঘোর লাল, কখনও বা তীরের পাশে তুগাই ঝোপঝাড়ের কালো বিস্তৃতি, কখনও উজ্জ্বল ও চকচকে, কখনো বা ইস্পাতের মত দ্যুতিময় ও কালো কায়ুকের টিকায় ছাওয়া।'

নুকুস ও তুর্তকুলের মাঝখানে নজরে পড়ে কিজিল কুম পেরিয়ে বিস্তৃত সুলতান উইজ দাগ পর্বতমালা। ফের্সমানের ছাত্র সোভিয়েত ভূতত্ত্ববিদরা এই পর্বতমালা এবং বালুর গর্ভ থেকে উত্থিত অন্যান্য ছোটখাট পাহাড়গুলির নাম দিয়েছেন উরাল-তিয়েন শান পর্বতমালা। এঁরা প্রমাণ করেছেন যে উরাল ও তিয়েন শান একই বিশাল পাহাড় পুঞ্জের স্বগোত্র। এর একভাগ দক্ষিণ উরালে ক্রমশ মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে এবং তিয়েন শানের পশ্চিম অংশে আবার মাথা তুলেছে। সুলতান উইজ দাগ এই পাহাড় পুঞ্জের শীর্ষ বিশেষ, মাঝে মধ্যে উঁচু হয়ে উঠেছে কিজিল কুম মরুভূমির বুকে।

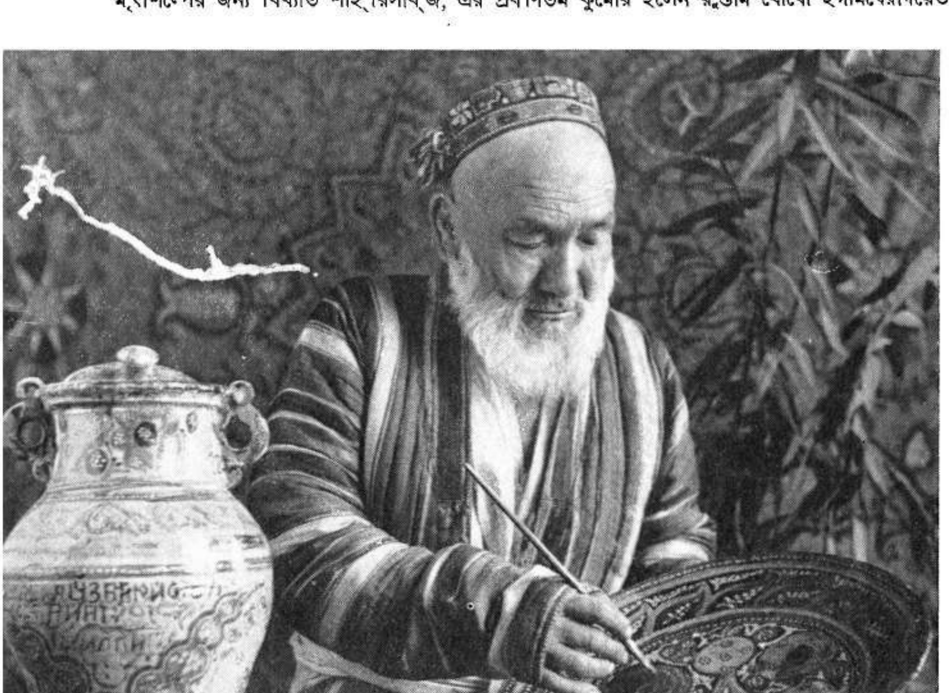


হম্‌জে একটি স্যানাটোরিয়ামের দৃশ্য।

উজবেকিস্তানের একটি ধান ক্ষেত।



মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত শাহ্‌রিসাব্‌জ, এর প্রবীণতম কুমোর হলেন রুস্তাম বোবো ইগামবেরদিয়েভ।





উরগঞ্জের শিক্ষক শিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট।



ন্‌কুস সহর। কারা-কল্পকীয় স্বায়ত্তশাসিত
প্রজাতন্ত্রে মন্ত্রি পরিষদের ভবন।

এই পর্বতমালার মাঝখানে ভূতাত্ত্বিকরা খুঁজে বার করেছেন চুনা পাথর, জিপসাম্, মার্বেল, গ্র্যানাইট, স্ফটিক পাথর, মার্ল, এসবেসটস, হলুদ ও লাল রঙের গিরিমাটি ও গ্র্যাফাইট। এদের কোন কোনটা এখন সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সাব্বাজ ও তুর্তকুলের কাছে আমু বরাবর বিস্তৃত সেচ জমির সরু ফালি পেরিয়ে কারা-কল্পক সীমানায় কিজিল কুমের আরম্ভ। কিজিল কুমের উপর দিয়ে উড়ে গেলে মনে হয় বিশ্বজগৎ দু' অংশে বিভক্ত: উপরে নীল আকাশ আর নীচে লাল-হলুদ মাটি। কিন্তু কূপের বায়ুচালিত যন্ত্রপাতির কাছে নামা মাত্র মহান বৈচিত্র্য নিয়ে মরুভূমি আত্মপ্রকাশ করে।

একপাল কারাকুল ভেড়া কূপের দিকে এগিয়ে আসতে তাদের পায়ের তলায় বালু চড়্ চড়্ করে ওঠে। নূতন আসা উদ্ধত উটের দল উটসওয়ারের নির্দেশ মত পা গুটিয়ে বসে পড়ে। বালুর ছোট ছোট ঢেউ-এর জন্য আশেপাশের বালিয়াড়িকে বড় বড় ঝিনুকের মত মনে হয়, সূক্ষ্ম অথচ সহজ সৌন্দর্যে এরা মরুভূমির শোভা বাড়ায়।

বালিয়াড়ির উপর কালো মতো দেখতে একটা গুল্মকে তুলবার চেষ্টা করুন। সারা দিন খেটেও এর শিকড়ের গোড়া খুঁজে পাবেন না। কোন কোন মরু গুল্মের শিকড় পঁয়ষট্টি ফুট পর্যন্ত মাটির নীচে চলে যায়। বালুর তলার সঞ্চিত আর্দ্রতাকে এই জল-সরবরাহ পদ্ধতিতে তারা আহরণ করে থাকে।

পশু চিকিৎসক ও পশুপালক ছাড়াও কূপের কাছে সাক্ষাৎ মিলবে পশু উৎপাদনের গবেষণা সংক্রান্ত কারা-কল্পক পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মীকে। এর কাজ হল মরুভূমিতে ঘাস লাগানোর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো। এখন বহু রকমের মরু ঘাসের বীজ বিমান থেকে বোনা হয়। এর মধ্যে আছে কিয়াক বা বালু বার্লি, ইরকেক (বালু ঘাস), ইয়ান্তাক (উটকাঁটা) ও অন্যান্য ঘাস। কূয়োর কাছেই বালুর বুকে কুমারচিকের চাষ দেখা যাবে। আগেকার দিনেও মরুবাসীরা এর ফল দিয়ে রুটি বানাত, কারণ পুষ্টির দিক থেকে কুমারচিক গমের সমকক্ষ। এখন এই ফসলের উন্নতি তথা এর ফলন বাড়াবার চেষ্টা চলেছে।

কারা-কল্পক রাখালদের দৈনন্দিন জীবনেও সমাজতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। সেদিন আর নেই যখন তারা মাসের পর মাস বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। এখন রাখালরা ও যৌথখামারের মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত। মরুভূমির বুকে এই রাখালদলদের কাছে পৌঁছেছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র ও গাইয়ে বাজিয়ের দল। মরুভূমির গভীরে রাখালরা তাদের 'কে. আর. ইউ-২'টাইপের বেতার যন্ত্র খুলে যৌথখামার

থেকে প্রচারিত গান বাজনা শোনে, একটা ছোট্ট আকারের বায়ুমোটর থেকে এতে শক্তি যোগান দেওয়া হয়। ডাক নিয়ে বিমান মরুভূমির উপর চক্কর মারে। এক কথায়, সোভিয়েত দেশের অন্যান্য জায়গার মতো ব্যাপক ও উদ্দীপক মানবিক উৎসাহে এখানকার জীবনও কর্মচঞ্চল।

নুকুস থেকে উত্তরপূর্বে বিমানে করে এগুলে নীচে নজরে পড়ে ধূসর-হলুদ স্তেপের পটভূমিতে অ-সমান আকৃতির ছোট ছোট সবুজ জমির টুকরো—নূতন মরূদ্যানের দীর্ঘ সারি। এগুলি হল কারা-কল্পাকিয়ার সব চেয়ে বড় তুলো চাষের অঞ্চল। ১৯৩৮ সালে তৈরী কিজ-কেতকেন খাল চিম্‌বাই জেলার ১৬০,০০০ একর ঊষর জমিকে তুলো, লুসার্ন ও ধান ক্ষেতে রূপান্তরিত করে।

মধ্য এশিয়ার অন্যান্য জায়গার চেয়ে কারা-কল্পাকিয়াতে জলের মূল্য অনেক বেশী, কারণ পৃথিবীর মধ্যে এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় সব চেয়ে কম। রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলে সাধারণ বৃষ্টি যতটুকু আর্দ্রতা আনে এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টি বা তুষারপাত তার বেশী আর্দ্রতা আনে না। এ জন্য চিম্‌বাই কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মীদের প্রতিটি শস্যের চাষকে যৌথখামারীদের কাছে সুপারিশ করার আগে নূতন করে হিসাব করতে হয়, নূতন কর্ষণ পন্থা আবিষ্কার করে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়াতে হয়, নূতন করে বাছাইয়ের কাজ করতে হয়।

পুরোনো আমলের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা হল লালচে দেয়াল, প্রাক-বিপ্লব কারা-কল্পাকিয়ার চিমবাই বসতির অবশেষ। চিমবাই স্তেপে পথের পাশে এরা প্রাচীন গৌরব নিয়ে মাথা তুলে আছে। স্তেপ টিলার দ্বারা ছাওয়া, দেখতে ক্ষয়-পাওয়া কারাকুলের মতো। বর্তমানে চিমবাই একটি সহর। যৌথখামারের লরিগুলি দেয়ালের পাশ দিয়ে নূতন মরূদ্যান থেকে ছুটে চলেছে চিমবাই তুলো কলের পথে, তুলোবীজ-জাত তেল কলের নির্মাণ কার্যের জায়গায় কিংবা সহরের অন্য কোন কারখানায়। চিমবাইয়ে গড়ে উঠেছে নূতন বসতবাটি ও অন্যান্য ঘরবাড়ি, এর ভিতর আছে সংস্কৃতি ভবন, দুটি সিনেমা, তিনটে হাসপাতাল, একটি গ্রন্থাগার।

ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি রটেছে এধরনের তুলো, ফল ও ধান চাষীদের সাক্ষাৎ মিলবে চিমবাইয়ের যে কোন যৌথখামারে, যদিও মাত্র কিছুদিন আগে এরা এসব ফসল ফলাতে সুরু করেছে। যৌথখামারীরা নিজের স্তেপে পরীক্ষামূলক আঙুর ক্ষেত ও আপেল বাগান দেখাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাকে মনে করা হয়েছে বন্ধ্যা ভূমি।

পাঠকরা যাতে এই নূতন তৈরী ছোট ছোট মরূদ্যানের বিশাল গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং একথা উপলব্ধি করতে পারেন যে এখানে তৈরী প্রতিটি আঙুর ক্ষেত বা আপেল বাগান কারা-কল্পকবাসীদের জীবনেতিহাসের এক একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর, এজন্য আমি কারা-কল্পাকিয়ার মাটি সম্পর্কে দু'চার কথা বলব। গত কয়েক বছরের মধ্যে কারা-কল্পকরা যতটা ক্ষেত ও বাগানকে সেচের অধীন করেছে তা সমগ্র প্রজাতন্ত্রের যে এলাকা তার শত করা একভাগের মাত্র কিছু বেশী।

প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘুরে বেড়ালেও নোনা জলের কুয়ো ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়বে না। আকাদেমিশ্যান ফের্সমান তাঁর ভ্রমণ পঞ্জিতে লিখেছেন: 'বহু জ্বালা-পোড়া দিনের পর মিলবে শুধু এক পেয়ালা বিস্বাদ নোনা জল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাবে কিন্তু দেখা যাবে না এই তরল পদার্থের স্বচ্ছ উপরিভাগ, শোনা যাবে না এর সঙ্গীত-মুখর স্রোত ধ্বনি। কেবল তখনি বোঝা যাবে H_2O'র মূল্য, সেই বিস্ময়কর রাসায়নিক সংমিশ্রণ যা ছাড়া জীবন, সুখ, সম্পদ কোনকিছুই কল্পনা করা চলে না।'

কিন্তু কারা-কল্পাকিয়া, বিশেষ করে আমু'র বাঁ দিকে শুমানাই উপত্যকা বরাবরই ঊষর, আশ্রয়হীন বা জন বিরল ছিল না। প্রাচীন সেচ পদ্ধতির চিহ্ন এই স্তেপের বুকে শত শত মাইল ধরে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে সাদা নোনা। এই নোনা জমি সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। অনেকদিন আগে এখানে যখন জল ছিল বড় লোকরা প্রতি ফোঁটা জলের জন্য দাম হাঁকত। দারিদ্র্য-পেষিত চাষীর চোখের জল শুকনো মাটিকে ঝলসে দেয়, জলকে করে লবণাক্ত। তারপর খসে পড়ল বাগানের গাছের পাতা, শুকিয়ে গেল মাটির ঘাস। মানুষের চোখের নোনা জল ছাড়া থাকল না আর কিছুই।

নুকুস থেকে বিমানে করে পশ্চিমে গেলে আমু'র বাদামী জলধারাকে পেরুবার পর চোখে পড়ে শুমানাই স্তেপের নূতন মরূদ্যানের সারিতে তুলোর চাষ। এসবে লেনিন খাল থেকে জল দেওয়া হয়, বিস্তৃত তারা কুন্‌গ্রাত পর্যন্ত। তুলো ছাড়াও এই সব মরূদ্যানে লুসার্ন, ধান ও ফলের চাষ হয়।

একদিন নুকুস বিমানবন্দরে আমি একটি মজার তর্ক শুনেছিলাম। বিমানের জন্য অপেক্ষারত দু'জন কর্মকর্তা জলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ'দের একজন চিমবাই ও আর একজন কুনগ্রাতের লোক। চিমবাইয়ের লোকটি এই কথা বললেন যে কারা-কল্পাকিয়াতে তুলো চাষের জন্য জল ব্যবহার করা বেশী সুবিধাজনক। কুনগ্রাতের লোকটিও ঐ একই যুক্তি দেখালেন পশু উৎপাদনের জন্য। দীর্ঘ হিসাবনিকাশের পর দু'জনাই এই

সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মরুভূমিতে তুলো চাষের জন্য ৩৫ কিউবিক ফুট জল খরচা করে পাওয়া যায় ৩৫ আউন্স কাঁচা তুলো আর পশুপালনে ঐ পরিমাণ জল খরচ করলে পাওয়া যায় মোটের উপর পাঁচ পাউন্ড উল, দশ লিটার দুধ এবং ১৭৬ পাউন্ড মাংস ও চর্বি। অবশ্য উভয়েই তুলো এবং পশুজাত দ্রব্যের গুরুত্ব স্বীকার করলেন। চিমবাই জেলার মত কুনগ্রাত জেলার যৌথখামারীরাও অধিক তুলো উৎপাদনের চেষ্টা করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত পশুপালন কেন্দ্র হিসেবেই মুখ্যত কুনগ্রাতের নাম।

প্রজাতন্ত্রের সর্ববৃহৎ বিমানপথ হল উত্তরপশ্চিমে। এটি গেছে নুকুস থেকে কুনগ্রাত হয়ে বিখ্যাত উস্ত-উর্ত মালভূমির মাঝখানে অবস্থিত চুরুক কূপে।

উস্ত-উর্ত এক প্রকাণ্ড কর্দমাক্ত মরুভূমি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে কোন জনপ্রাণী ছিল না। কারা-কল্পকরা বলত: 'এই মরুভূমি এতই ভীষণ যে এখানে কোন শত্রুরও দেখা মিলবে না।' উর্তের জনশূন্য মরুপ্রান্তর দেখে নবাগতরা অবাক হয়ে যায়। দিগন্ত-জোড়া তরঙ্গায়িত সমতলের উপর ধূলিধূসর ছোট ছোট গুল্ম ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কাদা ভরা জমির উপরে সূর্যের আলো চক চক করে আর শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বালু উড়িয়ে নিয়ে এক এক জায়গায় জমা করে।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার জাতীয় সীমা নির্দেশের সময় এমনভাবে সীমানা ভাগ করা হয় যাতে কাজাখীয় ও কারা-কল্পকীয় গ্রামগুলি তাদের নিজ নিজ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পড়ে। কিন্তু সে সময় উস্ত-উর্তে কোন লোক ছিল না। এজন্য এটাকে আটান্নতম মধ্যরেখায় ভাগ করা হয় অর্ধেক পড়ে কাজাখস্তানে আর এক অংশ কারা-কল্পকিয়ায়।

কয়েক বছর বাদে কারা-কল্পকীয় উস্ত-উর্তে প্রথম বসতি চুরুক কূপ গড়ে ওঠে। এর প্রথম অধিবাসী হল তিনজন আবহবিৎ। এরা অনেকটা মেরুকেন্দ্রের লোকদের মতো, কারণ বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঘটত কেবলমাত্র বিমানের দ্বারা। সেটাও কদাচিৎ কখনো সেখানে হাজির হত।

এরপর উস্ত-উর্তে হাজির হয় প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীর দল। বিমান ফটোর সাহায্যে ভূগোলবিদ্যাবিদরা মালভূমির মানচিত্র তৈরী করেন। ভূতত্ত্ববিৎ আবিষ্কার করেন লবণ, লিথোগ্রাফ পাথর ও খনিজ রঞ্জনদ্রব্য। ঐ সঙ্গে কয়লা ও তেলের খনিজ সম্পদেরও আভাস পান। উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা স্থানীয় গাছপালা অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে জলের ব্যবস্থা করতে পারলে ওখানে ২০ লক্ষ ভেড়া চরতে পারবে।

যুদ্ধ শেষ হলে উস্ত-উর্ত একটি বিখ্যাত আড়াই হাজার মাইলব্যাপী রাস্তার মধ্যে পড়ল।

তার উপর দিয়ে ৪৮ হাজার ভেড়া কিজিল কুম ও কারা-কল্পকিয়া হয়ে উজবেকিস্তান থেকে গেল আস্ত্রাখানে। উজবেক জনগণ এদের পাঠায় উক্রেন ও বেলোরুশবাসীদের। স্বদেশরক্ষা যুদ্ধে ওদের আর্থিক অবস্থার ক্ষতি হয়েছিল। পশু চিকিৎসক, পশু উৎপাদক এবং যোগাযোগ রক্ষাকারী একখানা বিমান এই পশুপালের সঙ্গে যায়। আর একখানা বিমান ঐ পথের পাশে কূয়ো খোঁড়ার কাজে সাহায্য করে। এই ভাবে উস্ত-উর্তে 'কূপ সড়কের' সৃষ্টি হয়।

পরে মালভূমির দক্ষিণাঞ্চলে উট উৎপাদন খামারের পত্তন হয়। ১৯৪৮—৪৯ সালে সাফল্যের সঙ্গে ভেড়ারা শীতকাল অতিবাহিত করে এবং উস্ত-উর্তে কংক্রীট বাঁধানো জল-রাখার জায়গা হল। ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মে বোগারা চাষ সংক্রান্ত মিলুতিন্স্কায়া পরীক্ষামূলক কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এক জাতের শুষ্কতা-নিরোধী গম ব্যবহার করে দশ একর আগে অকর্ষিত জমি থেকে প্রথম ফসল তোলা হয়। এই জমি চুরুক কূপের কাছে এবং জিপসাস্ লবণ বোঝাই। আরাল সাগরের পশ্চিম তীরের কাছে উস্ত-উর্তের এক প্রান্তে আক-তুমসুকে একটি নূতন জল-বায়ুবিজ্ঞান কেন্দ্র তৈরী হয়। এই ভারে, ধীরে ধীরে সোভিয়েত মানুষ কারা-কল্পকিয়ার সব চাইতে বন্ধ্যা জমির পুনরুদ্ধারের কাজে লেগেছে।

৩। আমু'র ব-দ্বীপ

আমু'র তীর বরাবর কারা-কল্পকিয়ার সব চাইতে বড় খজেইলির জাহাজঘাট নুকুস থেকে বেশী দূরে নয়। বহু বছর আগে এই ঘাটের পাশেই ফলের বাগান ও তুলোর ক্ষেত নিয়ে একটি ছোট সহর গড়ে উঠে। খজেইলির লোকেরা কাজ করে জাহাজঘাটে, জাহাজ মেরামত কারখানায়, তুলো কলে, নূতন নির্মাণ কার্যের অঞ্চলের খনি বা ইঁটের ভাটিতে। এরা শিকারপ্রিয়, শনিবার বিকেলে বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা সাল্‌তি করে। এরা যায় তুগাইয়ে অথবা আমু'র ব-দ্বীপের গভীরে।

মধ্য এশিয়ার জঙ্গলের নাম তুগাই। এরা চলে গেছে আমু'র তীর ঘেঁষে। কোন কোন ক্ষেত্রে দশ থেকে পনের মাইল পর্যন্ত চওড়া। তুরাঙ্গা পপলার, জুঙ্গারীয় উইলো গাছ, ছোট ছোট কমলা রঙের ফুলওয়ালা ওলিয়েস্টার, ঝাউ ঝোপ ও কুকুর-লতা লায়ানা ঝোপের সঙ্গে ঘন সম্বদ্ধ। এদের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। কোন কোন লতা ৮০ ফুট পর্যন্ত লম্বা। তুগাইয়ে মাঝে মধ্যে দেখা যায় নলখাগড়ার বা এরিয়েন্তাসের ঘন ঝাড়। এরিয়েন্তাস

এক ধরনের রৌপ্যশীর্ষ বিরাট আকৃতির খাদ্যশস্য। বুনো শুয়রের পায়ের দাগ ধরে সাক্ষাৎ ঘটে আমু'র মোরগ ফেজাণ্টের সঙ্গে। উজ্জ্বল-ডানা ফেজাণ্টগুলো সশব্দে চমকে ওঠে। ধূসর বলের মত সজারু ঝোপের ভিতর সাপকে তাড়া করে চলে। কখনো হয়ত বা 'নলখাগড়ার রাজা' তুরানীয় বাঘেরও সাক্ষাৎ মেলে।

তুগাই আমু'র ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ব-দ্বীপ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপের একটি, নীল নদের ব-দ্বীপের দেড়গুণ বেশী, কিন্তু এখানেও জনমানবের বসতি নেই কেননা বহু স্রোত ধারায় কীর্ণ এই বিস্তৃত নলখাগড়ার ভিতর দিয়েও অন্যান্য জায়গার মতোই হঠাৎ হঠাৎ গতির দিক বদল করে 'পাগলা' আমু।

ব-দ্বীপের একেবারে পশ্চিম কোণে উস্ত-উর্তের খাড়া-হয়ে-নামা ঢালুতে উরগা গ্রাম। এখানে আমু দরিয়া রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ কেন্দ্রের সদর ঘাঁটি। এই ঘাঁটির প্রবেশদ্বারে লেখা আছে: 'প্রকৃতি যেখানে ধ্বংস পায় জীবনও সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়।'

সংরক্ষিত অঞ্চলের মাঝখানে নলখাগড়া বা অন্যান্য গাছ কাটা বা পোড়ানো, শিকার করা বা মাছ ধরা নিষিদ্ধ। আমাদের উদ্ভিদকুলের ভৌগোলিক বিন্যাসের পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা বিচার করলে বন্য প্রকৃতির সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে অনাবাদী জমিকে কাজে লাগানো চাষী, মেষপালক, সেচ বিশেষজ্ঞ ও কৃষিবিদরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে ডজন ডজন গাছপালা সাবাড় করে ফেলে। কিন্তু এক সময় অপ্রয়োজনীয় মনে-করা গাছ থেকে মানুষ এখন পাচ্ছে রবার, চমৎকার তন্তু অথবা মূল্যবান ওষধি ও রাসায়নিক জিনিস। আমাদের সোভিয়েত ভূমিতে প্রকৃতি যে গাছপালার সম্পদ সৃষ্টি করেছে আমাদের বংশধররা তা থেকে ভবিষ্যতে বিস্ময়কর কত আবিষ্কার করবে হয়ত, সে সম্পদকে আমাদের তাই রক্ষা করা উচিত। সংরক্ষিত অঞ্চলের প্রথম ও মুখ্য কাজ হল এই। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা পরিবর্তিত ভূমি-সমুদ্রে এগুলো অকর্ষিত দ্বীপের মতো। উজবেকিস্তানে এ ধরনের বহু সংরক্ষিত অঞ্চল আছে। আমুর তীরেরটি তার মধ্যে সব চাইতে বড়।

আমু দরিয়ার সংরক্ষিত অঞ্চল পাখিদের বেশ ভালো জানা। এখানে এরা মানুষকে বড় একটা ভয় করে না। পক্ষীতত্ত্ববিদরা সালতি করে নলখাগড়ার ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যান আর পরীক্ষাগারে দীর্ঘ শীতকালীন কাজের জন্য পাখির জীবন সম্পর্কে নানা রকমের তথ্য জোগাড় করেন।

সর সর সালতির শব্দ শুনে সাদা বক ধীরেসুস্থে এক পাশে চলে যায়। দাঁড় যখন তাদের থেকে সামান্য দূরে জল ছিটায় ওরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডানা মেলে উড়ে যায়। এশিয়ার

চকচকে ইবিস এক ধরনের লম্বা বাঁকা ঠোঁট-ওয়ালা কালো পাখি। এরা মিশরের পবিত্র ইবিসের স্বগোত্র। জলের উপর দিয়ে নীচু হয়ে উড়ে যায়। এদের ডানা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নলখাগড়ার ফাঁপা ডাঁটা মর্মরিত হয়ে ওঠে। নলখাগড়ার ঝোপ থেকে শুনতে পাওয়া যায় জলচর পাখির ডাক। পারের ভেঙে যাওয়া বরফের টুকরোর শব্দের সঙ্গে ডাকটির মিল আছে। শৈলান্তরীপে বসে মোটা সোটা করমোরেণ্ট ডানার ঝাপট মারে, মনে হয় নিজেকে হাওয়া দিচ্ছে। পেট পুরে খাওয়া লোকের দৃষ্টিতে নৌকোর দিকে উপেক্ষাভরে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে এমনভাবে ডেকে ওঠে যে মনে হয় নীচু হ্রেষারব। বাজ দেখতে পেয়ে গ্রেব-পাখি বাচ্চাদের ডানায় ঢেকে বিপদ থেকে বাঁচার জন্য জলের মধ্যে ডুব মারে। এক ঝাঁক হাঁস হঠাৎ উড়ে যায়। ওদের পাখার ঝাপ্টায় ঝড়ো হাওয়ার সাঁই সাঁই শব্দ মনে আসে। বেঢপ-ভঙ্গী পেলিকান আকাশে উড়ে চলেছে শক্ত ঠোঁট বাড়িয়ে, দেখতে নৌকোর আগের দিকের মতো। হঠাৎ একটা ঈগল সাঁ করে উঁচু থেকে নেমে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মতো আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে কলরবকারী পাতিহাঁস, বুনো হাঁস, রাত বক, লাল ও ধূসর রঙের বক, চামচে-ঠোঁটের দল। এরা সূর্যের আলোকে ঢেকে ফেলে। ভয়-পাওয়া ব্যাঙগুলো ডাক বন্ধ করে জলের মধ্যে ঝুপ করে ডুব মারে। ব্যাঙগুলো যেখানে ডুব মারে তার চারদিকে ক্রম-বিস্তারিত জলচক্রে হাওয়া লেগে সমান হয়ে আসে। পাখিগুলো অনেকক্ষণ ধরে কলরব করতে থাকে — শান্ত হওয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব।

বলা চলে এই সংরক্ষিত অঞ্চল সমগ্র মধ্য এশিয়ার শিকারের পাখির অভাব স্থায়ীভাবে পূরণ করে। তা ছাড়া আমু দরিয়া সংরক্ষিত অঞ্চল যাযাবর পাখিদের থাকার জায়গা। এখানে ওরা বিশ্রাম করে, খায়দায়, মোটা হয়।

অর্থনীতির দিক থেকেও সংরক্ষিত অঞ্চলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আছে। এর শান্ত জল প্রণালী আর ঝোপ ও জলা গাছপালায় ভর্তি ছোট ছোট হ্রদগুলি, এর আবদ্ধ জলা যেখানে মাছ ডিম পাড়ে জেলেরা সেখানে জাল ফেলতে পারে না। মাছের অনেক খাবার এখানে, এর গভীর শীতকালীন খাতগুলি বিরাট মাছের ঝাঁক সৃষ্টি করে। এই সংরক্ষিত অঞ্চলের জন্য প্রতি বছর আরাল সাগরে মাছের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ব-দ্বীপের উপর যে সব বিভিন্ন ধরনের ডাঁশ ও ওই গোছের পোকা মাকড় ঘুরে বেড়ায় তারাই এদের প্রধান খাদ্য। ব-দ্বীপের মৎস্য কুলপতি হচ্ছে বেলচা মাথা স্টারজন্। এ মাছ শুধু এখানে আর মিসিসিপিতে পাওয়া যায়।

সোভিয়েত মানুষ আমু'র ব-দ্বীপে বন্য প্রাণীদের শুধু রক্ষাই করছে না, নানা নতুন মাছে জায়গাটার সমৃদ্ধি বাড়াচ্ছে। তারা বিমানে করে নিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের হেরিং

মাছের পোনা হাজারে হাজারে ছেড়ে দিয়েছে এখানে। আরাল সাগরে এখন শুধু স্থানীয় হেরিং মাছই মেলে না, প্রচুর সংখ্যায় কাস্পিয়ান হেরিংও পাওয়া যায়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সংরক্ষিত অঞ্চলের বাইরে নলখাগড়ার ঝোপের মাঝখানে ওন্দাত্রা (কস্তুরী ইঁদুর) ছেড়ে দেয়। দ্রুত এদের সংখ্যা বাড়ে, সব জায়গায় এরা দোতলা বাসা বানাতে থাকে, তাতে আবার জলের তলা দিয়ে তৈরী রাস্তা। জলের উপর মাথা তোলে মোচাকৃতি ছাদগুলি। এদের দামী লোমের জন্য এগুলোকে এখন শিকার করা হয়।

আমু'র ব-দ্বীপে সোভিয়েত মানুষ মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা জুড়েছে। পঙ্গপাল সাবাড় করেছে এরা। প্রাক-বিপ্লব তুর্কিস্তানে এরা ছিল জাতীয় দুর্দৈব। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পঙ্গপাল হাজার হাজার দেখানদের পরিশ্রমের ফলকে শেষ করে দিত, ফসলের শেষ শীষটি পর্যন্ত খেয়ে ফেলত। পঙ্গপালদের ভোজন ক্ষমতা বিস্ময়কর। এই আমু ব-দ্বীপের নলখাগড়ার মধ্যেই জন্মাত ওরা, সেখান থেকে চালাত তাদের মারাত্মক অভিযান।

সোভিয়েত মানুষরা চিরদিনের মত পঙ্গপাল ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করে। এ কাজের দুঃসাধ্যতা সহজেই অনুমেয় কারণ পঙ্গপালের জন্মক্ষমতা চমকপ্রদ। একটা মোটামুটি টেবিল আকারের জায়গায় একই সঙ্গে বিশ হাজার পঙ্গপালের বাচ্চা জন্মাতে পারে। পঙ্গপালের বিরুদ্ধে অভিযানের একটি দল এই ব-দ্বীপে কাজ সুরু করে। কোথায় ওদের প্রধান আড্ডা তার খোঁজে নৌকো করে এরা নলখাগড়ার বনের ভিতর দিয়ে এগুতে থাকে। তারপর বিমান চালককে খবর দেয়। তারা বিমান থেকে বহু দূর বিস্তৃত এলাকায় রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেয়। কয়েক বছরের মধ্যেই ব-দ্বীপ থেকে পঙ্গপাল নিশ্চিহ্ন হয়। যাতে আবার ওরা না দেখা দেয় এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সোভিয়েত সরকার প্রতিবেশী দেশ দুটি থেকেও পঙ্গপাল উৎখাত করে।

৪। আরাল সাগর

আরালের অর্থ 'দ্বীপ'। বিস্তৃত হলদে বালির মাঝখানে আরাল বাস্তবিকই একটা দ্বীপের মতো। এটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হ্রদের মধ্যে চতুর্থ — কাস্পিয়ান সাগর, আমেরিকার লেক সুপিরিয়র ও আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদের পরেই এর স্থান। এর এলাকা হল ৬৪ হাজার পাঁচশ বর্গ কিলোমিটার, সুইজারল্যাণ্ডের লেমান হ্রদের চেয়ে ১১০ গুণ বড়, কিন্তু এটা

খুব গভীর নয়। মাপ নিয়ে দেখা গেছে বেশীর পক্ষে ৩০ থেকে ৬০ ফুট পর্যন্ত গভীর। একমাত্র ভজ্‌রজ্‌দেনিয়ে দ্বীপের কাছে এর গভীরতা ২২০ ফুট।

রাশিয়ার প্রথম ভূগোল বইয়ে আরালের নাম দেওয়া হয় 'নীল সাগর'। এর নীল রঙ সত্যিই বিস্ময়কর। খোলা সাগরে জলের রঙ অত্যন্ত পরিষ্কার, সমুদ্রনীল পাথরের মতো গভীর ও মনোরম, কিন্তু এতে সবুজের আভাস নেই। বাদাখশানের নীলাভ পাথরের মতো ঘোর উজ্জ্বল এবং নীলকান্ত মণির মত স্বচ্ছ। এর সৌন্দর্যে আর শেষ নেই।

আরাল সাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে উজবেকিস্তান মৎস্য শিল্পের কেন্দ্র তকমাক-আতা দ্বীপ। এখানে ধীবরদের কয়েকটি গ্রাম, তিনটি মাছের কারখানা। দ্বীপটি ব-দ্বীপের উল্টো দিকে — একটা সরু প্রণালীর দ্বারা ব-দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন। একটা নূতন, বিরাট টিনের মাছের কারখানার কাছে মুইনাক সহরটি তীর ঘেঁষে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর কারা-কল্পকের বিখ্যাত লোক কবি বেরদাখের জন্ম এখানে।

সহরের হাবভাব থেকে এটা যে রাশিয়ার কাছাকাছি তার আভাস পাওয়া যায়। এর অধিবাসীদের মধ্যে আছে কারা-কল্পক, কাজাখ ও রুশ — আর আছে 'উরালবাসী', জার সরকার যাদের গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এখানে নির্বাসিত করেছিল। মধ্য এশিয়ার সমতল ছাদ-ওয়ালা বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুণকাম করা উরালের মাটির ঘর। ছাদগুলো নলখাগড়া দিয়ে মটকা করা। কোন কোন ঘরের উঠোনে ইয়ুর্‌তও দেখা যায়। সব জায়গাতে জাল শুকোচ্ছে — বেড়ার পিছনে, রাস্তার উপরে — ফলে সহরের চেহারাটি হয়েছে রোম্যাণ্টিক। আলকাতরা মাখা জাহাজঘাটির কাছে জলের উপর চকচকে তেল ভাসছে, লঞ্চগুলির তলায় সাদা ফেনার পুঞ্জ। নুন বা মাছ বোঝাই বজরাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তীরে। উপসাগরের মাঝখানে ত্রিকোণাকৃতি সাদা পাল বাতাসে ফুলছে।

ঐ একই দ্বীপে উচ-সাইয়ের কাছে ও মুইনাক থেকে মাইল দুয়েক দূরে নোঙর গেড়ে আছে দক্ষিণ আরালের মাছ-ধরা নৌবহর। উত্তর পারের সহর আরাল্‌স্ক এবং দক্ষিণে আমু থেকে যাত্রীবাহী জাহাজ এবং গাধা বোট আসে এখানে।

বহু দিন ধরে আমু এবং আরালের মাঝখানে নৌচলাচল অত্যন্ত কঠিন ছিল, কারণ আমু তার ব-দ্বীপে বেশী ভাগ পলিমাটি এনে জমা করত। জাহাজগুলো ব-দ্বীপের চড়ায় আটকে গিয়ে বহুদিন পড়ে থাকতে বাধ্য হত। পরে সোভিয়েত জল-বাহন কর্মীরা একটা সহজ কৌশল আবিষ্কার করে আমুর নাব্য ধারাকে আরাল সাগরের সঙ্গে যুক্ত করে। ব-দ্বীপের যে অংশে স্রোত প্রায় থাকে না বললেই চলে সেখানে নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে

জলরাশির গতি বরাবর সমকোণ করে একটা সরু খাল কেটে দেয়। এইভাবে 'মুইনাক পথের' সৃষ্টি হয়। এর ভিতর দিয়ে গাধাবোট ও বজরাগুলো কষ্টেসৃষ্টে একটা আর একটার পাশ কাটিয়ে যায়।

মেছো নৌবহর কখনো কখনো ভজ্‌রজ্‌দেনিয়ে দ্বীপের কাছে সমুদ্রের একেবারে মাঝখানে পাড়ি জমায়, কখনো বা চলে তীর ঘেঁষে। আরাল সাগরে প্রচুর পরিমাণে প্রকাণ্ড গাজিয়নের মতো দেখতে বারবেল মাছ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে রোচ, হেরিং, সিট মাছ, কার্প, ব্রীম, পাইক, জ্যানডার, পার্চ এবং চুব। কিন্তু সবার সেরা হল স্থানীয় মাছ — আরাল স্টারজন। আরালের জেলেরা এদের প্রায় শেষ করে এনেছিল। প্রতি বছরই মাছের সংখ্যা কমতে থাকে। শেষটায় এই মাছ ধরা বন্ধ করে দেওয়া হল। কয়েক বছরের মধ্যেই আবার আরাল স্টারজনের সংখ্যা এবং ব্যবসার দিক থেকে এই সুস্বাদু মাছের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে আরাল সাগরের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে।

গত কয়েক বছর ধরে আরালের জেলেরা মাঝে মধ্যে কাস্পিয়ান সাগরের সেভ্রুগা ধরছে। সোভিয়েত মৎস্য বিশেষজ্ঞরা এই মহার্ঘ মাছের ডিম কাস্পিয়ান সাগর থেকে নিয়ে আসে আমুর ব-দ্বীপে। এখানে বিশেষ মেছো-উৎপাদন যন্ত্র করে তাকে রেখে দেয় এবং ডিম থেকে পোনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমুতে ছেড়ে দেয়। এ ভাবে কাস্পিয়ান হেরিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরাল সাগরে দেখা দিয়েছে সেভ্রুগা।

আরাল সাগরে একটি দ্বীপ আছে যার নাম বারসা-কেলমেস, অর্থাৎ 'গেলে আর ফিরবে না'। এখানে সাইগা (স্তেপের হরিণ) ও পারসীক গ্যাজেলের জন্য একটি সংরক্ষিত অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়েছে। মধ্য এশিয়ার শিকারীরা এদের প্রায় সাবাড় করে এনেছিল। এখন মানুষের তত্ত্বাবধানে এদের বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিবেচনার সঙ্গে, সহজভাবে ও উৎসাহ নিয়ে সোভিয়েত মানুষ প্রকৃতিকে পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ করে তুলছে। প্রতিটি সোভিয়েত সহরে, প্রতিটি অঞ্চলে নরনারী মনপ্রাণ ঢেলে, উৎসাহ নিয়ে এই মহান ব্রত উদ্‌যাপন করছে। প্রতিটি সহর, প্রতিটি অঞ্চলের আছে নিজস্ব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সে ভবিষ্যতের অপেক্ষা করছে ওরা আকুলভাবে। চালু সংগঠনমূলক পরিকল্পনার সংখ্যাদি ও খসড়ার মাঝখানে ফুটে উঠছে সে নিকট ভবিষ্যতের চেহারা আর দূর ভবিষ্যতের রূপ বাসা বেঁধে আছে এখনো কল্পনার মাঝখানে। সোভিয়েত মানুষ ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন দেখে তা সক্রিয়, সুদৃঢ় ও বাস্তব এবং একই সঙ্গে সীমাহীন। আরাল অঞ্চলের লোকদেরও আছে সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন। তাদের নীল সমুদ্রের

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা তা নিয়ে তারা গভীরভাবে আগ্রহশীল। সেটা কী দেখা যাক।

হাজার হাজার বছর আগে ওব ও ইরতিশ নদী উত্তর মেরু মহাসাগরে না মিশে দক্ষিণে আরাল-কাস্পিয়ান সাগরে মিশত। কাল ক্রমে পাহাড় গড়া-প্রক্রিয়ার ফলে সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল উঁচু হয়ে ওঠে এবং ঐ দুই নদীর ধারা উল্টে যায়। এত দিন বৃথাই এদের জল উত্তর মেরু মহাসাগরে পড়েছে। এই জল না পাওয়ায় মধ্য এশিয়া পৃথিবীর সব চেয়ে ঊষর অঞ্চলে পরিণত হয়। এখন সোভিয়েত মানুষ এই বলিষ্ঠ পরিকল্পনা করেছে যাতে সাইবেরিয়ার ঐ নদী দুটিকে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে আরাল সমুদ্রে এনে ফেলা যায়।

এটা হলে, সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলের উপযোগী মানুষের গড়া গভীর ও প্রকাণ্ড খালের ভিতর দিয়ে ইরতিশ ও ওব এবং পরে ইয়েনিসেইয়ের জল হুহু শব্দে ঢুকতে থাকবে।

মধ্য এশিয়ার নদীগুলিকে সেচ কাজের সম্পূর্ণ উপযোগী করার পরেও কারা-কল্পাকিয়া, তুর্কমেনিয়া এবং কাজাখস্তানের যে বিশাল মরুপ্রান্তর পড়ে থাকবে তখন তাদের জল দেবে সাইবেরিয়ার এই নদীগুলি। মধ্য এশিয়া তখন এত জল পাবে যে মানচিত্রের বুক থেকে তারা সমগ্র মরুভূমিকে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন করে দেবে, সমস্ত মরূদ্যানগুলিকে পরিণত করবে একটি ফলন্ত অঞ্চলে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলির সেচ অঞ্চল একত্রে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সমান হবে।

তখন কাজাখস্তান হয়ে ওরেনবুর্গ থেকে তাসখন্দে যাত্রী ট্রেনগুলোকে আর রোদে-পোড়া স্তেপ পেরুতে হবে না। তখন তারা যাবে ফলের বাগান, আঙুর ক্ষেত ও খামার মাঠের অবিচ্ছেদ্য অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে।

সাইবেরীয় নদীগুলি উজবেকিস্তানের বেশীর ভাগ জায়গার প্রান্ত ঘেঁষে গেলেও ঐ সব অঞ্চলের বহু জমিতেই জল দেবে। উজবেকীয় সেচ কর্মীদের তখন অবিরাম সাহায্য করবে সূর্যালোক। ওব ও ইরতিশ নদীর জলরাশি বাষ্পাকারে জমা হবে দিগন্ত ছাওয়া তুষার-ঢাকা নীল পাহাড়ের চূড়ায়। মধ্য এশিয়ার আবহাওয়া আর্দ্র হবে, হিমবাহের আকার যাবে বেড়ে, উজবেক নদীগুলি জলপূর্ণ হবে আর মানুষকে জল দেবে অধিক পরিমাণে।

আজ এসব স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু বলে মনে হবে না। কিন্তু গত চল্লিশ বছরে উজবেকেরা যে উন্নতি করেছে, উজবেক জনগণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টি যে মহান ও ঐতিহাসিক, বীরত্বব্যঞ্জক ও অভূতপূর্ব সৃজনশীল কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে তার কথা কি আমরা স্মরণ করব না? মাত্র চল্লিশ বছর আগে সেটাকে কি স্বপ্ন বলে মনে হত না?

মাক্সিম গোর্কি এক চিঠিতে লিখেছেন: 'দূরের দিকে লক্ষ্য রাখার শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। দীর্ঘ কালের জন্য জীবন আমাদের দেওয়া। শুধু আমাদের জন্য নয় আমাদের বংশধরদের জন্যও। জীবন ক্রমেই দ্রুততর উন্নতি করে চলেছে। গতকাল যা ছিল দূর অতীতের জিনিস আগামীকাল তা এসে ধরা দিচ্ছে আমাদের হাতের মুঠিতে।' এই কথাগুলি লেখার পর থেকে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে দূর এসে 'ধরা দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠিতে'। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষরা এসে দাঁড়িয়েছি কমিউনিস্ট সমাজের দ্বারদেশে, আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলেছি দূরে, আমাদের চেষ্টা আরো গভীরভাবে তাকানো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

বিস্ময়কর এই ভবিষ্যতের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে এর ঐশ্বর্য আমাদের কল্পনাকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাবে। এর সাধারণ চিত্র রেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্তেপ অঞ্চলে ক্ষেত রক্ষী তরুণ গাছের সারিতে এবং স্পুৎনিকগুলির উড়নে, যে উড়নের উপর সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টি নিবদ্ধ। দেখতে পাচ্ছি সাইবেরিয়া ও উত্তরের প্রকৃতি সম্পদকে কাজে লাগানোয়। একে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে পেঁছানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের যা প্রয়োজন সেই উৎপাদন শক্তির সুদৃঢ় অগ্রগতিতে, দেখছি সহর ও গ্রামগুলির পুনর্গঠনের যে বিরাট পরিকল্পনা তার মধ্যে এবং সব শেষে সোভিয়েত নরনারীর কমিউনিস্ট চেতনায় আর শ্রমের প্রতি তাদের কমিউনিস্ট মনোভাবে।

কমিউনিস্ট চেতনার একটি বৈশিষ্ট্য হল নিজের কাজের প্রতি অনুরাগ। এই অনুরাগ ছাড়া কোন ভবিষ্যৎ নেই, উজ্জ্বল আশা নেই, কোন সার্থক স্বপ্ন নেই, কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কোন সংগ্রাম নেই, এক কথায় এ ছাড়া এমন কিছুই নেই যা মানুষের সুখ আনতে পারে। নিজের কাজের প্রতি অনুরাগ আমাদের দেশে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এর প্রকাশ দেখছি কৃষি ও শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে নব নব পন্থা আবিষ্কারকদের আন্দোলনের প্রচন্ড বিস্তৃতিতে। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যে

যুগে কারও কাজই কম মূল্যবান নয়। বিভিন্ন কাজে লিপ্ত প্রতিটি সোভিয়েত নরনারী উজ্জ্বল সাম্যবাদী ভবিষ্যৎকে আমাদের নিকটতর করে আনছে।

কিছু দিন আগে আমি যে একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাতে নিজের কাজের প্রতি এই অনুরাগ ফুটে উঠে। ঘটনাটা এমন কিছু নয়, কিন্তু এর ভিতর দিয়ে একটি মহান তাৎপর্য প্রকাশ পায়, নিমেষের বিদ্যুৎ চমকে যেমন অনেকখানি আকাশ ধরা পড়ে।

ঘটনাটা ঘটে বসন্ত কালে, তাসখন্দে। সে সময় উজবেকিস্তান বিজ্ঞান আকাদমীর ফল ও বেরি ইন্‌স্টিটিউটের বিরাট বাগান ফুলে ফলে ছেয়ে গেছে। একদল স্কুলের ছেলে বেড়াতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল লাইলাক পাটলবর্ণের ফুল-ছাওয়া একটা ছোট্ট খুবানি গাছের কাছে। বাগানের ভারপ্রাপ্ত একজন উদ্যানতত্ত্ববিদ গাছ সম্পর্কে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাদের। লোকটি মাঝবয়েসী, সেই যুগের মানুষ যে যুগে উজবেক যুবকের জীবন ছিল কঠোর, বিপ্লব যাদের কাছে স্বাধীন ও সৃজনশীল কাজের পথ খুলে দেয়। কিংবা বলা যেতে পারে তিনি তাদেরই একজন যারা পিছনে তাকিয়ে বলে, 'মানুষ সম্ভবত যা আশা করতে পারে তার চাইতে অনেক বেশী সুখের জীবন কেটেছে।' গলায় টাই বাঁধা তরুণ পাইওনিয়র দলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। তারা এমন যুগের লোক যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে অনন্ত সুখের অধিকার আছে মানুষের।

উদ্যানতত্ত্ববিদ যখন তার সহকর্মীদের উদ্ভাবিত, দেরীতে-পাকা এক জাতের এপ্রিকট সম্পর্কে উৎসাহ নিয়ে বলছিলেন, টেবো লাল গাল আর পুরু উজবেক ভ্রু-ওয়ালা এক তরুণ পাইওনিয়র ঈষৎ হেসে তার বন্ধুর কানে ফিস ফিস করে কী যেন বলল।

'তোমরা নিশ্চয় ভাবছ আমি এমন একটা অদ্ভুত লোক, যে ভাবে পৃথিবীর ভাগ্য ঝুলছে এপ্রিকটের উপর!' ছেলে দুটিকে উদ্দেশ করে উদ্যানতত্ত্ববিদ বললেন।

'আমি না,' অপ্রস্তুত বোধ করে দ্বিতীয় ছেলেটি জবাব দিল।

'তুমি না ভাবলেও ও নিশ্চয় ভাবছে। কি হে, তাই না?' বিজ্ঞানী মৃদু হেসে পুরু ভ্রু-ওয়ালা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ।' ছেলেটি সংক্ষেপে উত্তর দিল।

'ও! তাহলে তুমি হয়ত জান এর পর আমি কী বলতে যাচ্ছি?'

'জানি।'

'বল ত শুনি।'

ছেলেটি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'আমার কাকা স্থপতি। তিনি বলেন কমিউনিজমের সময় সবাই সুন্দর বাড়িতে থাকবে। আমার কাকার এক বন্ধু বেহালা বাজান। তিনি বলেন কমিউনিজমের আমলে সবাই বাজিয়ে হবে।'

'আমি ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।' উদ্যানতত্ত্ববিদ হাসলেন। 'তুমি ঠিক আন্দাজ করেছ। শোন, ছেলেরা! কমিউনিজমের সময়ে সমগ্র সোবিয়েত দেশ একটি ফুলে ফলে ভরা বাগান হয়ে উঠবে।'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union